সিদ্ধকামিনী

সিদ্ধকামিনী

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্য সংস্থা ১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ
রণধীর পাল
১৪/এ, টেমার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা, জানুয়ারী, ১৯৫৩
মাঘ, ১৩৫৯

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

মুদ্রণে ঃ
এম. এম. প্রিণ্টার্স
৩৫, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

সিদ্ধকামিনী

আমার যখন সবে জ্ঞান হচ্ছে তখন জানলাম আমার বাবা একজন সুপুরুষ চটপটে মানুষ। খাকির হাফপ্যান্টের ভেতর হাফশার্ট গুঁজে পরে বাবা বুট পায়ে টগবগ করে হেঁটে যেতো। আমি হয়তো তখন দু' বছরের। দাদা সিক্সে পড়ে। আমার অন্য ভাইবোন তখনো জন্মায় নি। মা আমায় ঘটের মত সামনের বারান্দায় বসিয়ে রেখে গেছে, হাতে একখানা বিস্কুট দিয়ে—কিংবা একটা বল। তখন দেখেছি বাবাকে। বারান্দা থেকে নেমে যাচ্ছে। স্পিডে। চোখে লেগে থাকার মত সুন্দর দেখতে।

বেশ বড় হয়ে দেখেছি, সুন্দর হয়ে ওঠার জন্যে বাবার একটা তৃষ্ণা ছিল। পা থেকে মাথা অব্দি পাইনট করে সর্ষের তেল মেখে নিয়ে তবে পুকুরে নামতো। দু' হাত ডানা করে জল কাটতো বাবা। পরে দেখেছি, সাঁতারের ইডিয়মে তারই নাম বাটারফ্লাই। মাথাটি বাবা যত্ন করে আঁচড়াতো। ভ্রু, গোঁফ দু'জনই তার হাতের চিরুনির স্বাদ পেতো।

এইসব দেখছি। ভুলে যাচ্ছি। মা আমায় সন্ধ্যে-রাতে আলো নিভিয়ে মশারির ভেতর ঠেলে দিতো কোন কোন দিন। যাতে বেশিক্ষণ ঘুমোই। আর আমি ঘুমোলে মা নাকি অনেক স্বস্তিতে কাজকর্ম সেরে ফেলতে পারতো। আমি কিন্তু মশারির ভেতর জেগে শুয়ে থাকতাম। অনেক দিন উঠেও বসে থেকেছি।

তখনি দেখতে পাই—অন্ধকার দু' রকমের। একটা হল ফ্যাকাশে, একটু ছাই রঙের। অন্যটা একদম কালো। গাঢ় কালো। অনেকখানি ফিকে অন্ধকারের ভেতর থেকে কালো অন্ধকার কিছুটা বেরিয়ে আসে। মশারির ভেতর জেগে শুয়ে শুয়ে এই গাঢ় অন্ধকারকে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখেছি। ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম। সে অন্ধকার এক একদিন কালো তেজি ঘোড়ার চেহারা নিত। সেদিন বারান্দার জ্যোৎস্না ঘিয়ে রঙের এক স্লাইজ আমুল বাটার হয়ে ঘরে মেঝেয় পড়ে থাকতো।

সেই মেঝেতে অন্ধকার দিয়ে তৈরি এই ঘোড়ার একখানা দাবনা ঘিরে হলুদ জ্যোৎস্নার ভেতর পড়ে ঝিকঝিক করে উঠতো। দাঁড়ানো ঘোড়ার বাকিটা তখন ফ্যাকাশে অন্ধকারে মিশে আছে। আমি কিন্তু সবটাই দেখতে পেতাম। তেজী জন্তু হঠাৎ মাঠ থেকে গেরস্থ বাড়ি ঢুকে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের অন্য কিছুর সঙ্গেই তাকে মানায় না। দেড় দু' হাত লম্বা মোটা গলা—ভেতর দিয়ে গলগল করে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। আমি মুগ্ধ হয়ে সেই অন্ধকার ঘোড়াকে দেখতাম।

তখনই একদিন শুনলাম—কিংবা কিছু পরে শুনে থাকবো—আমার বাবা একজন কনস্টেবল। গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। না, তখন আর আমি শিশু নই। আমি বালক হয়ে উঠছি। ঘুম থেকে উঠে ভোরবেলা মনে হয়—আমি নিজেই একটা টাট্টু ঘোড়া। মফঃস্বল শহরের আম গাছতলা, ছায়া, দূরে কলকাতায় যাওয়ার হাইওয়ে দিয়ে অবলীলায় ছুটতে পারি। দশ মাইল ছুটেও হাঁপাবো না।

ও বয়সে কেউ সাহিত্য, শিল্প জানে না। জানে না স্বাস্থ্য বা বিজ্ঞান। জগৎটা তখন রূপকথার। তবু বুঝতে পারতাম—মাত্র কয়েক বছর হল আমি একটা জীবন শুরু করেছি। এই জীবন জিনিসটা অনেক দূরে যায়। তার প্রমাণ—পাড়ার বয়স্ক মানুষজন। অনেক দূর যেতে যেতে পথে একদিন চুলে পাক ধরে। দাঁত নড়ে। দোখে চশমা না দিলে দেখা যায় না। খিদে কমে আসে। তার পর মরে যেতে হয়। এ শিক্ষা বালক মাত্রেই আশপাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পেয়ে যায়। আমিও পেয়েছিলাম।

বুঝতে পারছিলাম—একটা সুন্দর জিনিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। সেই জিনিসের নাম নবীন জীবন। বাড়ির উঠোনে স্থলপদ্ম ফোটে। পুকুরে বড় রুই বুড়বুড়ি কাটে। ভাঙা জিওল ডালের গা দিয়ে আঠা গড়ায়। ব্লটিং পেপারে কালি ওঠার মতই জীবনে পৃথিবীর রস উঠে আসছিল। দেখতে পাচ্ছিলাম। টেরও পাচ্ছিলাম। শুধু এত পরিষ্কার ভাষায় তখন বলতে শিখি নি। নইলে বুঝতাম সবই। একটা বড় ঘুম দিয়ে উঠে সন্ধ্যের মুখে শিউলি গাছতলায় চড়াই পাখিদের ধুলোস্নান দেখতাম। জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলতে আকাশ কালো হয়ে আসতো। তার পরেই সারা আকাশ মাতিয়ে হ্যাজাকের ম্যানটেল মার্কা সাদা একখানা থালা। লোকালয় জুড়ে হলদে আলো গড়িয়ে দেওয়া। তখনই বুঝতাম—এই দৃশ্যটা বানানোর জন্যে সারাদিন ধরে চেষ্টা চলেছে। যেমন করে একটি ফুল সারারাত ধরে কুঁড়ির দশা খুন করে ভোরবেলা ফুটে ওঠে।

আমি টের পাচ্ছিলাম—আমার শরীরে হাত পা ছাড়াও একটি বিশেষ অঙ্গ আছে। তা এই সব দৃশ্য এবং অভিজ্ঞতার ভেতর একটু একটু করে আগাম সব টের পায়। সেই জন্যে কখনো ছোট থাকে কখনো বড় হয়ে যায়।

অনেক পরে—যখন পুরোপুরি খারাপ হয়ে যেতে থাকলাম—তখন এই যোগাযোগটা আমি অঙ্কের মত বুঝতে পারতাম। ততদিনে বাবা আই. বি-র ইনফরমার। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। একটু ঝুঁকে পড়ে ধীর চালে সাইকেল চালাতেন আর সারা শহরের খবর যোগাড় করতেন। মা জানতেন। কিন্তু ঘরে বসে তক্তিতে টিপে নানা রকমের সন্দেশ বানাতেন শুধু।

তখন থেকেই জানি, মতলব ভাঁজলে কিংবা অনেক দিন ধরে একটা জিনিস নিয়ে ভাবলে—সারা ভাবনা থেকেই একটা শুকনো গন্ধ বেরোয়। পরে দেখেছি

—পৃথিবীর সব ষড়যন্ত্রেরও শুকনো মত একটা গন্ধ আছে। রোদ্দুরে সে গন্ধ ভাজা ভাজা হয়ে যায়। বৃষ্টিতে ফেঁপে ওঠে। শীতে মাথার ওপর একই জায়গায় ঝুলে থাকে।

এই সময়টায় আমি আমাদের স্কুলের পাঁচিলের ওপর দিয়ে হাঁটি। ভর দুপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে নির্জনে হাফপ্যান্ট খুলে ফেলছি কখনো। এর ভেতর আমার একটি বোন আর দু'টি ভাই জন্মেছে। আমি ফাইভে পড়ি। রেজাল্টে প্রথম তিন জনের ভেতর থাকছি। পড়াশুনো কোনদিনই আমার কঠিন মনে হয় নি। দিব্যি সেকেন্ড থার্ড হচ্ছি—দিব্যি দিনকে দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছি। আমি কত যে খারাপ কাজ করি তখন—বাইরে থেকে কেউ আমায় দেখে তা বুঝতে পারে না।

ধরা পড়েছিলাম অনেক পরে। দাদা তখন হোস্টেলে চলে গেছে। আরও ভালো ছেলে হবে বলে। হোস্টেলে মানে নিজেদের বাসন নিজেরা মাজতো। নিজেদের রান্না নিজেরা করতো। একজন মাস্টারমশায়কে ঘিরে একটি ছাত্র-মেস।

বাবা আগে আগে আলোচনা করতেন—ভবিষ্যতে আমাকে কি করবেন। ডাক্তার? উকিল? ম্যাজিস্ট্রেট? কিছু ঠিক করে উঠতে পারতেন না। মা বলতেন, রাত হয়েছে—এখন শুয়ে পড়। আগে বড় হতে দাও তো পার্থকে।

আমার নাম পার্থসারথি দত্তগুপ্ত। বাবার নাম নিত্যানন্দ দত্তগুপ্ত।

মায়ের কথায় বাবা বলতেন, এখন থেকেই প্ল্যান করা দরকার।

অমনি আমি শুকনো মত গন্ধটা পেতাম।

কিছুদিন পরে বাবা আর ওসব কথা বলতেনই না। আমাদের ছেলেবেলা আমরা নিজেরাই ভরাট করে রাখতাম। খেলে। আনন্দ করে। অন্যায় করে। ছোট বোন দীপা টুকটুকে এতটুকু মানুষ। বাকি দু'ভাই হাঁটতে পারে। খেলতে পারে। দুধ খায়। ঘুমোয়।

কিছুদিন বাবা খুব আইন পড়লেন, তারপর বাড়িতে একদিন হই চই। আমাদের বাবা এ. এস. আই. হয়েছেন। কয়েকদিনের ভেতর বাবা ডেকয়টি সাপ্রেশন ডিপার্টমেন্টে চলে গেলেন। এই ইংরাজি কথা ক'টি সে বয়সে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তখন মফঃস্বল বাংলায় নদীপথে প্রায়ই ডাকাতি হত। সাহসী অফিসার হিসেবে বাবার খুব নাম হয়েছিল।

আমি তখন আমার নিজের ইস্কুলের সহপাঠীদের নষ্ট করে কাছাকাছি অন্য সব স্কুলের সমবয়সীদের নষ্ট করার ব্রত নিয়েছি। ছোট শহর। ছোট নদী। সমবয়সী ছোট ছোট বন্ধু। কিন্তু আমি তখন ভেতরে ভেতরে বিরাট করে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছিলাম বন্ধুদের।

যেমন—না-জানা কাম জানতে জানতে ভেতরে চলে যাচ্ছিলাম। তার কত ভ্যারাইটি। প্রতিটি বন্ধুকে খারাপ কথার ভকাবুলারি বাড়াতে সাহায্য

করতাম। কতই বা বয়স। এগারো বারো। আমাদের ছোট শহরে ছোট বেশ্যালয়। তাদের সদর বড় রাস্তায়। খিড়কিতে একটি এজমালি পুকুর ছিল। সে পুকুরে বেশ্যা, গেরস্থ—সবাই বাসন মাজতো—কাপড় কাচতো—চান করতো। ছোট ছোট নতুন মেয়ে আমদানি হলে বুঝতে পারতাম। তারা বিকেলে পুকুর পাড়ে বসে কাঁদতো। পরদিন দুপুরে দেখতাম—জলে ডোবা পয়লা সিঁড়িতে চুপ করে বসে আছে হয়তো মেয়েটি। শাড়ি ধরার বয়স হবো হবো। আমি সাঁতরে কাছে যেতাম—বয়স্কা মাসির গলায় খুব আত্মীয়তার ঢঙে জানতে চাইতাম—কি নাম গো তোমার?

বছর ঘুরতেই ওরা লাইনে পুরনো হয়ে উঠতো। তখনো আমি ওদের নাম ভুলতাম না। কাঁচা টাকা হাতে দিয়ে ওরা আমায় ফাইফরমাশ খাটাতো। ও রাজপুত্তুর। ডাকবাংলোর মোড়ের দোকান থেকে দু'খানা গন্ধ সাবান এনে দাও তো।

এনে দিতাম। ওরা বলতো, আরেকটু বড় হও—তখন আমাদের ঘরে বসাবো তোমায়। দুপুরবেলা কিন্তু।

ঠিক এই সময় ইস্কুলের পরীক্ষায় আমি ষাট-সত্তর নম্বর পাচ্ছিলাম। আমার পড়াশুনোর ভিতটা এত শক্ত ছিল—সবাই ভাবতো আমি দারুণ ভালো ছেলে। ততদিনে আমি নিজের যোগ্যতায় অন্তত তিরিশ জনকে নষ্ট করে বসে আছি। কেউ আর ইস্কুলে যায় না। কেউ বা রেলের কম্পার্টমেন্টের কাপলিং খুলতে শিখেছে সবে। পুরনো লোহা, শিশি, খবরের কাগজ, বাড়ির বাঁধানো প্রবাসী তো আমরা সবাই বেচতাম।

এই খারাপ হয়ে যাওয়া একরকমের সিরসির করা আনন্দ দিতো। মনে এবং শরীরে। সিগারেট খেয়ে পাঁচটা পেঁয়াজি মুখে দিতাম। গন্ধ টের পাওয়া যেত না। এই সময়ে আমি সবচেয়ে বেশি করে যাকে নষ্ট করি তার নাম খোকন। আমার ক্লাসফ্রেন্ড। একটু পাগলাটে।

পড়া না পারলে স্যার যখন বেধড়ক পেটাতো—ও তখন বেধড়ক হাসতো। মার খাওয়াটা ও একরকমের কমিক বলেই মনে করতো। স্যার আরও চটে গিয়ে আরও মারতো। নদীতে ঝাঁপানো, মুসুরির ডাল খাওয়া তাগড়া শরীর। ও যেন মনে করতো, স্যার ওর গা টিপে দিচ্ছে।

আমিই ওকে সব অসভ্য কথা, খারাপ কাজ, অন্যায় কাজকর্ম নিজের হাতে হাতে-কলমে শেখাই। ও নির্ভয়ে অম্লান বদনে কোন ঢাকাঢাকি না করে সব করে যেত। ধরা পড়ার ভয়কে কোনদিনই তোয়াক্কা করতো না। ধরা পড়ে অপমান হত! আমরা ভাবতাম—খোকন অপমানিত হচ্ছে। ও কিন্তু হত না।

স্যার হয়তো ওকে স্কুলমাঠে জগন্নাথ করে রেখেছে। পর পর তিন পিরিয়ড। স্যার বললেন, এবার চলে আয়।

ও মাঠ থেকে চেঁচিয়ে বলতো, আরেকটু থাকি না স্যার। খুব ভাল

লাগছে। পায়ে পড়ি স্যার—এখন আমায় ক্লাসে যেতে বলবেন না।

কেন রে?

আমি তো কোন পড়া পারব না। সেই আবার আরেক স্যার মাঠে নীলডাউন করাবেন। যাতায়াতে অনেক সময় নষ্ট হয় স্যার।

অন্যরা মন দিয়ে পড়াশুনো করতো। ও খুব মন দিয়ে জগন্নাথ হত। নীলডাউন হত। জগন্নাথ হবার সময় সবচেয়ে ভারী দু' খানা ঝামা ইট ওর দু'হাতে তুলে দেওয়া হত।

শাস্তি খেটে আমায় এসে বলতো, পেরেছি পার্থ? ঠিক হয়েছে তো?

আমি হাসতে গিয়েও অবাক হতাম। হাসি শুকিয়ে আসতো আমার মুখে। তুই খোকন সাধু, না পাপী?

আমি? আমি শুধু খোকন। আমি এ স্কুলের সেরা লাস্ট বয়। আমার চেয়ে ভালো লাস্ট বয় আর কেউ নেই। থার্ড কনসিডারেশনে প্রোমোশন পাই। চেষ্টা করলে ফার্স্ট তো সবাই হতে পারে।

একমাথা কোঁকড়া চুল। বড় বড় দুটো চোখ। ইজের পরে স্কুলে আসতো। খয়েরী রঙের। তার ওপর ওর মায়ের হাতের সেলাই করা নিমা। নীল রঙের। লম্বা লম্বা পা। লম্বা লম্বা হাত। ও ছিল পাপীদের সাধু। পরে আরও বড় হয়ে বুঝেছি—ও ছিল সাধুদের পাপী।

এখন খোকনের কথা থাক। পরে বলতে তো হবেই। খোকন আমার জীবনে তেরছা করে পড়ে থাকা রোদ্দুর।

ডাকাতি দমন বিভাগে ঢুকে বাবা বাড়িতেই আসতেন কম। নদীপথে পুলিসের নৌকোয় ঘুরে বেড়াতে হত তাঁকে। বিশেষ করে আশ্বিন থেকে চোত মাস অব্দি। এই সময়টায় নদী শান্ত হয়ে যায়। ধান পাকে। কাটা হয়। তোলা হয়। আর ডাকাতি হয়।

সততা, পরিশ্রমের জন্যে বাবার খুব সুনাম তখন। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট মেডেল দিল বাবাকে। একবার নাকি বাবার নাম খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। আমরা দেখি নি। শুনেছি। বাবা বাড়ি এলে চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। একদিন বললেন, পানের পিক আর রক্তের দাগের ফারাক জানিস। মা কাছাকাছি ছিলেন। বাবার কথা শুনে ঝাঁপিয়ে উঠলেন। ও অতটুকু ছেলে—ওসব জানবে কোত্থেকে? তুমিও যেমন!

আমাদের এখন এই চ্যাপ্টারটা পড়তে হচ্ছে।

তুমি ডাকাত ধরে বেড়াও—তুমি পড়বে। যা তো পার্থ—তোর বাবার সাইকেলটা পাম্প করে এনে দে।

আমি উঠে যাচ্ছিলাম। বাবা তখন মাকে বলছিলেন—ক্রিমিনালদের মুখে অল্প বয়সেই দাগ পড়তে শুরু করে। আমার সার্ভিস লাইফে—

চুপ করো তো।

সেই বাবা পরের বছর বর্ষার শেষে এক ডাকাত ধরতে গিয়ে ফেঁসে গেলেন। ধানের মাঠে ধান ছিল না। জলে ডুবে সব পচে যায়। মানুষ সমান জল। মাঝমাঠে চারটে তাল গাছের গায়ে বাঁশ বেঁধে মাচানে সংসার পেতেছিল ডাকাত। বাবা নৌকোয় করে এগোচ্ছিলেন। দেখতে পেয়ে ডাকাত সাঁতার কেটে পালায়। সদ্য-বিয়োনী ডাকাতের বউ বাচ্চাটাকে জলে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে। বলে—দারোগাবাবু, তুমি আমার খোকাকে খুন করেছো। জলে ফেলে দিয়েছো।

সেই নিয়ে খুনের মামলা চললো তিন বছর। বাবার সব চুল পেকে গেল। অফিসে সাসপেন্ড। একদিন বাবা পুকুর থেকে শামুক তুলে আনলেন। মা তাই পরিষ্কার করে গরম মসলা দিয়ে রেঁধে আমাদের দিয়েছিলেন। চমৎকার খেতে। এখনো মানুষের বেঁচে থাকতে খুব একটা বেশি কিছুর দরকার হয় না। সান বাঁধানো পুকুরে চান করে সেই সানেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়।

পুকুরের শামুক, শাপলা, চুনো মাছ তুলে রেঁধে খেতে আলাদা স্বাদ। দু' মুঠো ভাত চাই সঙ্গে। গাছের একটা লঙ্কা। একটু নুন। আর বেশি কি। পুকুর পাড়ের কলাগাছের মাঝের ডোগাখানা কেটে নিলেই থালার কাজ হয়। জীবনকে একসময় আমি এরকম সিম্পল করে নিয়েছিলাম।

মামলায় জেতার এক বছরের মাথায় বাবা বকেয়া মাইনে সব হাতে পেলো। আর পেলো প্রমোশন। আমি তখন ইন্সপেক্টর দত্তগুপ্তের মেজ ছেলে। দেশ ভাগ হয়ে গেল। এপারে চলে এলাম ম্যাট্রিকুলেশন দিতে। খোকনদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেললাম। ওরা আমাদের চেয়ে গরিব ছিল তখন। তখনই পাকিস্তান থেকে চলে আসেনি। এলে খাবে কি এদেশে এসে?

কিছুদিন বাদে বাবা এস. পি. হয়ে বর্ধমানে চলে এলেন। আমি আই. এস সি.-তে ফার্স্ট ডিভিসন—দুটো লেটার নিয়ে রাজ কলেজে ভর্তি হলাম। সদর থানার মালখানায় যেতাম। বড় বড় কনস্টেবলরা খৈনি ডলতো। আমায় দিয়ে বলতো, লিন মেজবাবু—একটু খৈনি খান। আমি ওদের নির্জনে বসে বাংলা পর্ণোগ্রাফি পড়ে শোনাতাম। জমিদারের কীর্তি। লেডী ডাক্তার। এই সব। যে কোন থানার মালখানায় আটক করা জিনিস পড়ে পড়ে পচে। এক সময় বাতিল বলে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই সব বই থাকে থাকে গাদা করা থাকতো।

আমি তখন একরকমের হাসি হাসতাম। যার একটাই অর্থ হয়। আমি কি বুদ্ধিমান। দিলাম তো ঠকিয়ে। কেউ ধরতে পারলো না।

এই সময় বাবা দুহাতে ঘুষ নিতে শুরু করেন। ডাকাতের সঙ্গে বাচ্চা জলে ফেলে দেওয়ার মামলায় লড়ে বাবা আস্তে আস্তে অন্যরকম লোক হয়ে গিয়েছিলেন। একজন কনস্টেবল তার নিজের পদে সৎ ছিল। সে এস. পি. হয়ে ঘুষখোর হয়ে গেল। অথচ বাবা তো কনস্টেবল থাকতেই ঘুষখোর হতে

পারতেন। খুনের মামলার আসামীকে আইনের ফাঁক দিয়ে পার করে দিতেন। টাকা পেতেন। মাছ পেতেন। পেতেন সারা বছরের বাড়ির জামাকাপড়। কারও ধরার সাধ্যি ছিল না।

দাদা পাস করে ইংরেজির প্রফেসর হল প্রাইভেট কলেজে। আমার বোন দীপা তখন স্কুল ফাইনাল দেবে। আমরা বাড়ির সবাই বুঝতে পারছিলাম—বাবা ঘুষ খান। মদ খান। সরকারী গাড়িতে করে বেড়াতে বেরোন। কিন্তু আগেকার মত আর বই পড়েন না। মাকে কোন ভাল রান্না করতে বলেন না। আমরা ভবিষ্যতে কি হবো—তাই নিয়ে ভাবেনও না।

মা আস্তে আস্তে চুপ করে যাচ্ছিল। কথা বলছিল না বিশেষ। রোগাও হতে থাকে এই সময়। কোন প্রতিবাদ নেই। কোন নালিশ নেই। বাবা একটা জিনিসে লক্ষ্য রাখতেন, আমরা যাতে কেউ অভাব বোধ না করি। টেবিলের যে খোলা ড্রয়ারটায় বাবা তাঁর নিজের টাকা-পয়সা রাখতেন—সেখান থেকে কত যে দশ টাকার নোট সরিয়েছি তার হিসেব নেই। বাবা কোনদিন ধরতে পারেন নি। পরেপর এত ঘুষ পেতেন—যার কোন হিসেব ছিলো না।

দু' একদিন বাবা খুশী মেজাজে থাকলে বলতেন, আজ নতুন টাকা আসার কথা আছে। পেলে পার্থকে একজোড়া বুট কিনে দিতে হবে।

আমি তখন ডিস্ট্রিক্ট টীমে ফুটবল খেলছি। আমরা চুপ করে থাকতাম। নতুন টাকা মানে নতুন ঘুষ। এমনও হয়েছে—বাবা সকালবেলা দু'বার নতুন টাকা পেলেন। আবার সন্ধ্যের মুখে একবার নতুন টাকা পেলেন। এ ছাড়া তো মাস মাইনে ছিলোই।

আমি এই সময় খুব খরচে হয়ে পড়ি। তসরের হাফশার্ট প্যান্টের ভেতর গুঁজে পরতাম। তসরের দাম চিরকালই বেশি। এরকম শার্ট বানিয়েছিলাম ছ'টা। রুমাল ছিল সিল্কের। ঘাড়ে দিতাম কিউটিকোরা পাউডার। তেতাস খেলতে বসতাম সিল্কের লুঙ্গি পরে! বাঁ পকেটে এক টাকার নোট খুচরো থাকতো অনেক। ডান হাতে ধোঁয়া ওড়ানো সিগারেট।

যেন অনেক কাল হল পড়াশুনো শেষ হয়ে গেছে। চাকরিই করছি দশ-বারো বছর। অঢেল পরিশ্রমের পর একটু রিলাকস করতেই যেন তাস খেলা। আমি যে স্টুডেন্ট, আমি যে বেকার, আমার বাবুয়ানা কুলোতে বাবার পকেট মারতে হয়, দু' চারটে খারাপ কাজও করি এ জন্যে—এটা আমার মনেই থাকতো না।

তখন আমাদের একমাত্র বোন সদ্য কিশোরী। শেষের দু' ভাই নেহাৎ বালক। দাদা অন্য শহরে ইংরেজি পড়াতে চলে গেছে। আমি ফুটবল খেলছি। হ্যা হ্যা করে হাসছি। তেতাস খেলি। ছোট গেলাসে করে আমার আলাদা ঘরে বসে একটু একটু করে হুইস্কি খাই। পর্ণোগ্রাফি পড়ি, পড়ে শোনাই। কলেজে যারা কবিতা লেখে—তাদের ঠাট্টা করি। যারা পলিটিকস্

করে—আন্দোলন করে—তাদের দয়ার চোখে দেখি—কি বোকা। ঘরের ভাত খেয়ে—

আমার খেলা দেখে এক চালকল মালিকের বি. এ. পড়া মেয়ে আমায় একখানা চিঠি দিল। প্রিয় পার্থ, তুমি যখন বল কাটিয়ে এগিয়ে যাও—তখন তোমাকে অর্জুনের মত লাগে।

বুঝলাম মেয়েটি ভাবালু। কোথায় ফুটবল—আর কোথায় কুরুক্ষেত্র! ভাব হল। ডাকনাম বুলবুল। শ্যামসায়রের ছায়া-ঢাকা চওড়া পাড় ধরে দুজনে সন্ধ্যের দিকে হাঁটি। বুলবুল এমনিতে খুব সাদাসিদে মানুষ। ও দেখি আমায় পুজো করে মনে মনে। যখন আমি বল নিয়ে এগোই—ওর বুকের ভেতর নাকি রক্তের গোলা গড়ায়। এ কথাটা শুনতে ভালই লাগলো। আমি একটু চুমু খেলাম। ওরা এক পুরুষের পড়াশুনো করা বাড়ি। বইকে মনে করে সরস্বতী। কথায় কথায় বলে—ভগবান পাপ দেবেন। ছিঃ, অমন করে না পার্থ।

ভগবান পাপ দেবেন—শুনতে শুনতে একদিন পাপই করে বসলাম। ও আমায় স্বামীজ্ঞানে গ্রহণ করলো। যদিও তখন আমি বিয়ের কথা ভাবিই নি। দুই উরু প্রসারিত করে। আমি চিরকালই সাবধানী। বিবিধ ভারতী তখনো নিরোধের গানটা ধরে নি। আমরা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কিশোর। আমেরিকান সোলজারদের কৃপায় জিনিসটা পানের দোকানে এসে যায়।

এই সময় আমি কয়েকটি জিনিস জেনে গেছি। যেমন, ঘুষখোর বাবা কেমন হন। পুরনো ও নতুন টাকা। প্রতিবাদহীন বিষণ্ণ মা। কপট রাগ, অপাঙ্গে তাকানো, কটাক্ষ—ইত্যাদি জিনিস নিয়েই মেয়েরা জন্মায়। ওটা ওদের বিল্ট-ইন স্বভাব। বাড়িতে ভালো না লাগলে বাড়ির বড় ছেলে ইচ্ছে করেই অন্য শহরে চাকরি নেয়। আসলে আমি কোথাও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। পড়াশুনোয় ভাল হওয়া একটা অভ্যাস মাত্র। কিন্তু মাকে কষ্ট পেতে দেখে মায়ের ওপর যেন আরও বেশি রাগ হতে লাগলো। দাদা অন্য শহরের লোক হয়ে গেল। দীপা একদম বোকা। আমাদের বাড়িটা ভেঙ্গে যাচ্ছে। ও কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছে না। ওর পরের দু' ভাই একদম মডেল বালক। পৃথিবী ভূমিকম্প হয়ে অর্ধেক ভেঙ্গে গেলেও বাকি অর্ধেকের ওপর ওরা বালক হিসেবেই থাকতে চায়। কনস্টেবল থেকে এস. পি. হয়ে বাবা যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। আর এগোলেই হিমালয় কিংবা সাহারায় গিয়ে পড়তে হবে। তাই রাইট অ্যান্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছিলেন বাবা। একদিন তো বাড়ি ফিরে বাবা নিজেই বললেন, আমার পেছনে ভিজেল্যান্স লেগেছে।

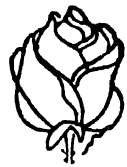

বাবার বিরুদ্ধে ভাল করে তদন্ত করার জন্যে বাবাকে আলিপুরে বদলি করা হল। আমরা পুলিস কোয়ার্টারে উঠে এলাম। বিরাট নির্জন বাড়ি। ফুলবাগান। পুরনো বট। ভোরে পাখি আসে। পুলিস আসে। ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। বাবা কিন্তু সব সময় উসখুস করেন। একদিন মাকে বললেন, গুসকরার কেসটা যে কি করে এসেছি—মনেও নেই ছাই। কাগজপত্র পুড়িয়ে আসা উচিত ছিল।

বিকেলের অন্ধকার ঘর। আলো কম। তার ভেতর মা চোখ তুলে বলল, পুড়িয়ে আসো নি?

সময় পেলাম কোথায়। টেলিফোনে অর্ডার এলো বদলির। অ্যাট ওয়ান্স প্রসিড্ টু আলিপুর আফটার হ্যান্ডিং ওভার দ্য চার্জ।

মন্তেশ্বরে সেই হাসকিং মিলের ব্যাপারটা বলছিলে না?

হুঁ! সেখানেও তো গোলমাল পাকিয়ে রেখে এসেছি।

তুমি তো আগে এমন ছিলে না।

হুঁ।

কলকাতায় কলেজে গিয়ে খোকনের সঙ্গে দেখা হল। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে খোকনের। একমাথা কোঁকড়া চুল। ভাসা ভাসা দুটো বড় চোখ। সব সময় হাসছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে ওকে দিব্যি মানিয়েছে। আমায় এতদিন পরে—তা কয়েক বছর তো হবে—হাতে পেয়ে যেন চাঁদ হাতে পেলো। পরিষ্কার বললো, জানিস পার্থ—কলকাতা কিন্তু আমাদের শহরের মত নয়। কেউ কাউকে চেনে না। কারও জন্যে কেউ নয় এখানে। রিলেশনগুলো দেখেছিস।

আমি দেখছিলাম—ও কত সুন্দর। আমি কত বিচ্ছিরি দেখতে। দু' হাঁটুতে বুটের স্ক্র্যাচ। কপালে কাটা দাগ।

ঠিক এই সময় দাদার বিয়ে দিলেন বাবা। বিয়েতে পরিবেশন করলো খোকন। বিয়ের পরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—দাদা বউকে নিয়ে তার কাজের জায়গায় চলে গেল। খোকন দীপার প্রেমে পড়লো দীপা প্রেমে পড়লো নিশীথের। নিশীথ মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে চান্স পেয়ে হোস্টেলে চলে গেল। সেখান থেকে দীপাকে প্রায়ই চিঠি লিখতে লাগলো। নিশীথ হলো গিয়ে দাদার শালা।

খোকন নিশীথের কথা জানতো না। নিশীথকে দু' একদিন আমাদের বাড়িতে দেখেও বুঝতে পারতো না। অস্থির, ক্লান্ত, বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল ও। আমাদের বাড়িটা কলকাতার ভেতরে হয়েও যেন মফঃস্বলের ভেতরে। বকুল গাছ, পান্থপাদপ গাছ, কাঁঠালীচাঁপা গাছ—সবই ছিল। সাপ অমাবস্যায় খোলস ফেলে যেতো লনে। বড় আউট হাউসে চারপাই পেতে শুতাম—পড়ার টেবিলও ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ির কাছাকাছি—অথচ আলাদা। এ ঘরে আসার অপেক্ষা না রেখেই। খোকন এসে চারপাইয়ে শুয়ে থাকতো। দীপা দূরে পড়ার টেবিলে চড়ে বসতো পা ঝুলিয়ে। সবে ফার্স্ট ইয়ারে ঢুকেছে। বুঝতাম, আমার বোন হাতে নিশীথকে জমা রেখে খোকনকে নিয়ে খেলতো।

জ্যোৎস্না রাতে উঠোনে খেলে বেড়ানো বেড়ালের মুখে জ্যান্ত আরশোলার দশা। প্রেম যে এত পাজি জিনিস, আমি জানতাম না কোনদিন। বুলবুলের সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার আমি একটা হেলদি জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলাম। শরীরের স্বাদ পেয়ে ও অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খোকন হয়ে গেল বিষণ্ণ।

সেই সুবাদে আমি ওর বইগুলো বেচার ব্যবস্থা করলাম। ও দিব্যি বেচে দিল। সেই টাকায় আমরা ক'দিন আনন্দ করলাম। তারপর ও হল ডিস-কলেজিয়েট। আমি এদিকে মেরিট বেসিসে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কোটা থেকে এম. বি. বি. এস.-এ চান্স পেলাম। ফোর্থ ইয়ারে চলে গেলাম ডাক্তারি পড়তে। খোকন পড়ে থাকলো। ও রোদে লাইন দিয়ে দীপা আর নিশীথের জন্যে সিনেমার টিকিট কেটে রাখে। বাড়িতে গঞ্জনা, বাইরে অপমান—তার মধ্যেও খোকন দিব্যি হাসিমুখে চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই সময় বাবা সত্যিই বরখাস্ত হলেন। প্রিম্যাচওর রিটায়ারমেন্ট। আমি এম. বি. বি. এস. পড়ছি। এবং আমার এক মাসতুতো মাসি এলো আমাদের বাড়ি থাকতে। তিন কুলে তার কেউ নেই। মা তাকে ছোট দেখেছেন। আমারই বয়সী। ভালো চা করতো। ডাঁসা স্বাস্থ্য। এসেই আমাদের কোয়ার্টারের পেছনের বারান্দায় একদমে একশো স্কিপিং করে দেখালো। বাইশ তেইশ বছরের মেয়ের পক্ষে এটা একটা দারুণ ব্যাপার। ছ্যাঁচা শরীর। ফ্যাট নেই। হাড়ে-মাসে আগাগোড়া মাপসই। হাওড়ার গাঁয়ে নাকি মা বেঁচে থাকতে ঢেঁকিতে সারা দুপুর পাড় দিতো।

বাবাকে রিটায়ার করিয়ে দিলেও সরকার বাহাদুর তখন তখনই সরকারী কোয়ার্টার থেকে তাঁকে তুলতে পারলো না। বাবা হাইকোর্টে কি একটা আপিল করে ও বাড়িতে থেকে গেলেন। রিটায়ার করানো নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাবা মামলা করে দিয়েছিলেন। তাই বাড়ি বসেই হাফ পে পাচ্ছিলেন। ছ' মাস পেরিয়ে গিয়েও মামলার নিষ্পত্তি হল না। তখন কোর্টের অর্ডারে বাড়ি বসে বাবা মাইনের শতকরা পাঁচাত্তর ভাগ পেতে লাগলেন। আর এই সময় পুলিসের

ভেতরকার যত মামলা—তার আনঅফিসিয়াল উকিল হয়ে গেলেন।

সারাদিন দু'জন টাইপিস্ট টাইপ করে। বাবা ডিকটেশন দেন। দারোগারা আসে। ইন্সপেক্টররা আসে। কার ডিমোশন হয়েছে। কে সাসপেন্ড। কার ডিউ প্রোমোশন হয় নি। কাদের সুপারসিড করে বেআইনী প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। সবাই-সবাই আসে। কারণ, বাবা ভালো ঘুষ খেতেন। কাজটা ভালো জানতেন। একদম কনস্টেবল থেকে এস. পি. হওয়ার ভেতরের ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সব জানা ছিল বাবার।

তাই—পয়সা যাকে বলে তাই আসতে লাগল। মাইনের টাকা তার পাশে নস্যি। অথচ ঘুষের টাকার মতো দুশ্চিন্তা এ টাকায় নেই। তখন সব টাকাই বাবার কাছে পুরনো হয়ে যেতে লাগলো। বাবা ডিকটেশন দিতে দিতেই দামী হুইস্কি খেতেন। তলানী সমেত কত বোতল যে আমি সরিয়েছি। বাবার কাছে বিষ্ণুপুর, মালদহ, সাগরদ্বীপ, পুরুলিয়া, বালুরঘাট থেকে কেস নিয়ে দারোগারা আসতো। বাবা লাম্পসাম টাকার চুক্তিতে সওয়াল লিখে দিতেন। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বাবার পসার বেড়ে গেল। পার্টি এলে তাদের চান করার জন্যে সামনের দিকের বাথরুমটা খুলে দেওয়া হত। দূরের পার্টির জন্যে চা জলখাবারের ব্যবস্থা থাকতো। বাইরের কনস্টেবলরা বলতো সরকারী উকিল। বাবা নতুন গাড়ি কিনলেন। পাকা চুলে কলপ দিলেন। বাবার এক বন্ধু বাবাকে খরামর্শ দিল—এল. এল. বি. করে নাও নিত্যানন্দ।

বাবা জানতেন, আমি ডাক্তার হয়ে উঠছি। আমি জানতাম, আমি ডাক্তার হচ্ছি না। এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি থেকে সরে যাচ্ছি রোজ।

খোকন আর বাবা—দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা। কোথাও কোন অন্যায় না করে খোকন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কলেজে যাবার উপায় নেই। ডিসকলে-জিয়েট। বই নেই। বিক্রমপুর ভাণ্ডার। বাবা অবিরাম ঘুষ খেয়ে পরিণামে রিটায়ার—সেই সুবাদে মামলা ও বাড়ি বসে মাইনের বারো আনা পেয়ে যাচ্ছিল। উপরন্তু পুলিস বিভাগের ভেতরকার মমলা-মোকদ্দমার স্যার রাসবিহারী হয়ে উঠেছিলেন।

এ অবস্থায় আমি কার দিকে যাবো? খোকন কবিতা লিখছিল। একদিন একটা গল্প দেখালো। পড়েও শোনালো। এ এক অন্য খোকন। আরেক দিকে বাবা চুলে কলপ দিয়ে নতুন গাড়িতে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যান। আমার পথ ঠিক করে দিল মাসি। সে ছিল একজন গুপ্ত শক্তিসাধিকা। গুণ একটু একটু করে ধরা পড়ে। সময়ে ফাঁকা বারান্দায় গুনগুন করে রামপ্রসাদী ধরে। বিদ্যে ফাইভ সিক্স। আমাদের মেসো নাকি কালীসাধক ছিল। মাসির হাতে একদিন একখানা কালীর পট পেলাম। খুব ছোট। পুতুল খেলার যে আয়না থাকে—তারই ফ্রেমে বসানো। বললো, ছোটবেলায় বাবা তারাপীঠ থেকে এনে দিয়েছিল।

সময়ে মাসি, আমি, দীপা, খোকন, নিশীথ একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতাম। মাসি নানা জায়গার কালীর কথা বলতো। হাওড়ার হাজার হাত কালী। মেহের কালী। ডাকাতে কালী। জঙ্গুলে কালী। তাদের নানারকমের মহিমা।

আমি ঘাগুলোক। সবই বুঝতাম। খোকন দীপার ভালবাসা পাওয়ার জন্যে যে কোন কালীর কাছে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে পারতো। মাসী একজন মেয়েমানুষ। সে দীপাকে দেখে সব বুঝতো। তার নজর ছিল খোকনের ওপর। আমার নজর ছিল মাসির ওপর। মায়ের মাসতুতো বোন। নামেই মাসি। আসলে সমবয়সী একজন মেয়ে। বুনো শরীর। বুনো ভাব-ভাবনার মানুষ। তেজী শরীর কোন আউটলেট না পেলে কালী, সন্তোষী মা, নীল ষষ্ঠী—এই সব আঁকড়ে ধরে।

মাসি কোন তন্ত্র-মন্ত্র জানতো। আগাম বলে দিতে পারতো— আজ বৃষ্টি হবে, না রোদ উঠবে! ঠিক মিলে যেতো। আমাদের অনেক তন্ত্রের গল্প বলতো। গল্পের লক্ষ্য ছিল খোকন। সে কিন্তু কিছু বুঝতো না। দীপার ভালবাসা না পেলে জগৎ অন্ধকার। দুনিয়া মিথ্যে। এরকম একটা ফিক্সড্ আইডিয়ার রুগী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল খোকন। দীপা সব জানতো না। নিশীথও না। আমি সব জানতাম।

এক একটা তন্ত্রের কাহিনী শুনে আমার এক একদিন সন্দেহ হোত—মাসী কি কোনদিন কারও ভৈরবী হয়েছিল? পুলিস কোয়ার্টারের মাউন্ট হাউসে বসে মাসী এসব গল্প বলতো। গল্পে গল্পে রাত হয়ে যেতো। গাছপালার ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্না মাখানো বাতাস শব্দ করে চলাফেরা করতো। তখন মাসী ফিসফিস করে বলতো। মন দিয়ে শুনতো—খোকন আর নিশীথ। আমি আর দীপা এসব গল্পের সময় আলো নিভিয়ে দিতাম। আমরা যে ভাইবোন।

এক সুপুরুষ টিচার। কিংবা এক সুপুরুষ স্টেশন মাস্টার। নয় তো এক সুপুরুষ পোস্টমাস্টার। এই বলেই গল্প শুরু করতো মাসী। এই সুপুরুষরা মাসীর গল্পে খুব ভবভোলা আর বিবাহিত হত। কালীর সন্ধানে সে শশ্মানে-মশানে ঘুরে বেড়াতো।

কেন সন্ধান করতো? না, অসাধ্য সাধনের ক্ষমতা চাই। অমাবস্যায় চাঁদের উদয় জাতীয় সব বায়না থাকতো এই সুপুরুষদের। এক সাধুর সঙ্গে দেখা। সে অনেক ঘোরালো। তারপর একদিন মন্ত্র দিল। খুব মারাত্মক মন্ত্র। সে সব অনেক গুপ্ত কথা। শ্মশান চাই। চাই স্বাস্থ্যবতী বেঘরের মেয়ে। সে মারা যাবে। তাকে নানা ক্রিয়া করে বাঁচানো। এই বাঁচানোর সময় খুব সাবধানে থাকতে হবে। নানা রূপে ডাকিনীরা লোভানী দেবে। কখনো পরমাসুন্দরী সুগন্ধী নারী হয়ে। কখনো আশ্রয়প্রার্থিনী কুলটার হাসি হেসে।

এ ভাষাও মাসীর। এমনিতে কোন বই-টই পড়তো না। শুধু মায়ের পঞ্জিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করতো। কিন্তু ফিসফিস করে গল্প বলছে অন্ধকারে বসে—আউটহাউসের জানলাতেই নির্জন জ্যোৎস্না—টপাটপ ভালো বাংলা বেরিয়ে আসছে মাসীর মুখ দিয়ে।

খোকন জানতে চাইতো, কী ক্রিয়া মাসী?

সময় হলে তোমায় একদিন বলবো খোকন।

দীপার দেখাদেখি নিশীথও খোকনদা বলতো। এসব সময় নিশীথ ঠাট্টা করে বলতো, মাথা নীচে—পা ওপরে—হাত দিয়ে পি-কক হয়ে হেঁটে যেতে বলছেন মাসী। পারবেন খোকনদা?

মাসী গাঢ় গলায় বলতো, অমন মিথ্যে ঠাট্টা করতে নেই নিশীথ। ক্রিয়া একটা চক্র। যার কেন্দ্রে—

আর বলা হত না মাসীর। কেউ না কেউ বারান্দা থেকে ডাকতো।

খোকন আমাদের তুলনায় সরল ছিল। আমি ওকে নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। যদি কোন কলেজে ফের অ্যাডমিশন পায়। যদি কোথাও টিউশনি পায়। টিউশনির টাকায় পড়াশুনো চালাতো। তাহলে ওর বাড়িরও কিছু বলার থাকবে না। কিংবা যদি কোথাও পার্ট-টাইম চাকরি পায়। নিজের খরচ চালিয়ে পড়ে যাবে।

কোনোটাই হত না। আমি ন্যাশানাল মেডিক্যালের হেস্টেলে গিয়ে সন্ধ্যের দিকে তেপান্তি নিয়ে বসতাম। মন পড়ে থাকতো বাবার জবরদখল সরকারী কোয়ার্টারের আউট-হাউসে। না জানি মাসী আজ ফিসফিস করে কোন ক্রিয়ার গল্প বলছে। আজ বিকেলে নিশ্চয় দেড়শো বার স্কিপিং করেছে। হাওড়ার গাঁয়ের মেয়ে। রামপ্রসাদী গায় গুনগুন করে। বাবার কাছে জামাইবাবু—ও জামাইবাবু—বলে আবদার করে। আউট-হাউসের অন্ধকারে বসে গল্প বলার সময় ওর চোখের ভেতরকার সাদা দেখা যায়। মাসী আমাদের হাড়েমাসে একদম মাপসই। নিজেই বলে—শরীরটাকে আমি সব সময় সাম সাম করে রাখি। এইসব ভাবি আর সব ভুল হয়ে যায়। গচ্চা খাই। মাসীর ডান হাতের চেটোর ঘামে ভেজা ছোট কালীখানা মনে পড়ে যায়।

খোকন আর আমি এক বেস্পতিবার হাওড়ায় হাজার হাত কালীর ওখানে গেলাম। বর্ষাকালে। বাঁধানো রাস্তা। বিকেলবেলা হবে। একটা একতলা বাড়ির একধারে বড় ঘরে কালীমূর্তি। বিরাট চালি। সেই চালির ভেতর ছোট ছোট হাত বসানো। দেখলে ভয় করে। খোকন ভক্তিভরে প্রণাম করলো। মাসীর কথামত দম বন্ধ করে ব্লেড দিয়ে বুকের মাঝখানটা চিরে রক্ত দিল কালীর পায়ে। অনেকক্ষণ হত্যা দিয়ে পড়ে থাকলো। বিকেলবেলার নিঃসঙ্গ কালী। কেউ আসে নি। আমরা দুটি ভক্ত প্রণাম জানাচ্ছিলাম।

আমার চাইবার কিছু ছিল না। কোন্ মুখে কালীর কাছে কিছু চাইবো।

আমার তো কোন গুণের ঘাট ছিল না। চাইবার কথা কিছুই মনে এলো না। আমার মনে হচ্ছিল—বা রে খেলাধুলো!

ফিরতি পথে খোকনকে বললাম, কী চাইলি?

চাওয়ার যে অনেক কিছুই ছিল। গোলমাল করে ফেলেছি। কিছুই গুছিয়ে বলতে পারি নি।

আমাদের দু'জনেরই যমদূতের মত স্বাস্থ্য। অথচ শরীরটাকে নিয়ে কী করবো জানি না। কখনো ভক্তি লাইনে—কখনো অভক্তি লাইনে আছি।

আরেক দিন খুব ভোর রাতে খোকন আর আমি নাখোদা মসজিদে দিনের পয়লা আজানের সময় গিয়ে হাজির হলাম। আল্লাকে কায়মনোবাক্যে খোকন প্রার্থনা জানালো পরিষ্কার গলায়।

খোদা আমাকে রহেম করো। খোদা একটা টিউশনি—ভালো মাইনের—দিলায় দাও।

অ্যায় খোদাতালা। তুমি সব পারো। দীপা আমার কর্সাব। এই কর্সাব, আমায় দিলায় দাও।

রহেমতুল্লা বিসমিল্লা—তোমার অসাধ্য কিছু নেই। কলেজে আমার একটা অ্যাডমিশন করিয়ে দাও। সোভান আল্লা—তুমি ইচ্ছে করলেই আমার একটা পার্ট-টাইম চাকরি জুটে যায়। তোমার দোয়া মাঙি।

মসজিদের সামনের ফুটপাথে ভোর-রাতে হাঁটু গেড়ে বসে খোকনের এই অচলা ভক্তি দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। প্রার্থনাগুলো খুবই আন্তরিক। ফেরার পথে বললাম আমার জন্যে কিছু চাইলি না খোকন?

তোর আবার চাওয়ার কি আছে পার্থ?

তা বটে! মাসীর জন্যে তো চাইলে পারতিস কিছু!

মাসী আমার চেয়ে পাওয়ারফুল। সে নিজেরটা নিজে করে নিতে পারবে।

এইভাবে একদিন দুপুরের দিকে আমরা দুজন হেদোর উল্টো দিকে এক গীর্জার সামনে দাঁড়ালাম, চার্চের নীল কাঁচে বিকেলের রোদ্দুর পড়ে ফালি ফালি রঙিন আলো দেখাচ্ছিল। চার্চের দরজা বন্ধ। বাইরে টিনে আঁকা হোর্ডিং। তাতে ছাই রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে কালো রঙে আঁকা যীশুর ব্লিচ করা নেগেটিভ। যুবক যীশু দু' হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিতে চাইছেন। আমরা বড় ক্লান্ত ছিলাম। পারলে ছবিতে আঁকা যীশুর কোলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। সেদিন পকেটে আমাদের একটাও পয়সা ছিল না।

যীশুর ছবির পাশে বড় বড় হরফে বাংলায় লেখা ছিল—পাপের বেতন মৃত্যু। তুমি বড়ই ক্লান্ত। আমার কাছে আইস। আমি তোমায় বিশ্রাম দিব।

সেটা বোধহয় বর্ষাকালের বিকেল ছিল। আমি আর খোকন চোখ তুলে যীশুর দিকে তাকিয়েছিলাম খানিকক্ষণ। চোখ নামালাম আমরা। খোকনকে

বললাম, তুই দীপাকে ভালবাসিস কেন ?

জানি না। তবে ভালবাসি।

ভালবাসা মানে কি ?

একরকমের কাছাকাছি থাকা।

শুধু তাই খোকন ?

আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয় তো। কেন ?

দীপা তোকে ভালবাসে ?

না বাসলেও বাসাতে হবে। আমার ভালবাসার জোরে সেটা ঘটবে দেখিস।

এ কি প্রমথ চৌধুরীর মন্ত্রশক্তি! দীপাও তো অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে।

জানি। কিন্তু তা হবে না। ছুটে যাবে সে ভালবাসা পার্থ।

এটা আসলে খোকন তোর নিজের গর্ব। সেই গর্বে চোট খেয়েছিস বলে এমন ক্ষেপে গেছিস।

মাসী তাহলে কিসের বিশ্বাসে ওসব কথা বলে পার্থ ?

মাসী পাগলাটে মানুষ। অন্ধ উইলফোর্সের কথা যে কোন গেঁয়ো মেয়ে-মানুষ জোর দিয়েই বলতে পারে। তুই শুনলি আর অমনি বিশ্বাস করে বসলি! কোথায় তুই ফিরে পড়বি। কিছু একটা করবি। জীবন কি এভাবে আমাদের আউট-হাউসের ঘরে বসে গালগল্পের মত চলে ?

আমি তো বসে নেই। আমি তো লিখছি।

কি লিখছিস ?

কবিতাই বেশি। গল্পেও হাত পাকাচ্ছি।

এত সহজ খোকন!

জানি না। দেখি হয় কি না।

এক একদিন বাবার গাড়ি নিয়ে মা আর মাসী দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতেন। বাবাকে তাঁর মক্কেলরা আরও বড় উকিলের কাছে নিয়ে যেতো কেস বোঝাতে। বাবা গিয়ে বোঝাতেন। আমার বালক দু' ভাই স্কুলে। দীপা কলেজের বন্ধুর বাড়ি গেছে।

এরকম একদিন ফাঁকা বাড়িতে শুধু আমরা দুজন। বিকেলবেলায় দোতলা ফাঁকা। একতলা ফাঁকা। বিরাট সরকারী কোয়ার্টারের পেছনেই একটা পুরনো পুকুর ছিল। ছায়ায় ঢাকা। জামরুল গাছের ঘন ডালে রোদ আটকে দিত। খোকনকে বললাম, চল, ল্যাংটো হয়ে চান করি।

খোকন সারাদিন চুপচাপ আউটহাউসে শুয়ে থাকতো। বাড়ি যাবার উপায় নেই। কলেজ নেই। টিউশনি নেই। কোন চাকরি নেই। কম্মের ভেতর পাতার পর পাতা খসখস করে কি সব লিখতো। একদম লাফিং স্টক। সেই তুলনায় আমি নিয়মের রাজত্বে বাস করছি। এম. বি. বি. এস. ফার্স্ট

ইয়ারে উঠেছি। ফার্স্ট এম. বি. বি. এস. দেওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছি।

করবি? চল—

আমরা দুজনে জামরুলতলায় ল্যাংটো হলাম। ২২/২৩/২৪-এর শরীর আমাদের। ঢ্যাঙা। কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুবকের। ঠাণ্ডা জল। কিছু শাপলা ছিল। মাঠের একটা রেল স্লিপারকে সেদিন ঘাটলা হিসাবে আবিষ্কার করলাম। পুকুর থেকে বাড়িটার দোতলার একটা ব্যালকনি দেখা যায়। গলা জলে দাঁড়িয়ে একতলার বারান্দাটা দেখা যায় না।

খোকন বললো, উঠতে ইচ্ছে করছে না। আর খানিকক্ষণ ঝাঁপাই।

ঝাঁপা—বলে খোকনকে একটা কথা মনে করিয়ে দিলাম। তোর মনে আছে—আমিই তোকে ছেলেবেলায় প্রথম খারাপ কথা শোনাই।

হুঁ। ওগুলো খারাপ কথা নয়। আমরা প্রকাশ্যে বলি না বলে আড়ালে থাকতে থাকতে কথাগুলো খারাপ হয়ে গেছে।

তোর মনে আছে—আমিই প্রথম তোকে অসভ্য খেলা শেখাই।

হাত দিয়ে গা ডলতে ডলতে খোকন বললো, শরীর নিয়ে কি করবো জানতাম না তো—তাই গোপনে যা করি—তাকেই বলি অসভ্য। এটা ভুল পার্থ। শরীরের আবার সভ্য অসভ্য কি রে?

খুব যে দর্শন ফলাচ্ছিস! লেখক হয়ে যাবি মনে হচ্ছে।

এ কথার জন্যে লেখক হতে হয় না পার্থ। তুই একটু ভেবে দ্যাখ। তুই-ই আমার কথায় সায় দিবি। আয়, আরেকটু ঝাঁপাই।

ঝাঁপা না। কে বারণ করছে।—বলেও আমার মনে হল—আমি যেন অপমানিত। ফস করে বললাম—বেশ তো, এই অবস্থায় সদরে গিয়ে দাঁড়া।

আমি একা গিয়ে দাঁড়ালে তো হবে না। দেশসুদ্ধ লোকের দাঁড়ানো চাই।

বেশ তো। দীপার সামনে দাঁড়া।

ওর তো অভ্যেস নেই। শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আরও কাঁচিয়ে দিয়ে লাভ কি পার্থ। আমি এমনি ট্রুথের কথা বলছিলাম। মানুষের সত্য কি তাই বলছিলাম।

এ তুই কোন ভাষায় কথা বলছিস খোকন? কি হয়েছে তোর?

আমি আজকাল এভাবে ভাবি।

দাপিয়ে চানের আনন্দটা আমার নষ্ট হয়ে গেল। কোথায় একটা অপমান আমার গালে কোটিং ফেলে দিল। একা একা উঠে আসছিলাম। জামরুলতলা পেরিয়েছি। খোকনও উঠে এলো। ট্রাউজার বুশশার্ট গাছতলায় পড়ে আছে। আমরা দুজন খোলস ফেলে রেখে একতলার বারান্দায় বসতে যাচ্ছি। উঁচু কম্পাউন্ড ওয়ালের ওপরেও ঘন লতার আড়াল।

এমন সময় ওপর থেকে দৈববাণী হল। রোজ এমন চান করতে পারো তোমরা—

মাসীর গলা পেয়েই খোকন এক ঝটকায় নিজেকে জামরুলতলায় ফেরত পাঠালো। ওর গলার স্বর শুনলাম পেছন থেকে। মাসী দক্ষিণেশ্বর যায় নি?

জবাব দিলাম না কোন। মনে মনে খুশী হয়েছি। নিজের একটু আগের দর্শন খোকন নিজেই মুছে দিলো। আমি চোখ তুলে ওপরে চাইলাম। খোলা ঝুল-বারান্দায় মাসী দাঁড়িয়ে। দুপুরে ঘুমিয়ে চোখ দুটো করমচা। তাতে গাঢ় করে কাজল ফেরানো। বুকজোড়া রেলিংয়ে চেপে হাসছে ঝুঁকে পড়ে।

আমি সরে গেলাম না। বললাম, তুমি আমাদের সঙ্গে চান করবে? এসো। এসো না।

আমি কলঘরে গা ধুয়েছি একটু আগে।

না ধুলে নাইতে? কথা বলছি আর ওপরে তাকিয়ে আনমনে আমার শরীরের জায়গায় জায়গায় নিজেই হাত দিচ্ছি। গায়ে তখন শুধু জলের ফোঁটা। একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের উরু যেমন হয় তাই। বখামির দরুন আমার গালে কোনদিনই মাংস জমে নি। হাসলে ইংলিশ ফিল্মের স্টারদের মত ক্লিয়ার কাট ভাঙা দাগ পড়তো। আমার গলার টোন খানিকটা ন্যাজাল। উপরন্তু ভিজে গায়ে ল্যাংটো অবস্থায় গাছপালার ভেতর দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে আমায় কথা বলতে হচ্ছিল। মনে হল মাসী লাল ডুরেটাই পরেছে। কালো ভারি পাড়। ভেতরে লাল আর কাঁচা হলুদ রঙের মোটা মোটা লাইন।

মাসী ওপর থেকেই বললো, একটুও সরে না গিয়ে—বিকেলে আমি চুল ভেজাই না। শুকোতে চায় না। শেষে মাথা ধরে।

আমাকে দিয়ে 'কিরিয়া' হবে মাসী? ক্রিয়া কথাটাকে মাসী 'কিরিয়া' উচ্চারণ করতো।

মাসী গম্ভীর হয়ে বললো, সবাই কি পারে? ও বড় কঠিন রাস্তা।

জামা কাপড় পরে খোকন বেরিয়ে এলো। আমার কাঁধে ট্রাউজার শার্ট রেখে বললো, পরে আয়। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বলতে বলতে খোকন ফাঁকা একতলার বসার ঘরে চলে গেল। দেখতে পাচ্ছিলাম—খোকন বসার ঘরের আয়নায় ছোট চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে।

সেদিনই রাতে গ্রে-র অ্যানাটমির বই, মড়ার খুলির পেছন থেকে চটি বই ক'খানা বের করলাম। ওসব বর্ধমানের সদর থানার মালখানা থেকে আনা। জমিদারের কীর্তি। লেডী ডাক্তার। বাবু ও বিবি। পটে আঁকা ছবি। মাসীকে একা পেয়ে বললাম, লুকিয়ে পোড়ো। ভাল লাগবে।

কাছাকাছি হওয়াতে বুঝলাম—মাসী খোঁপায় কাঁঠালি চাঁপা ফুল গুঁজেছে। এ গন্ধে সাপও ছুটে আসে।

সেদিনই অনেক রাতে আমার আউট-হাউসের ঘরের দরজায় খুটখুট আওয়াজ হল। দোর খোল। খোল বলছি।

অন্ধকারে চোখের সাদা দেখতে পেলাম। মাসী ঘরে ঢুকেই নিজের হাতে ছিটকিনি তুলে দিল। দেরী কোরো না লক্ষ্মীটি। জামাইবাবু আবার ভোর ভোর ওঠেন।

আমার চোখে তখনো ঘুম ছিল। বাইরে আলিপুর ঘুমোচ্ছে। চাপা গলায় বললাম, ক'টা বাজে?

রাতের বেশি বাকি নেই। নাও—

আমার রসিকতা এসে যাচ্ছিল। কি মনে করে? কোন্ বইটা বেশি ভাল লাগলো?

মাসী আমার মুখের ভেতর তার শাড়ির আঁচলটা জোরে চেপে ধরলো। আরেকটু হলেই বিষম খেয়ে বেদম কেশে উঠতাম।

কাঁঠালি চাঁপাটা আমার হাতেই থেঁতলে গেল।

এবার আমি হয়ে গেলাম খোকন। খোকন হতে থাকলো পার্থ। আমি ভেঙে যেতে থাকলাম। খোকন পার্থর মত গড়ে উঠতে লাগলো। তার মত করে। সরল খোকনে তেজী বাঁধন আসছিল। পার্থর সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগলো। এমনিতেই তো আমি জন্মবখা।

বৌদি দাদাকে পাকাপাকি আলাদা করে নিল। সরকারের বিরুদ্ধে বাবার মামলা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। আর বাবাও হুইস্কি খাচ্ছিলেন যখন তখন। একদিন মাকে বললেন, শেষে না টাকা ফেরত দিতে হয় গুনে গুনে। বাড়ি ভাড়া তো চাইবেই। বাজার দরে না চেয়ে বসে গভরমেন্ট।

তোমার কর্ম তুমি বোঝো।

মায়ের এ কথায় বাবা তাঁর দিকে শুধু চেয়ে রইলেন।

দীপা শীত পড়তেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমায় দেখে বলতো, এখন তো ঝড় ওঠে না। তাই না দাদা?

ঠাট্টা করে বলতাম, এখন ওঠে। আন্দামানের দিকে।

নিশীথ মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের প্র্যাকটিকাল ক্লাস করতে গিয়েছিল আন্দামানে। সমুদ্রপথে। মেরিনের সেকেন্ড ইয়ার থেকেই সমুদ্রে প্র্যাকটিকাল

ক্লাস হয়। সি ভয়েজ—একটা একশো নম্বরের কমপালসারি পেপার। এ কথা নিশীথ কত বার যে আমাদের শুনিয়েছে।

খোকনের প্রথম গল্প আমরা পূর্বাশায় দেখলাম। সবটাই কল্পনা। ডায়ালগে বোঝাই। ন্যারেশনের ভাষা একদম আনকোরা। তাই পড়তে বোরিং লাগলো না।

শীতের রাতগুলোয় আমি আউট-হাউসের চারপাইতে একদম আলপিনের ওপর শুয়ে থাকি। মা জানেন—মেডিকেলের পড়া ভীষণ পড়া। মড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি। আমি তাই আউটহাউসে আস্তানা করেছি পাকাপাকি। মাসী দিনে এক রকম। রাতে আরেক রকম। নিশুতি রাতে দিব্যি লন পেরিয়ে চলে আসে। গভরমেন্ট বাবার জন্যে আর গার্ড রাখে নি।

মাসী আমাদের শিয়াখালা-আমতা লাইট রেলওয়ের মেয়ে। মানে ও লাইনে মাসীদের গাঁ। 'লেডী ডাক্তার' বইতে ডক্টর মিস কুমুদিনী চৌধুরী, এম. বি. ঠিক যেভাবে যে ভঙ্গীতে—মাসীর ভাষায়—'কিরিয়া' করেছে—আমার ওপর মাসী সেই সব ক্রিয়ার ভার দিতো এক এক রাতে।

আমি পারবো কেন! আমরা প্রায় সমবয়সী। মাসীর স্বাস্থ্য ভালো। তার সঙ্গে খাপ খায় আরও অন্তত ছ' বছরের বড় শক্তসমর্থ পুরুষ। আমার তো সারা দিন চোখ ভেঙে আসতো ঘুমে। একদিন ডিসেকশনের ক্লাসে ভিড়ের ভেতর পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

প্রফেসর জানতে চাইলেন, কী হয়েছে তোমার দত্তগুপ্ত?

কিচ্ছু না স্যার। এমনি ঘুম হয় নি কাল রাতে।

আমাকে অনেক জিনিস শিখিয়ে নিয়েছিল মাসী। এটা যে একটা ব্যায়াম এবং শিল্প—তা মাসীই আমায় প্রথম শেখায়। মাথার বালিশ. পাশ বালিশ—কখন কাকে কোথায় রাখার—তাও একটা শেখার বিষয়।

এক একদিন বলতাম, এত তুমি জানলে কোত্থেকে মাসী? থাকতে তো অজগাঁয়ে।

অন্ধকার আউট-হাউসে কলকল করে উঠতো মাসী। শিখতে হয়। শিখতে হয়—বুঝলে মশায়।

আরেক দিন জোর করে ধরে জানতে চাইলাম, কি করে শিখলে বলো?

কিছুতেই বলে না। মাসীর 'কিরিয়া' হল। শেষে নিশুতি রাত কেটে কেটে চলে যাবার সময় কলকল স্বরে বললো, আমার মা কায়েত হলেও বাবা ছিলেন আগমবাগিশ বংশের। মাটির উঠোনে কঞ্চির দাগ টেনে বাবা শুকনো বাতাসে আগুন ধরাতেন—দণ্ডীর ভেতর। বাবা না ডাকলে আমার যাওয়া বারণ ছিল তাঁর কাছে। বাবা ছিলেন সিদ্ধাই।

তোমার মা?

আমার মা ছিল তোমার দিদিমার সবচেয়ে ছোট বোন। আপন বোন—

তোমার মায়ের চেয়ে কিছু বড়—সম্পর্কে মাসী।

আঃ! ওসব কে জানতে চেয়েছে? তোমার মা কি 'ক্রিয়ায়' বসতো? নইলে আমি এলাম কোত্থেকে!

আঃ! আজ তুমি ইচ্ছে করে কিছু বুঝতে চাইছো না। অমন ক্রিয়ায় সবাই বসে। আমি বলছি, সেই সব বসার কথা—যাতে শুকনো বাতাসেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়।

ও। ওসব কথা জানতে চাইছো। তা মাকে নিয়ে বাবাকে আমি কোন তন্ত্রে মন্ত্রে বসতে দেখিনি। তবে শুনেছি—আমার জন্মের আগে বসেছেন। তাতেই নাকি শরীর খারাপ হয় মায়ের। মা আমায় বলতো, জানিস কুটু—পৃথিবী নিজেই একজন শক্তি। পৃথিবীর স্বভাবের বিরুদ্ধে কখনো যাবি নে!

এ তো বুদ্ধিমতীর কথা মাসী। কিন্তু বুদ্ধির বাইরেও তো অনেক কিছু হয়।

সে জন্যেই তো আগমবাগিশ বংশের বড় ছেলে হয়েও বাবা মাকে দেখে বিয়ে করতে এগিয়ে এসেছিলেন। মায়ের মধ্যে কী সব লক্ষণ দেখেছিলেন বাবা। আমার মধ্যেও সে সব লক্ষণ আছে নাকি। মৃত্যুর আগে মা বলে গেছে। বাবার মুখে গঙ্গাজল দিতে পারিনি শেষ সময়ে। বাবা ক্ষ্যাপানাথতলায় শেষ সময়ে আমার নাম ধরে ডাকাডাকি করে। আমি পোড়াকপালী! আমি শুনতে পাই নি।

কাঁদছো কেন এখন? ক্ষ্যাপানাথতলাটা কোথায় গো?

খচ করে কান্না থামিয়ে মাসী পরিষ্কার গলায় জানতে চাইলো, তুমি অ্যাতো সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছো কেন? সিদ্ধাই হবে? শুকনো বাতাসে আগুন ধরিয়ে দিতে চাও? ও পথে যেয়ো না।

ক্ষ্যাপানাথতলাটা কোথায় বল তো?

বাবা সাধারণ শ্মশানকেই এখন ক্ষ্যাপানাথতলা, সর্বনাশী ঘাট, বগলাবাহী গঙ্গা, পঞ্চমুণ্ডির মোড়—নিজের মনের ছবির মত করে খানিকক্ষণের জন্যে বানিয়ে নিতেন।

তুমি দেখেছো?

দেখি নি আর! আমার শরীরে কয়েকটা লক্ষণ দেখে মা নিজেও আমাকে কিছু শিখিয়ে দিয়েছিল। সেই বলে বাবার খেলাধুলো কিছুটা কিছুটা ঘরে বসেই দেখতে পেতাম। এই বাবা তারাপীঠ চললেন।

বাধা দিলাম। তারাপীঠ তো বখামোর সেরা পীঠ। তন্ত্র সাধনার নামে যত রাজ্যের বদমাস আর পারভার্ট হাজির হয়।

পারভার্ট কি জিনিস গো?

বিকৃত রুচির—

বাধা দিল মাসী। রুচির আবার বিকৃতি কি! কেউ কেউ বলে সুরুচি। ভারি—রুচির আবার সু কু কি! রুচি—রুচি।

তুমি খোকনের মত কথা বলছো দেখি।

তোমার খোকন বন্ধুটি কিন্তু কিছু কিছু লক্ষণ ধরে। আমি লক্ষ্য করেছি।

আর কি লক্ষ্য করেছো?

ছিঃ। হিংসে করতে নেই। খোকন বড় কষ্ট পাচ্ছে। তবে ওর দশা কেটে যাবে। তখন অন্য লোক হয়ে যাবে।

খুব ফসকে গেছে তোমার হাত থেকে!

ওসব কথা থাক। এসো। আমরা আবার কাজে বসি। আজ তোমায় আমি ক্ষ্যাপানাথতলায় নিয়ে যাবো। এই আমি শুয়ে পড়লাম।

ওখানে শুয়ো না। মেঝে ফুঁড়ে লাল পিঁপড়ে বেরোচ্ছে ক'দিন।

আমায় কামড়ালে পিঁপড়ে মরে যাবে। দেশলাই কাঠি দিয়ে অন্ধকারে একটা ব টানো তো।

টেনেছি।

ব্যস্। একটা গান গাই এখন।

আস্তে মাসী। মা জেগে যেতে পারেন।

এখন কেউ জাগবে না। এখন আমরা ক্ষ্যাপানাথতলায় যাবো। বলেই মাসী গাইতে লাগলো—

ভালবাসি বলে ভালবাসার কথা
ভালো তো লাগে না
আদরে কত তুমি কোলেতে বসাইলে
খেলাটি ভাঙিল—সবই মুছিলো।

মাসী তুমি এত ভালো গান জানো? আমার এ কথায় তার কান নেই। গানে আউট-হাউসের ঘরখানা ভরে যাচ্ছিল। কী মিষ্টি গলা। গানের কথা ফুরিয়ে গেলে মাসী সুরটুকু নাকে আর ঠোঁটে ধরে রাখতে চাইছিল। তাও এক সময় শেষ হল।

সিদ্ধাই হতে চাও তো? ভালো কথা। নিজেকে ধরে রাখতে শেখো। একটা ভালো গোলাপের কথা ভাবো। মনে কর নদীর লেজ ধরে পাকাচ্ছো। মন আমার শরীর থেকে সরিয়ে ফেল। মনে কর তুমি একটা শুকনো নদীর পাড়ে গ্যাছো। সেখানে নৌকো উল্টে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। তারই একটার ওপর তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। এইমাত্র ঘুম ভাঙলো। নদীটা সন্ধ্যের মুখে জলে ভরে যাচ্ছে। সুন্দর অথচ দুঃখী নদী। এই ভাবনায় ঢুকে পড়ো। মনে কর আমি নেই। সব চিন্তা দুই ভ্রূর মাঝখানে নিয়ে এসো পার্থ। খেলাটি ভাঙিল—সবই মুছিলো। নিজেকে ধারণ করতে শেখো। পারতেই হবে তোমায়। জামাইবাবুর একটু তলানী রয়েছে না শিশিটায়। আমার মুখে ঢেলে দাও আর যেখানে পছন্দ—ঢালো ঢালো। ওখান থেকেই

বাকিটা তুমি ঠোঁটে তুলে নেবে। ভালো লাগছে? লাগবেই—

আমি গোলাপী আলোয় এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লাম। তার ভেতর স্লেট রঙের একটা কুঁড়েঘর। বারান্দা আলো করে মাসী বসে আছে। বয়স এই যেন সতেরো আঠারো। আরও কয়েক বছর আগের চেহারা। মুখে এক অদ্ভুত হাসি—যেন আমি সব জানি। অবাক হয়ে আমার নীচে তাকাই। সেখানেও মাসী। মুখে সেই একই হাসি। তবে বয়সটা একটু বেশি। এই আমার আর খোকনের বয়সী।

বারান্দায় মাসী হেসে বললো, এই তো ক্ষ্যাপানাথতলায় এসে গ্যাছো। নামো। আমার গতরে ব্যথা হয় না? দ্যাখো বোকা! একসঙ্গে কতদিকে তাকায়। চোখ সামলাও। সামলাও বলছি।

এবারে গোলাপী আলো কেটে গিয়ে পরিষ্কার আলো বেরিয়ে পড়লো। কুঁড়ে ঘরের পাশেই বাঁশবাগান। পাকা নোনা হলুদ হয়ে ঝুলছে নোনা গাছে। ক্ষ্যাপানাথতলার নিজের সূর্য এবার লাল হয়ে উঠতে লাগলো। এখানে ক্ষ্যাপানাথতলার নিজেরই একটা পূব আকাশ ছিল। সেখান থেকে ক্ষ্যাপানাথতলার নিজের ভোরবেলার আলোর সুতোগুলো এসে পড়তে লাগলো।

আর অমনি নোনাগাছের পাশ দিয়ে দেখতে পেলাম—আমি পার্থসারথি দত্তগুপ্ত—একটু বয়স হয়েছে—দিব্যি ফতুয়া গায়ে মাছ মেরে ফিরছি। হাতে ছিপ। আর একটা বড় শোল ঝুলছে। কই গ্যালে গো। মাছটা পোড়াও। একটা নেবু পেড়ে আনি বাগান থেকে।

দেখতে পাচ্ছি—আমিই বাগান থেকে পাতি নেবু পাড়ছি। গত রাতে নেবুগাছের ডালে মাকড়সা জাল পেতেছিল। ডাল ধরে আমার টানাটানিতে সে জাল ছিঁড়ে গেল। ক্ষ্যাপানাথতলার সব কিছু এত ভিভিড্। এত জ্যান্ত।

আমার নীচের নৌকোয় চোখ গেল। সেখান থেকে মাসী চোখ পাকিয়ে বললো, এক জীবনে তুমি আর আমি এমন ছিলুম কিন্তু। তখনো শিয়াখালা-আমতা পথে লাইন বসে নি।

কি বলছো? ওখানে ম্যাকলাউড কোম্পানী লাইন বসায় ১৮৯৭-এ। খবরের কাগজে পড়েছিলাম।

অত-শত জানি নে। মোটমাট তার আগের কোন এক সাল সনে আমাদের জীবন অমন ছিল কিন্তু। চলো যাই। সর্বনাশী ঘাটে যাবে? শিশিটা কোথায় রাখলে গো। জামাইবাবুর শিশি—

আমার মাথা ঘুরছিল। আমি আর ধরে রাখতে পারি নি নিজেকে।

মাসী শুধু বললো, কী করলে? এটা উচিত হল? এতটা পথ এসে? তুমি না শুকনো বাতাসে আগুন ধরাতে চাও? সিদ্ধাই হবে? কত জানার ইচ্ছে! নাও—এবারে অন্ধকারে ব-টা মুছে ফেল।

আমি পারি নি। আমি পারি নি। বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম।

মাসী উঠে বসে বললো, ছিঃ। কাঁদে না। আস্তে আস্তে পারবে। একদিনে কি হয়? বিশেষ করে আমার মত মেয়েমানুষ যেখানে ভৈরবী!

আমার কান্না কিছুতেই থামছিল না। আমি পারি নি। আমি ভাড়ায় ফুটবলের ক্ষেপ মারা লোক। জাত কনস্টেবলের ছেলে। কনস্টেবলদের সঙ্গে বড় হয়েছি। আমি পারলাম না। নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। আমি নিজে একটা পুরো ক্লাস নষ্ট করে দিতাম। অন্তত দু' ডজন ছেলেকে খারাপ করেছি। তবু নিজে কিন্তু সব সময় ভালোভাবে পাস করে গেছি। জেলার কোটায় এম. বি. বি. এস. পড়ছি দেড় বছর হয়ে গেল। তিনটে ব্যাক আমার বল টেনে নেওয়া আটকাতে পারে নি। আর আমি আজ—

এর পর থেকে মাসীকে আবার সুন্দর লাগতে লাগলো। ভয়ও করতে লাগলো। ভয়ের ভেতরে সুখ ছিল। শরীর কাঁপানো আনন্দ। একদম মূল ধরে।

মার্চে নতুন গরম পড়ার মুখে মুখে বাবাকে সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল। ক'টা বছর কী অদ্ভুত কেটেছে ও বাড়িটায়। এখনো সময় পেলে ও বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে যাই। আউট-হাউসটা ভেঙে ছোট্ট একটা দোতলা হয়েছে। কেন ভাঙলো আউট-হাউসটা? কোন মানে হয়?

আমরা উঠে এলাম—বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের কাছে। একটা বেশ বড় বাড়িতে। নতুন তৈরি। কিন্তু আশপাশের গাছ-পালা পুরনো। লাল সুরকির রাস্তা। পরে যার নাম পর্ণশ্রী—সেই মনোরম বসতি তখনো পুরোদমে তৈরি শুরু হয় নি। এখানে সেখানে পুকুর। একটা ব্যায়ামাগার। কিছু বড় গাছ। আর ইলেকট্রিকের খুঁটি। ওখানেও বাবার মক্কেলরা রিকশা সাইকেলে চড়ে আসতে লাগলো। ততদিনে কোর্টের বাইরে বাবার সঙ্গে গভর্নমেন্টের একটা সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে নিশীথের আসাটা বন্ধ করে দিল বৌদি। তারই তো মায়ের পেটের ভাই। ভবিষ্যৎ দেখতে হবে বৈকি। নিশীথ তখন মেরিন হাউস থেকে শুধু চিঠি লিখতে লাগলো। দীপা একটার জবাব দেয় তো আরেকটা চিঠি

এসে যায়। এত কথা তো লেখা যাবে না।

আমাদের খোকন কিন্তু গল্প লিখেই চলেছে। লিখে লিখে সে লেখক হবেই। শিশিতে বাবা আজকাল আর তলানী ফেলে রাখেন না। দীপা পড়তে পড়তেই চাকরি খুঁজতে লাগলো। আমার বালক দু' ভাই কিশোর হয়ে উঠছিল। আমি মেডিক্যালের পড়াশুনো থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। ক্লাসে মাঝে মাঝে যাই। অনেক কিছুই আর বুঝতে পারি না।

এ বাড়িটা আরও সুবিধাজনক হল। মাসীকে জড়িয়ে ধরা এবং উপগত হওয়াই আমার এখানকার প্রধান ব্যায়াম ও শিল্প হয়ে দাঁড়ালো। শিল্প বলছি এ কারণে—আমি আর মাসী যে যার কাজে আছি। মাকে সাহায্য করছে মাসী। আমি টর্কসিক অ্যাসিডের চ্যাপ্টারটা পড়তে টর্কসিটির সিমটমগুলো দেখছিলাম। হঠাৎ মনে হল বইয়ের পাতা থেকে আমার চোখের নীচে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে। সে রাস্তাটা দক্ষিণের ঘর থেকে ঘুরে মায়ের নিজের মহল গ্রিল দেওয়া ঢাকা বারান্দায় উঠে গেল। শেষ হয়েছে মাসীর পায়ে গিয়ে—যেখানে মেরুন সুতোর কল্কিপাড় টাঙ্গাইল পরে মাসী একটা টাইট ব্লাইজে দাঁড়িয়ে। মা উল্টো দিকে তাকিয়ে। মাসী মায়ের মাথার ভেতর থেকে নিজের আঙ্গুল চালিয়ে বের করে আনছে—আবার গুঁজে দিচ্ছে, তিনটে দেওয়ালের আড়াল দিয়ে এসব দেখতে পাই এখন। এখন দেওয়াল বা অন্ধকার আমার চোখের পক্ষে কোন আড়ালই নয়।

এখন আমরা দু'জন যেভাবে ঘুরিফিরি—এক একদিন ফ্লাইং ক্লাবের তার-কাঁটার বাউন্ডারি নীচু হয়ে টপকে গিয়ে যেভাবে এয়ার-স্ট্রিপ খুঁজি—সেখানে শুয়ে পড়ি, জড়াই দু'জনে দু'জনকে—বাড়ি ফাঁকা পেলেই যেভাবে গদের আঠা হয়ে উঠি দু'জনে—তাতে আমাদের 'কিরিয়াগুলো'র ভারবাটিম কেউ যদি লিখে ফেলতে পারতো—তার চেয়ে সেরা পর্ণোগ্রাফি আর কি হয় জানি না, ক্যামেরা আমাদের ফলো করলে সর্বকালের সেরা ব্লু ফিল্ম হতে পারতো আমাদের নিয়ে।

আমি তখনো জানি না—আমি মাসীকে ভালবাসি কি না। মাসীও জানতো না। দীপা ভাগ্যিস নিশীথের সঙ্গে ঘর বাঁধবে বলে চাকরি খুঁজছিল। নইলে বাড়ি থাকলে ওর কাছে আমরা একদিন না একদিন ধরা পড়তামই। নিশীথের বাবা বলেছে—ও কেলে মেয়েকে বিয়ে করলে নিশীথ তেজ্যপুত্র হবে। আসলে বৌদি কোন কলকাঠি নেড়ে থাকবে!

সেই কেলে মেয়েকে না পেয়ে আমার বন্ধু খোকন ধীরে ধীরে স্থিতধী হয়ে উঠলো। মুখে এক রকমের নতুন হাসি। ও আজকাল বলে—আমি পৃথিবীর রূপ দেখতে শিখেছি পার্থ। সব জিনিসেরই একটা রূপ আছে। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবন নিয়ে একখানা করে প্রাইভেট মহাকাব্য আছে। ওই যে রাস্তায় লোকটাকে রেশন নিয়ে যেতে দেখছিস—ওর ঠোঁটে আমি পেনসিল

দিয়ে আঁকা তিনটে লাইন দেখতে পাচ্ছি। লোকটা হাসলে হয়তো দেখবো—লাইন আসলে পাঁচটা—তবে অদৃশ্য।

সবাই তো ওসব লাইন দেখতে পায় না খোকন।

এ জন্যে আমি দীপার কাছে গ্রেটফুল। দীপার জন্যে আমার সেই যন্ত্রণা এখন মনে হয় খোকন নামে আরেকজন খোকনের যন্ত্রণা ছিল। আমি শুধু অবজারভাব ছিলাম পার্থ। দীপার সামনে আমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখতে পাই। আমার মুভমেন্টস্, ভয়েস, চোখের দৃষ্টি—সবই তখন আমি একজন আলাদা লোক হিসেবে কাজ করতে পারি।

তুই তোর নিজের ডাক্তার তাহলে এখন! কি বলিস?

এভাবে না হলে তো লেখা যায় না।

এত যে লিখিস—সে সব লেখা এখন কোথায়?

বেশির ভাগই হয় না। তবে মনে হচ্ছে— আমি একটা পথ পাচ্ছি পার্থ।

এর পরে কি আর চাকরি পাবি? গ্র্যাজুয়েট তো হোস নি এখনো।

হয়ে যাবো। চারু কলেজে সিট পেয়েছি। তোকে বলা হয় নি।

মাইরি!

ও কথা থাক। তুই কি করে বেড়াচ্ছিস বল তো? চেহারা অমন করলি কি করে?

আমি খোকনের মুখে তাকালাম। তাকাচ্ছি আর বুঝতে পারছি—আমি আমার আদত জায়গা থেকে অনেকখানি সরে এসেছি। আমার দু' চোখের কোণে দুটো অদৃশ্য রিফিলের সরু ডগা কে যেন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এ যে কি এক যন্ত্রণা। বুকের ভেতরে পরিষ্কার একখানা ঘর। আমি নিজে সেই ঘরে ঢুকে দেওয়াল আঁচড়াচ্ছি। আমি কি তাহলে মাসীর সঙ্গে অন্ধকারে ব এঁকে ক্ষ্যাপানাথতলায় যাতায়াত করছি বলে একদম বয়ে গেছি? আমার মুখময় অপমানের ব্রণ? আমি কি কোনোদিন দণ্ডী টেনে গণ্ডীর ভেতর শুকনো হাওয়ায় আগুন ধরাতে পারবো না? চিরটা কাল না-পারার পাতলা এনামেল আমার ভেতরকার কলাইয়ের ওপর চেপে বসে থাকবে!

দীপা সরকারী অফিসেই কাজ পেয়েছে। কিন্তু আমাদের ছোট দুই ভাই—অভিজিৎ আর কুন্দন—দু'জনের কেউই ডিসেম্বরে ক্লাস প্রোমোশন পেলো না। ইদানীং দেখছি—নিশীথের চিঠি আসা কমে গেছে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির কোন এক সময়ে সব কাগজে পয়লা পাতায় একটা ছবি ছাপা হল। রাষ্ট্রপতি মেরিন ইঞ্জিনীয়ারদের অ্যানুয়াল পাসিং আউট প্যারেডে স্যালুট নিচ্ছেন।

কুন্দন ভাইদের ভেতর সবচেয়ে ছোট। গায়ে সব সময় সিগারেটের গন্ধ। ছবির একজন অস্পষ্ট মেরিন ইঞ্জিনীয়ারকে দেখিয়ে বললো, ওই তো নিশীথদা—

দীপা চোখ সরিয়ে নিয়ে কাগজের পাশ থেকে উঠে গেল। এবার আমার খটকাটা আরও বিঁধে গেল মনে। তবে কি—তবে কি—

দাদা আসে না। আমি শুনেছি—মায়ের নামে মাসকাবারি মনি-অর্ডার পাঠানোর পর রিসিট ফিরে গেলে দাদা যে কাঁটায় লন্ড্রীর বিল গেঁথে রাখে—সেই কাঁটাতেই রিসিটের গতি হয়। বাবা এখন মক্কেলদের সঙ্গে বাইরে বাইরে কাটায়। তাদের সঙ্গেই বাইরে বাবার মাইফেল হয়। তারা বেশিরভাগই দাগী দারোগা। বাবা নিজেও একজন হাফ-বরখাস্ত পুলিস সাহেব।

মা আরও প্রতিবাদহীন হয়ে পড়েছেন। আর আমি তো মায়ের এই ধারার ছেলে! কিন্তু দীপা তো আমাদের একমাত্র বোন? কিছু একটা করা যায় না? কিছু একটা!

ঠিক করলাম—আজ নিশুতি রাতে আমি মাসীর ছোট ঘরটায় যাবো। এখন আমি আগের চেয়ে অনেক তুখোড়। নিজেকে অনেক দূরে ধরে রাখতে পারি। রেচক কথাটার মানে জানি। আজ রাতে একবার সর্বনাশী ঘাটে গেলে কেমন হয়? সেখানে পৌঁছে গিয়ে নিশীথের মনের ওপর ফিরে আসার কোন দাগ টানতে পারি না?

এখুনি কিছু একটা করা দরকার। এর পর খুব দেরি হয়ে যাবে। দীপা আমাদের একমাত্র বোন। অথচ আমাদের কিছু করার নেই। অল্পদিনের ভেতরেই নিশীথ হয় তো প্যাসিফিকে বেরিয়ে পড়বে। অ্যাটলান্টিকও হতে পারে। প্রথম স্বাধীন সমুদ্রযাত্রা। আমারই বোনটা ঘরের কোণে পড়ে পড়ে চোখের জল ফেলবে?

আমি যদি বয়ে গিয়ে থাকি (সে বিষয়ে এখনো সন্দেহ আছে পার্থ!)—খারাপই হয়ে থাকি—সত্যিই তো হয়েছি—ফার্স্ট এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় বসাই হয় নি—তাহলে না হয় আমি আরেকটু নীচেই নামি—মাসীর কাছ থেকে সর্বনাশী ঘাটের পরাবিদ্যাটুকু আদায় করে রাখি আজ!

পরা অপরা—দুটো কথাই মাসীর মুখে শুনেছি। মাসী একদিন আরেকটা কথা বলেছিল। কুম্ভক। ফাঁকা বাড়ীতে সেদিন দুপুরের দিকে সর্বনাশী ঘাটের পরিবেশ তৈরি করে নেয় মাসী। গায়ে সেই কাঁঠালী চাঁপার গন্ধ। আমি বুঝতে পারছি—আমার এম. বি. বি. এস. পড়া লাটে উঠলো। সরল ফিজিওলজি রাস্তার গবেটের পক্ষেও কিছু কঠিন জিনিস নয়। তাও আমি গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

নাই থেকে সারা কোমর দু' হাতে জড়িয়ে নিজের চোখ চেপে ধরলাম। দুটো চোখ। ভ্রূমধ্য রেখেছি নাইয়ের ওপর। নীচের থেকে নাকে উঠে আসছিল কাঁঠালী চাঁপার সেই গন্ধ। ফুটবল খেলে বেড়ানো আমার ফ্যাটলেস চ্যাপটা বুকখানা দুই উরুতে বিঁধছিল প্রায়। এ অবস্থায় মাসী তার বাঁ পা গুটিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটাকেও সারা মুদ্রায় সামিল করে নিল। মাসীর

পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ যেন ছুরির ফলা। মুদ্রা কথাটা মাসীর। বলা যায়, তার সারা শরীরটায় তখন মুদ্রা। ছিলটানা নির্মেদ-পিঠ আমার হাতের পাতায় এসে যাচ্ছিল। তার মানে মাসী নীচে নামছিল। আমি উঠে যাচ্ছিলাম উপরে।

এ ব্যবস্থা মাসীর। চানের আগে কেলি। কণ্ঠস্বর, গন্ধ, কথা, হাসি, আকর্ষণ, দৃষ্টি—এ সময় এক একদিন মাসী এই ছ'টা ঘোড়া ছেড়ে দেয়। আমি তেতো গেলে সরল করে নেয়। যাতে আরও থাকা যায়। এক সময় মনে হল ঠাণ্ডা জলের ওপর শুয়ে আছি। আমার মাথার চুল ভিজে গেছে। সাদা পরিষ্কার ফেনা সমেত জল বয়ে যাচ্ছিল আমার আধো বোজা চোখের ওপর দিয়ে। সে ধারার গতি আরেকবার টের পাওয়া গেল ধারাবাহী জলের ছোঁয়ায়। বয়েই যাচ্ছে। আমার দুই পায়ের শুরুর জোড় ছুঁয়ে। শরীর কী শীতল হয়ে যায়।

বুঝলাম মাসী তার 'কিরিয়ায়' এসে গেছে। এখন সে ভূতে পাওয়া সরলা বা চপলা বা দুটোই। আভাসে ধরে নিলাম মাসী পাল্টাচ্ছে। অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কোন্ দিক নেবে তাও জানি না।

দেখলাম, গ্রীষ্মের ঠা ঠা দুপুরে আমি একটা নদীর পাড়ে এসে পড়েছি। বিরাট বিরাট গাছের ছায়ার ভেতর থেকে চকচকে নদীর জল দেখতে কি সুন্দর। বাতাস উসকে দিয়ে তাতে ঢেউ তুলছিল। আমার আশপাশে যেখানে যেখানে গাছের মাথা ফুঁড়ে রোদ ঢুকতে পেরেছে—সেখানে সেখানে চকচকে সব চৌকো। তাতেই সারা গাছতলা জুড়ে তেজী আলোর ধোঁয়া মাটি থেকে হাতখানেক ওপরে উঠে ঝুলে আছে।

এই সময় দূর থেকে একতারার সঙ্গে সুর উঠে আসছিল। পুরুষের ভারী গলা। কথা বোঝা যায় না। খুব শান্ত স্বর। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী ব্যাপার? এটাই কী সর্বনাশীর ঘাট? আমার পাশে কেউ নেই যে—

আমার মনের কথা পড়লো কি করে মাসী? আশ্চর্য। সব সময় কি কেউ পাশে থাকে পার্থ?

এ গলার স্বরে ফিরে তাকাই। আমরা কোথায় এখন তাহলে? মনে মনে ভাবছি আর দেখি—গাছতলায় মোটা গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে খয়েরি বাকলের পটে মাসী বিঁধে আছে। ডান পা ভাঁজ করে গাছের গুঁড়িতে ঠেসানো। খুব আটপৌরে ভাবে। হাসি-হাসি মুখে।

আমি আরও কি কথা বলতে যাচ্ছিলাম। গোছানো কথা হারিয়ে ফেললাম। একতারার সঙ্গে সেই শান্ত, ভারী পুরুষ গলার সুর আমাদের গাছতলায় এসে গেল। এ যে একেবারে ভারী কান্না। বাউলের কোলে কানি চাপা শিশু। বোধ হয় ভাসিয়ে দিতে এসেছে। সঙ্গিনীর হাতে একতারা। আঙুল থেমে নেই। ওরা আমাদের দেখতেই পেলো না।

একতারা সামলে শিশুটি কোলে নিল সঙ্গিনী। বাউলের গলায় আর গান নেই। সে গাছের গুঁড়ির পাশ দিয়ে নদীর নাবি জমিতে নামলো। তারপর কোমরে গোঁজা ছোট খন্তাটা দিয়ে ভিজে মাটি কোপাতে লাগল।

মাসী বলল, কবর দেবে। জাতকের প্রাণ নেই।

দেখছিলাম আমিও। তোলা মাটি সরিয়ে নীচে গর্তে শুইয়ে দিচ্ছে। লাল রঙের শিশু।

মাসী বলল, মাত্র ক'দিনের বাচ্চা। আমাদের আমতাতেও এমন বাউল আছে। ওরা কবর দেয়। মাগুর মাছ ঘষে নিয়ে সাদা করে আগে—তারপর রান্না চাপায়।

মাটি চাপা দিয়ে ওরা চলে গেল। যেমন এসেছিল—তেমনি। খাঁ খাঁ দুপুরের সাদা রোদ্দুরে ওরা এক সময় হারিয়ে গেল। এই ছায়ায় বসে অত দূর দেখা যায় না। পশ্চিমে শুধু এক খাবলা লোকালয়। ওদের ভারী গলার শান্ত সুর মাখানো গানখানা পড়েছিল গাছতলায়। কথা আলাদা করা যায় না। নদীর বাতাসে সুরটা উসকে গিয়ে ফিরে আসছিল। এই তাহলে সর্বনাশীর ঘাট।

যেমন ভেবেছি, অমনি মাসী বলে উঠলো, এখন হয়েছে কি! আরো আছে।

ফিরে তাকিয়ে দেখি, গাছতলায় সুতোর ফুল তোলা বড় চটের আসনে বসে মাসী খোঁপা ভেঙে ফের বাঁধছে। পা দু'খানা মুড়ে পেছনে ফেরানো। দু' হাত সুন্দর করে তোলা। বুক একদম পাথর। কালো ভেলভেটে ঢাকা। তেরছা করে শাড়ির সবুজ পাড় কাঁধে ফেরানো। আমার ফিরে দেখা ওর চোখে ধরা পড়ে গেল। ফিক করে হেসে বললো, এই সর্বনাশীর ঘাটে তোমায় আবার আসতে হবে বলে দিলাম। দেখো।

কথাটা শুনে আমি ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলাম। মন বলছিল, মাসী, তুমিই আমার সর্বনাশী।

মাসী আমার মনের কথা ঠিক বুঝলো, অনেকখানি করে পিরিচ ভাঙা হাসি হাসল প্রথম। তারপর অল্প হেসে বললো, সত্যিই তো পার্থ—আমি শেষে তোমারই সর্বনাশী।

আমি ফস করে বলে বসলাম, দীপার জীবনটা সুন্দর হতে পারতো। নিশীথ আর চিঠিও দেয় না।

দেবে কি! তোমাদের বৌদিদি কলকাঠি নাড়ছে।

তবু নিশীথ তো একটা ছেলে। দীপা কাজে ঢুকে ইস্তক কোনো দিকে আর চায় না। অফিস ফেরত বাড়ি এসে সেই যে ঢুকবে—আর বেরোবে পরদিন—অফিসের জন্যে।

বড় গাছে দড়ি বাঁধা কেন বাপু! খোকন তো ছিলোই হাতের কাছে।

তুমিই তো খোকনকে টেনে রেখেছিলে তখন।

আমার কথা বাদ দাও। আমি এক পাগলি ভৈরবী। তোমার পিরিতিই আমার বালির বাঁধ—নাও, ঠিক হয়ে শোও।

সত্যিই তো। আমরা তো আর গাছতলায় নেই। গরমকালের প্রথম বৈকালীন কালবোশেখী ঝড় আসছে বোধহয়। দূরে ফ্লাইং ক্লাবের এয়ার-স্ট্রিপ নজর করে একটা ক্ষুদে টাইগার মথ ডানা কাঁপিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি নেমে পড়ছে মনে হল। বাড়ি ফাঁকা। খোলা জানলা দিয়ে সব দেখা যায়।

আমি খানিকটা নেমে এলাম। আবার মাসীর নাইয়ে আমার ভ্রূমধ্য চেপে বসলো। চোখ দু'খানা দিয়ে ফের ভিজে জলকণা বোঝাই একটা ধারা নীচে নামছিল—সেই পরিচিত কাঁঠালি চাঁপার গন্ধটা তাড়িয়ে নিয়ে। আমার দু'হাত মাসীর পিঠের, কোমরের নাবি দিকটাই জড়িয়ে ছিল। বল পেটানো আমার শরীরের চ্যাপ্টা বুকখানা মাসীর দু'পায়ের শুরুর জোড় আগাগোড়া ঢেকে রেখেছিল।

মাসী খুব সুখের গলায় একটু আদেশ মিশিয়ে বললো, ধারণ সামলাও। ধরে রাখতে শেখো নিজেকে। সর্বনাশীঘাটের গাছতলায় আমার চেহারাটা ভুলে যাও তো। নয় তো শেষে কাঁদতে বসবে—আমি পারি নি—আমি পারি নি বলে—

আমায় কিছু একটা দাও মাসী।

ওমা! সবই তো দিয়েছি। আবার কি দেবো গো?

আমায় কোন শক্তি দাও।

আমিই তো তোমার শক্তি। ভৈরবী বলতে পারো।

আমার চোখ চাপা ছিল ওরই ঠাণ্ডা পেটের পাতে—উপুড় করে রাখা আমার চোখ। সে চোখের ওপর দিয়ে ভিজে জলকণা ধারা হয়ে নেমেই যাচ্ছিল। অথচ আমি তখনো মাসীর মুখ দেখতে পাচ্ছি।

আমায় কিছু দাও—কিছু একটা শক্তি—

কি করবে? তাই দিয়ে বশ করে বেড়াবে? যাকে চোখে ধরবে—তাকেই বশ করবে! ওটি হচ্ছে না। চালাকি রাখো। এসো। মনটাকে এবার নিজের দু'ই ভ্রূর মাঝখানে আনো। দ্যাখো তো কোন পলতের আলো—এই যেমন হেরিকেনের শিখা—দেখতে পাও কিনা? ওটাই তোমার মন। সেই মনকে বশ করো। তখনই সব ক্ষমতা তোমার। নিজেকে ধরেও রাখতে পারবে সহজে। পারি নি—পারি নি বলে কাঁদতে হবে না কোনদিন।

আমি কি মাসী চিরকাল এভাবে কাটাবো? তুমি চোখ তুলে চাইবে—আর আমি ছুটে যাবো?

ওমা! তাই বলেছি। ওই তো তোমার সর্বনাশী ঘাট।

সত্যিই তাই। নদীতে বিকেলের ছায়া এখন। চটের আসনটা তুলে দিয়ে মাসী গিয়ে নদীর পাড়ে দাঁড়ালো। আমি মাসীর দিকে যাচ্ছিলাম। মাসী

নদীর দিকে তাকিয়ে বললো, সর্বনাশী ঘাট—আসলে বৃত্তসাধকদের ঘাট। তাঁরা এখানে আসেন। তোমার যা চাইবার চেয়ে নাও।

আমি পেছন থেকে মাসীকে জড়িয়ে ধরলাম। লোভ! লোভ!! মাসী তোমার জন্যে লোভ যায় না আমার। মনে মনে বলছি আর জেনেশুনে সব হারাচ্ছি—তাও বুঝতে পারছি। এখন মাসীর বানানো সর্বনাশী ঘাটে অলৌকিক আলো। না সন্ধ্যে—না বিকেল। গরমকালের পোড়া বাতাস নদীর বুকে ঠাণ্ডা হতে ছুটে যাচ্ছিল। সেই সুবাদে গাছতলার সব ডালপালার পাতাগুলো একই দিকে ঝোঁক নিয়ে দুলে উঠছে।

মাসী ঠিক মনের ভেতরের কথা কুড়িয়ে নেয়। লোভ কেন ভাবছো গো? শেষে একটা ক্ষমতা চাইতে এসে লোভানী দেওয়ার দায়ে সর্বনাশা ঘাটে আমায় যেন পাতকী কোরো না—বলে দিলাম—হ্যাঁ।

মাসী আমার দু' হাতের জড়ানোর ভেতর ঘুরে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছে। চোখে সেই এক কোণ দিয়ে তাকানো কটাক্ষ। তারপর তো কামিনী কাঁটা গন্ধ। আমি আর ফিরি কি করে! আমি আমার ফার্স্ট এম. বি. বি. এস.-র কিছুই বুঝি না এখন। ফুটবলে পা দিই নি কত দিন। দাদা মনি-অর্ডারের রিসিট গেঁথে রাখে লন্ড্রীর বিলের সঙ্গে—একই কাঁটায়। দীপা সারাদিন চাকরি করে। আর ফিরে এসে নিজের খাট থেকে ওঠেই না। থার্ড কন-সিডারেশনেও অভিজিৎ বা কুন্দন—কেউই ক্লাস প্রোমোশন পায় নি। পুলিস সাহেব নিত্যানন্দ দত্তগুপ্ত দাগী দারোগাদের নিত্যসঙ্গী এখন। নিশীথ হয়তো তার প্রথম স্বাধীন সমুদ্রযাত্রায় এখন মহাসমুদ্রে ভাসছে। জাহাজটা নিশ্চয় সাদা রঙের। রেলিঙের পাশে সবুজ বর্ডার। সঙ্গে সরু একটা লাল লাইন। চারদিকে শুধু নীল জল।

সর্বনাশী ঘাটে দাঁড়িয়ে ভাবলেই সব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি তোমায় কি পাতকী করবো মাসী? পাপ তো আমি ছোটবেলা থেকেই করে আসছি।

মাসী এ কথাও আমার মন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে হাসলো। জানি। পাপ কিন্তু তোমায় ছোঁয় নি পার্থ।

আমি অনেক দিনের পাপী। তার দাম দেবো জীবন দিয়ে।

আমার জড়ানো বন্ধনটা আরও গাঢ় করতেই মাসী বুকের পাথর দু'খানা আমার বুকে রাখলো। বুঝলে - একটা কথা মনে রাখবে—আমি তোমায় বুঝে ফেলি—পড়তে পারি তোমায়—এত নিরাশ কেন? কি হারিয়েছো তুমি? আশাভঙ্গ কোথায় তোমার? এখন তো সুখে ভাসবে—

হাসবার চেষ্টা করলাম। ভাসছি তো মাসী!

বৃত্তসাধকদের ঘাটে এসে মন খারাপ করতে নেই। ওই দ্যাখো—ভৈরবী এসে গেল যার যার ঘরে!

মাসীকে ছেড়ে ফিরে তাকাই। গাছতলা দিয়ে ছ' সাতখানা খোড়ো ঘর। এক চালীর। নদীর দিকে মুখ করে চালের ঢাল। বোঝাই যায়—ক'দিনের বসবাসের জন্যে মাত্র—তারপর যে যারটা ফেলে চলে যাবে—ফিরেও তাকাবে না। হয়তো নদীর গায়ে ভাসা মড়াখেগো গদাই কুকুরগুলো বৃষ্টির রাতে লাল চোখ বুজে চালের নীচে আশ্রয় নেবে। ভোর হলেই জলের ধারে ধারে ফিরবে —ভাসা মাংস খাওয়ার অভ্যেসে ভোমা চেহারা সব ক'টার।

ঘর না বলে কুটীর বলা ভাল। সবকটা চালের নীচে একজন করে মাসী বসে। এলো চুল। চোখের চাওয়া গোলমাল হয়ে যায়। আমি যার দিকে তাকাই—সেই মাসীই পাল্টা হেসে তাকায়। ফিরে পাশে তাকিয়ে দেখি, আমার মাসী তো নেই।

এতক্ষণ মাসী যে বৃত্তসাধকদের কথা বলছিল—তাঁদেরই একজন গাছতলায় মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। মিশমিশে কালো। তাতে লাল টকটকে ধুতি পা থেকে কিছুটা তোলা। খালি গা। মেদ নেই। মাথায় চুলের ঢালটি কোঁকড়ানো। দিব্যি নদীর পাড় ধরে তিনি এগিয়ে গেলেন ফাঁপা মাটিতে ঢাকা খানিক আগের সেই শিশু কবরে। তারপর কার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। শেষে উবু হয়ে দু' হাতে মাটি চাপা দেওয়া লাল বাচ্চাটাকে ঝেড়ে-ঝুড়ে ডান হাতে শূন্যে তুললেন।

আবার দেখলাম—সাদা রঙের কচি একটা ছাগলছানা সেটা। এবারে ওকে শূন্যে তুলে বৃত্তসাধক ঝাঁকালেন—ঘোরালেন। ছাগটা মানুষের ছা হয়ে গেল আবার। তখন বৃত্তসাধক ওর মুখে মুখ দিয়ে—ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ফিট করে গাল ফুলিয়ে—যেন কোন শঙ্খ বাজাচ্ছেন—ফুঁ দিলেন। একটু আগের কবর চাপা শিশু এখন মানুষের গলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠলো।

নদীর দিকে এলোমেলো চোখে তাকিয়ে বৃত্তসাধক বাচ্চাটাকে ছুঁড়ে দিলেন। খোপের পায়রা যেভাবে বাসায় ফেরে—প্রায় তেমনি বাচ্চাটা গিয়ে নিজের কবরে পড়লো। বৃত্তসাধক তখন এগিয়ে গিয়ে পায়ে গোরের মাটি আবার ফিরিয়ে দিলেন। এবার তাঁর চোখ পড়েছে কুটীরে। এগনো দেখে বুঝতে পারি নি—কোন্ কুটীর? কোন্ মাসী? এক মাসীকে জবরদস্ত হাতে পাকড়াও করে তিনি খোড়ো ঘরে ঢুকছেন—আমার বুকের ভেতরে হাড়ে মাংস জড়ানো জায়গায় যন্ত্রণা করে উঠলো।

উঃ! এত হিংসে? দেখি—কোন্ জায়গায় ব্যথা করছে?

আমাদের সেদিন দুপুরের ফাঁকা বাড়ির জানলায় তখনো ঘোর কাল-বোশেখী। ফ্লাইং ক্লাবের সরু এয়ারস্ট্রিপে এইসব সময় খুঁটির মাথায় কাপড়ের একটা নল উড়িয়ে রাখে। চুনে হলুদ আর লালে মেশানো রঙ। ঝড়ের ভেতরেও আকাশ থেকে দেখতে পাবে পাইলট। সেই কাপড়ের নলটাই উড়ছে। একটা শব্দ হল। দেখি। ওঠো এবারে। জামাইবাবু এলেন ওই।

আমি কিন্তু কোন গাড়ির শব্দ পাই নি।

আমি পেয়েছি, বলেই মাসী উঠে দাঁড়ালো। রাগ হাতে খোঁপা, আঁচল সুমসাম করে নিল মাসী। ওর ওঠার ঠেলায় পড়ে যাচ্ছিলাম। মাসীই বললো, তোমার টেবিলে ডাক্তারি বই তো খোলাই পড়ে আছে। যাও না—চেয়ারে বসে পড়ে পড়াশুনোর ঢং করো। বড়দি খুশী হবে দেখলে।

বারান্দার নীচে মা-বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাড়ির পেছনের বুটে ড্রাইভারকে দিয়ে কি তোলাচ্ছেন। অনেকদিন পরে দু'জনে একসঙ্গে কি কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। মাসীর বড়দি মানে আমার মা। আমার মুখে এসে গেল—মাসী। তোমার বৃত্তসাধকদের আমার জন্যে একটু বলে দাও না। যাতে আরবারে ফার্স্ট এম. বি. বি. এস. উতরে যাই।

উঁহু। বৃত্তসাধক শীগগিরি কাজে আসবে তোমার।

সত্যি!

অন্য কাজে। আমার পেটে কাঁটা বিঁধেছে গো!

না বুঝে বললাম, কি—কিসের কাঁটা?

মাসী যেতে যেতে বললো, তুমি যে বাপ হতে চললে! বলতেই ভুলে গেছি।

মাসী চলে গেল ভেতর বারান্দায়। দেখতেই পাচ্ছি—শুকোতে দেওয়া জামা-কাপড় গুছিয়ে তোলার ভানে ডুবে গেল মুহূর্তে। মা আসছিলেন এ ঘরে। আমি তখনো তাড়াতাড়ি করে দক্ষিণের ঘরের পড়ার টেবিলে খোলা অ্যানাটমির সামনে গিয়ে চেয়ারে বসে যেতে পারি।

কিন্তু পারলাম না। আমি বাবা হতে চলেছি? পেটে কাঁটা বিঁধে যাওয়া মানে তাহলে প্রেগনানসি? মাসীর পেটে আমার বাচ্চা? এমন সময় মাসী হেসে রসিকতা করতে পারে? আমার পা ঠাণ্ডা থাম হয়ে মেঝেতে আটকে গেল। মা এ-ঘরে না এসে বারান্দায় গেলেন আগে। তাঁকে দেখে মাসী এগিয়ে গেল। বড়দি—কী ঝড় এসেছিল, কি বলবো তোমায়!

আমি দাঁত দাঁতে চেপে বললাম, বিচ্! পিওর বিচ্!!

বর্ষার বিকেলে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের সরু এয়ার-স্ট্রিপটা ভিজছিল পড়ে পড়ে। আজ তিন দিন হল পার্থ বাড়ি ফেরে নি। পার্থর মা আমায় খুঁজতে বললেন পার্থকে। দুপুর দুপুর অফিস থেকে ফিরে এলো দীপা। আমি বললাম, দাদার ওখানে যায় নি তো?

না খোকনদা। দাদা-বৌদির ওখানে যাবার ছেলে নয়।

হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি কিছু জানো না খোকনদা? তুমি ওর এত বন্ধু।

আমি কি করে জানবো? বেশ কিছুদিন পার্থ তো আমার সঙ্গে বলতে গেলে মেশেই না। সেই মেডিক্যালে ভর্তির পর থেকে—

তাই বুঝি। তোমরা ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। সেই থ্রি ফোরের থেকে।

আমি খারাপ স্টুডেন্ট। ও তো কোনদিন আমার সঙ্গে তেমন মেশে নি। নীচু ক্লাসে আমি ওকে পড়াশুনোয় অলৌকিক মানুষ মনে করতাম। তাই আমিই আগ বাড়িয়ে মিশেছি।

দীপা গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকালো। একটু খুঁজে দেখা দরকার। মাসীকে জিজ্ঞাসা করো তো।

দীপার চোখ খুব ক্লান্ত। মাসী ওদের মাসী। আমি বাইরের লোক। আলাদা করে কি জিজ্ঞাসা করবো? তবু গেলাম মাসীর কাছে। নির্বিকার। খুব মন দিয়ে বিচি বার করে নেওয়া আচারের পাকা তেঁতুল তুলছিল। আমায় দেখে বললো, তোমার ওখানে যায় নি পার্থ?

না তো।

তাহলে কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে?

আমিও তো তাই জানতে চাইছি মাসী। তুমি কিছু জানো?

আমি? আমি তোমাদের ছেলেদের কথা আলাদা করে কি জানবো?

তোমায় কিছু বলে গেছে?

আমায় আলাদা করে বলে যাবে কেন খোকন?

মনে মনে নিজেকে বললাম, তাও তো ঠিক। কোশ্চেনটা বোকার মত করেছি।

ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাইরে এলাম। আমার পেছনে পার্থদের বাড়িটা ভিজছে। ওদের সংসার এক সময় উৎসবের জায়গা ছিল। নিত্যানন্দ দত্ত-গুপ্ত নতুন টাকা পুরনো টাকা অনর্গল আয় করে। কিন্তু সেই উৎসব আর নেই ও বাড়িতে। বড় রাস্তায় যাবার বদলে আমি এক সময় দেখলাম, ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটছি। আর খানিক গেলেই ফ্লাইং ক্লাবের এয়ার-স্ট্রিপ। দূরে দূরে ডালপালা বোঝাই সব গাছ জলে সপসপে অবস্থা।

দীপা অনেকদিন পরে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বললো। আমি যে ওদের সংসারের একজন নিজের লোক, সে জ্ঞান টনটনে আছে। নাই বা পারি খোকনদার ভালবাসা নিতে—বাড়ির দরকারে খোকনদাকে দিয়ে নিজের ভাইয়ের তত্ত্বতাবাস করতে অসুবিধে কোথায়! আমি প্রয়োজনীয়—এটা অস্বীকার করার উপায় নেই দীপার। ইদানীং কেন? বেশ কিছুদিন দীপাকে না পাওয়ার যন্ত্রণাটা আমি আর বোধ করি না। বরং যন্ত্রণার জায়গায় পুরনো একটা অবসাদ মনের এক কোণে ঘুমিয়ে থাকে সব সময়। আমি বি. এ. পরীক্ষায় বসবো সামনের বছর। সায়েন্সের মত আর্টসে দেখছি নম্বর তোলা সহজ নয়।

এয়ার স্ট্রিপের কাছাকাছি গিয়ে ভিজছিলাম। বিকেল মুছে যাবার যোগাড়। এরকম একটা নিসর্গ নিশ্চয় শীগগিরি আমার কোন গল্পে জন্ম নেবে। যোধপুর পার্ক বলে একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে। গড়িয়াহাট থেকে ঢাকুরিয়া যাবার পথে রেল লাইন পেরোলেই ডান হাতে কচুরিপানা ঢাকা বিরাট পুকুর। তার সামনে একটা ভাঙা একতলায় একটি মেয়েকে অঙ্ক কষাই। মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখের পলক ফেলে না। একে দিয়ে আমার কিছু হবে না। নরেনদা—নরেন্দ্রনাথ মিত্র আমার একটা গল্প পড়ে প্রশংসা করেছেন খুব। শুনলাম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার কোন আলাপ নেই। কি পরিচয় দিয়ে গিয়ে কথা বলবো! নিজের জন্য আমার খুব লজ্জা হয়। যেমন দীপাকে আমার কী দিয়ে জোর করতে পারি?

এই খোকন। শোন—

চমকে উঠেছি। কাছাকাছি তো কেউ নেই।

শোন না।

এবার খুব কাছের থেকে। বাঁ হাতে একটা বাতিল আলোঘর। এক সময় হয়তো এয়ার-স্ট্রিপের শেষ প্রান্তে ওখানে সার্চ লাইট ঘুরতো। চার ফুট বাই চার ফুট ছোট্ট ঘর। ছাদের অ্যাসবেস্টস আধখানা ভাঙা, দরজা খুলে নিয়ে গেছে কারা। ভাঙা সিমেন্টের তাকে সার্চ লাইটের জায়গায় পার্থ বসে। আয় না। সেই থেকে ডাকছি।

তুই এখানে? আর সবাইকে তিন দিন ধরে চিন্তায় ঝুলিয়ে রেখেছিস?

ভিজছিস কেন শুধু শুধু? ভেতরে এসে বোস। ছাদ তো আছে

খানিকটা—আয় খোকন।

ওতে জল আটকায় না। ওখানে আমি বসবো না। আলো নেই। ভাঙা। সাপ-খোপ থাকতে পারে।

যা বলেছিস। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। বৃষ্টি চেপে আসছে। সাপেদের আইডিয়াল হলিডে হোম। তারপর পার্থ থেমে বললো, আজ ওঁরা একজনও এখানে আসেন নি— যতদূর আমি জানি। তুই নির্ভয়ে বসতে পারিস খোকন।

অগত্যা। আমিও বসলাম ভেতরে—গুটিসুটি মেরে কোনক্রমে—হাঁটুর কাছে ধুতি ছিঁড়ে গেল খানিকটা—আর অমনি ঝেঁপে বৃষ্টি এলো। বড় বড় ফোঁটায়। ভাঙা ছাদের দিকটায় জল গড়িয়ে এসে ডান দিকটা নাইয়ে দিল আমার। সন্ধ্যের আগেই সন্ধ্যের দশা।

একটু বোস না কষ্ট করে। কি হয়েছে? দ্যাখ তো— এয়ার স্ট্রিপে পড়ে বড় ফোঁটাগুলো কাঁচগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

অনেক হয়েছে। এবার বাড়ি চল। এটা প্রকৃতির শোভা দেখার সময় নয়।

আমার ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না খোকন। কিচ্ছু নেই ওখানে। কি আছে ওখানে?

বাঃ তা বললে চলবে কেন? ওখানে ওদের সঙ্গে তুই বড় হয়েছিস। তোর কি হয়েছে বল তো? শুনলাম—ফার্স্ট এম. বি. বি. এস. দিস নি। এর পর তো তাড়িয়ে দেবে কলেজ।

দিয়েছে। আমার আর কোনদিন ডাক্তার হবার চান্স নেই।

কোনদিক থেকেই তো তোর কোন অভাব ছিল না পার্থ।

ওসব কথা থাক। দেশলাই আছে? বলে নিজেই নিজের পকেট হাতড়ালো। দেশলাইয়ের বদলে ছোট্ট একটা বই পড়ে গেল।

কুড়িয়ে দিতে গিয়ে দেখি রেসের বই। রেস খেলছিস?

তা খেলছি! আমার শীগগির অনেক টাকা দরকার।

কী করবি টাকা দিয়ে?

সে শুনে তোর কি হবে! তবে শুনে রাখ—অনেক টাকা পেলে আমি আবার গোড়া থেকে জীবন শুরু করতাম।

সেই ক্লাস থ্রি থেকে পার্থ?

না। অত পিছিয়ে যাবার দরকার নেই। আমার এই তিন-চার বছরের জীবনটা—আমার বাবার এই কয়েক বছরে বদলে যাওয়া—বৌদির খপ্পরে দাদার এই সামারসল্ট—সব আমি উল্টো করে দিতাম। রিপেয়ার করে জীবনটা —আমাদের বাড়িটা—সংসার—সব আমি বছর পাঁচেক আগে ফিরে গিয়ে ফের শুরু করাতাম।

শোন পার্থ। তোর দাদা সাবালক। তুইও নিশ্চয় নাবালক নস। টাকা দিয়ে পাস্ট পাল্টানো যায় না। বড় জোর সামান্য উপশম করাতে পারিস।

ওপর ওপর দিয়ে। তার বেশি কিছু নয়।

টাকায় সব হয় খোকন। টাকা একটা পাওয়ার। বাবাকে দেখিস নে সব অন্যায় করে কেমন পার পেয়ে যাচ্ছে। পরমায়ু বেড়ে গেছে লোকটার—পুরনো, নতুন, আবার পুরনো—আবার নতুন টাকা নেড়ে-চেড়ে! ঘুষ খেয়ে রিটায়ার। রিটায়ার করে ঘুষখোরদের হয়ে ওকালতি—সেই সুবাদে পয়সা কড়ি নিত্যানন্দের নিত্য দারোগাসঙ্গর পুণ্যফলে! আমার ঘেন্না করে খোকন।

রেস না খেলে তোর এত দরকারের টাকা নিজের বাবার কাছ থেকে চেয়ে নে।

বাবা চান—মায়ের মত সবাই তাঁর কাছে চাক। আর তিনি গুনে গুনে দেবেন। গুনে গুনে হিসেব চাইবেন। তাইতো দীপা চেষ্টা-চরিত্র করে চাকরি জুটিয়েছে। পাছে বাবার কাছে চাইতে হয়। তাই—

এত টাকা রোজগার করেও?

হ্যাঁ। তাই দিয়ে গাড়ি চড়বে। বাইরে বড়লোকি। বাজার করবে ইচ্ছেমত। হুইস্কি আনাবে বোতল বোতল। বাড়ি ভাড়া আর সংসার খরচটা ঠেকিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে নেবে।

কিন্তু রেস খেলে কি টাকা পাওয়া যায়।

অন্ধকারে ফ্লাইং ক্লাবের আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সেদিকে সিগারেটের লাল আগুনটুকু তুলে ধরে পার্থ গম্ভীর গলায় বললো, আমার অনেক টাকা দরকার। যে কোন দামে সে টাকা আমার চাই।

নে। চল। রাত হয়ে যাচ্ছে পার্থ। বলে তো ওকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি। তখনো ওদিকে হরিদেবপুর, রবীন্দ্রনগর হয় নি। ঠিক মনে পড়ছে না। হয়তো হরিদেবপুর, রবীন্দ্রনগর ছিল। কিন্তু নতুন নতুন বাড়ি একটাও ওঠে নি। ইলেকট্রিক যায় নি। নির্জন। এত নির্জন যে মনে হবে, ভগবান ওখানে বসেই দুই বাটি পৃথিবী জোড়া দিয়ে এই মাটির পৃথিবীটা বানিয়েছিল।

পার্থর সঙ্গে হাঁটছি—আর বৃষ্টির ভেতরেই পার্থর মাথার ভেতর কী একটা পাকিয়ে ওঠার শুকনো গন্ধ পাচ্ছি। তিন দিন কোথায় ছিল? নিশ্চয় ঠায় বাহাত্তর ঘণ্টা ওই ঘুপচি ঘরে ছিল না। তাহলে? আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। পিঠে হাত দিলাম পার্থর। কী হয়েছে বল তো তোর? কারও প্রেমে পড়েছিস?

প্রেমে পড়লে অনেক ভাল অবস্থায় থাকতাম খোকন।

পার্থর তাহলে কী হতে পারে? কোথাও কোন বড় টাকার দায়ে আটকে গেছে। যেভাবে কথা বললো, অন্ধকার হলেও বুঝতে পারলাম—পার্থ ভেতরে ভেতরে সব সময় কিসের চিন্তায় ডুবে আছে—মাঝে মধ্যে আমাদের দু' একটা কথায় ভেসে ওঠে শুধু। আবার ডুবে যায়। কী হতে পারে?

বললাম, তুই কি কোন বিপদে পড়েছিস? খুলে বল না আমায়।

না। কিছু না। বলে পার্থ ওদের বাড়ির গেট খুলে ঢুকে গেল। আমি

সঙ্গে যাচ্ছি কিনা ফিরেও দেখলো না। তার মানে আবার নিজের ভেতরকার অনবরত কুরে খাওয়া কোন চিন্তায় ডুবে গেছে ভুস করে। এ অবস্থায় আমার ভেতরে গিয়ে কোন কাজ হবে না। গেট থেকেই আমি ফিরে গেলাম। কী হয়ে থাকতে পারে পার্থ'র ?—তাই ভাবতে ভাবতে। অবশ্য এখন পার্থকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলে দীপার কাছে নগদ ক্রেডিট পাওয়া যেতো।

তিন দিন পরে আমাকে দেখে মায়ের মুখের হাসি কোন আনন্দ দিতে পারলো না আমাকে। বরং মনে হল—মা তো কিছুই জানেন না। যেমন জানে না খোকন। মাকে বড় করুণ লাগলো। কোন কিছু জানতে না চেয়ে তিন টাকার বাতাসা আনিয়ে মা হরির লুট দিলেন। অনেকদিন পরে আমার এই ফিরে আসা নিয়ে আনন্দে অভিজিৎ আর কুন্দন মেঝেতে বাতাসা কুড়োলো। দীপা হাসলো। এমন কি মায়ের কথায় মাসী একটা গান গাইলো। শ্যামা সঙ্গীতের সুরে।

সেই রাতেই ছোট ঘরে ঢুকে পড়লাম পা টিপে টিপে। মাসী তৈরীই ছিল। বললো, ওসব কিছু আর করতে হবে না।

আমি কেঁপে গেলাম। যে চিন্তায় আজ তিন দিন আমি নার্সিংহোমের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি—ডাক্তারকে বলতে গিয়েও বলতে পারি নি—লজ্জা, ভয়, টাকা, সম্মান—কত কি রয়েছে এ-পথে—আর সে ব্যাপারে মাসী এত নির্বিকার ?

কি হলো ? কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছো—এখন তো ক'মাস নিশ্চিন্ত তোমার।

আমি গলা টিপে ধরবো কিনা ভাবছি। অন্ধকার। জোরে কথা বললে জেগে যেতে পারে সবাই। ফিসফিস করেই বললাম, নিশ্চিন্ত তো তুমি। কি কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসে আছো—ভেবেছো একবারও ?

মাসী বিশেষ ফিসফিসে গেল না। চাপা গলায় বললো, বাধালে তো তুমি।

চুপ করো। চুপ করো।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল মাসী। আমি রাগে, জেদে—বিশেষ করে এমন নির্বিকার অথচ দোষ চাপাতে চৌকস মেয়েলোকের নির্বিকার বোলবোলাও ভেঙে দিতে দিগ্বিদিক গুঁড়ো করে দিতে চাইলাম অন্ধকারে। মাসীকে ভীষণ জোরে খুঁড়ে যেতে লাগলাম। যেন অন্ধকার ছিঁড়ছি। অন্ধকার বা মাসী কোন এক প্রকারের তুলো। কারও ফাটা বালিশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে হঠাৎ। মাসীর নিজের ভাষায় এটা হল গিয়ে কাজে বসা মাসী তার 'কিরিয়ায়' মেতে গেল।

খানিক বাদে আমার নীচের অন্ধকার শান্ত হল। উঠে গিয়ে খুব সাবধানে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে দিলাম। খেয়ে গ্লাসটা আমার হাতে দিল আন্দাজে। তুমি খেলে না ?

না। আমার দরকার নেই।

মাসী আবার দু'হাতে আমায় টানলো। আমি অত স্বার্থপর নই। এসো।

খুব চাপা গলায় বললাম, না। থাক আজ। মাসী জানে কোন্ দিন আমার জল খাওয়ার দরকার পড়ে না।

এই তো তুমি বৃত্তসাধক হয়ে উঠছো। এই দ্যাখো—আনন্দে আমার বুক কাঁপছে। কে বলবে—এই তুমিই একদিন আমি পারি নি, পারি নি বলে কেঁদে উঠেছিলে। নিজেকে ধরে রাখতে পারাই সব সাধনার বড় সাধনা পার্থ।

ফিসফিস করেই বললাম, ভাষণ বন্ধ করো মাসী, আনন্দ করার অনেক সময় পাবে পরে। এখন আমায় বাঁচাও মাসী। আমি আর ভাবতে পারছি না।

বালাই। তুমি কেন মরতে যাবে!

আমি অন্ধকারে অনেকদিন পরে মাসীর চোখের সাদা আবার দেখতে পেলাম। তুমি কি কিছু ভাবো না, না তোমার কোন মাথা নেই?

মেয়েছেলের আবার মাথা থাকে নাকি বেশি?

উঃ! আমি মাসীর ওপরের আবখানা দুহাতে তুলে ধরে নিজের সঙ্গে জুড়ে নিলাম। তোমার তো অনেক ক্ষমতা। এ যাত্রা বাঁচাও। আমি ডাক্তারখানার দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। ডাক্তারকে বলতে পারি নি। তুমি একটা ক্ষমতা দেখাও না। আমার কি অত টাকা আছে? ডাক্তার তো তার কাছে গেলে ছাড়বে না।

কেন বল তো? পেটের কাঁটাটা খসাতে বলছো তো?

এও বুঝিয়ে বলতে হবে? ফিসফিস করে অনবরত কথা বলতে হচ্ছিল। ঠোঁট গরম হয়ে থুতু ছুটে যাচ্ছিল। বাঁ হাত উল্টে মুছে বললাম, সত্যি করে বল তো মাসী—তুমি কে? কে তুমি মাসী?

খামোকা অত ভাবার কিছু নেই। তোমায় তো সর্বনাশী ঘাটে যেতেই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

তুমি কে মাসী? সত্যি করে বলো? আমায় চেনা দাও। মাসী তুমি কে? কে তুমি?

দু' হাতে আমায় সমান তেজে কাছে নিলো মাসী। দ্যাখোই না কে আমি! একদিন তুমি বৃত্তসাধক হবে দেখছি। সেদিনের আর বিশেষ দেরি নেই পার্থ।

একটু পরে দেখলাম, আমার কোন চিন্তা নেই। আমায় কিছু আর কুরে কুরে খাচ্ছে না। আমি আগের বারের মতই মাসীকে শক্ত করে খুঁড়ে খুঁড়ে চলেছি। দিগ্বিদিক গুঁড়ো করে দিয়ে। অন্ধকার ছিঁড়ছি। অন্ধকার বা মাসীকে। এক রকমের তুলো। কারও ফাটা বালিশ থেকে বেড়িয়ে পড়েছে হঠাৎ।

এবারও আমার জল খাওয়ার কোন দরকার পড়লো না। মাসীকে গড়িয়ে

দিলাম।

মাসী গ্লাসটা রেখে দিয়ে সিঙ্গিল খাটটায় একা উঠে দাঁড়িয়ে দুই উরুর শুরুর জোড়ে আমার মাথা, কপালকে খানিকক্ষণ প্রায় মলম করে রাখলো। তখনো সে বিড়বিড় করে বলে যাচ্ছিল—তোমায় দিয়ে হবে। তুমি একদিন পারবে। ঠিক পারবে।

তখনো আমি জানি না—কি পারবো। আর কি পারবো না।

দিনের আলো অন্ধকারের মত অত দয়ালু নয়। সে মাথার ভেতরকার সব চিন্তার জন্যে হাট করে দরজা খুলে রাখে। আমি যত ভাবি—সেই বিঁধে থাকা কাঁটাটা আমায় অস্থির করে তোলে। যেন আমারই মাথায় বিঁধে আছে। আসলে যার বিঁধেছে, সে নির্বিকার। যত এটা দেখি, তত বেশি করে অস্থির হয়ে পড়ি। রোজ একটি করে দিন চলে যায়। আর সেই প্রাণ তো একটি করে দিন বয়সে বাড়ে। আমি কি করবো?

রাস্তায় ঘুরি। নার্সিং হোমের সামনে দাঁড়াই। চোখ বুজলে দেখতে পাই—মাসী কপালে সিঁদুর দিয়ে আমার সঙ্গে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকলো। ডাক্তার ওকে এগজামিন করবে বলে আমাকে চেম্বারের বাইরে দাঁড়াতে বললো। আমি বেরিয়ে এসেছি।

কিন্তু বাড়ি ফিরেই দেখি—মাসী ফ্লাইং ক্লাবের দিকে মুখ করে গুনে চলেছে—একাশি, বিরাশি, তিরাশি। হাতে স্কিপিং রোপ। লাফাচ্ছে।

কিছুকাল হল বাবা তাঁর নতুন পুরনো টাকার ড্রয়ারটা চাবি দিয়ে রাখেন। একটা ভাল টিপ পেয়ে সাতের দরে ঘোড়া ধরলাম। দীপার একটা দুল চুরি করে। ঘোড়াটা লাস্ট হল।

সন্ধ্যেবেলা সারা মুখে পুরু করে অপমান মেখে মাঠ থেকে ফিরলাম। দক্ষিণের ঘর পেরিয়ে কুন্দনদের ঘরে যাবো। দেখলাম, দীপা মাথা নীচু করে নিজের ট্রাঙ্ক খুলে বসে আছে। কাপড়-চোপড়ের ওপর এক তাড়া চিঠি ছড়ানো! আমায় দেখে দীপা কেঁদে উঠলো। ছোড়দা—

খুব কিছু না হলে দীপা বড় একটা ছোড়দা বলে না আমায়। ছুটে কাছে গেলাম। বলতে যাচ্ছিলাম—তোর একটা দুল আমি বাথরুমে পেয়ে চুরি করেছি। বেচে দিয়ে রেস খেলেছি। একটা ব্যাপার ঘটে গেছে দীপা। একটা কাঁটা বিঁধেছে। সেটা তুলতে অনেক টাকা চাই। অনেক। আমাদের আগের সেই সংসার ফিরে পেতে হলে—বাবাকে পেতে—দাদাকে পেতে হলেও অনেক টাকা দরকার। একদিন একটা জ্যাকপট মিলিয়ে দিয়ে—

এত কথা বলতে পারতাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু মন ভেবে যাচ্ছিল—ভেতরে ভেতরে দীপাকে বলেই চলেছিল।

দীপা উঠে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলো। কান্নায় ওর সুখের জিনিসপত্তর এদিক ওদিক হয়ে গেল। নিশীথ বিয়ে করেছে—

কে? নিশীথ? কবে?

আর কথা বলতে পারলো না দীপা। আঙুল দিয়ে মেঝের ওপর পড়ে থাকা একটা খোলা ইনল্যান্ড দেখালো। কুড়িয়ে নিলাম।

সেই এক স্টোরি। বাবার টেলিগ্রাম। মাদার ইল—কাম শার্প। গিয়ে দেখি—অসুখ-বিসুখ কিছুই নয়। ডাহা মিথ্যে। আমার বিয়ে ঠিক করেছেন বাবা। অনেক চেষ্টা করেছিলাম। বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু কার্ড ছাপানো সারা—বিলিও শুরু করে দিয়েছেন বাবা। আর পাত্রীর তো কোন দোষ নেই। আমায় ক্ষমা কোরো। ভুলে যেও।—ইতি তোমারই নিশীথ—

তোমারই! কথাটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর বললাম, নিশীথ এখন কোথায়?

কান্নার ভেতর বললো, কিং জর্জ ডকে। জাহাজ ভয়েজে বেরোবে বলে খাবার জল নিচ্ছে। সবই তো লিখেছে।

তুই খোকনকে বিয়ে করবি?

দীপা মাথা নীচু করলো।

তুই দাঁড়া আমি আসছি—

দোহাই ছোড়দা—তুমি যেও না। মাথা খাও। ডকে যেও না। হর্ষবর্ধনে তোমায় উঠতে দেবে না—

আমি তখন বেরিয়ে পড়েছি বারান্দায়। এম. ভি. হর্ষবর্ধন, এম. ভি. চন্দ্রগুপ্ত—এসব আমাদের সমুদ্র চষে বেড়ানো জাহাজ। আরও আছে—চাণক্য, সমুদ্রগুপ্ত, অশোক, গৌটম বুড্ঢা। ইংরেজি বানানে ওরকম উচ্চারণ আসে।

এসব জাহাজ নিশীথ আমাদের চিনিয়েছে। নিশীথের সুবাদে আমরা গেছি কয়েকবার। আজ সেই ভাবেই ঢুকে পড়লাম। এগারো নম্বর কাঠের পায়ারে দেখি হর্ষবর্ধন দাঁড়িয়ে। আমি যে কীভাবে এতটা পথ এসেছি, নিজেই জানি না। হর্ষবর্ধনের একটা বড় ফুটো দিয়ে ময়লা জল গলগল করে গঙ্গায় পড়ছে। গ্যাংওয়ে লাগানো রয়েছে দেখে উঠে গেলাম।

প্যাসেঞ্জার লাইনার। ভেতরটা ঝকঝক করছে। ওরই সঙ্গে পাশ করেছে—এমন একটি ছেলেকে পেয়ে গেলাম। বললো, নিশীথ? ওই তো পোর্ট হোলের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বুঝলাম, নিশীথের বন্ধু সম্ভবত নিশীথের বিয়ের খবরও পায় নি। কিংবা ভেবে বসে আছে—দীপার সঙ্গেই নিশীথের বিয়ে হয়েছে। নয় তো আমায় এভাবে হেসে রিসিভ করতো না। দাদার বিয়ের পরেপরে কয়েকবারই নিশীথ আমাদের এসব জাহাজ ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। দীপা, আমি, কুন্দন, মাসী—আমাদের সবাইকে। আসলে আমরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তাম। জাহাজ জিনিসটা তো বড়। নিশীথ দীপাকে নিয়ে রেলিংয়ে ভর দিয়ে প্রেম করতো। কিংবা জাহাজের মত অতিকায় একটা জিনিস দেখিয়ে ইমপ্রেস করতো।

নিশীথ একা। চারদিকে ফ্লাড লাইট। যন্ত্রপাতি। জিনিসপত্তর। সাদা পোশাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে নিশীথকে। আমি আর দেরি করলাম না। ময়লা পোশাকে বাইরের লোক অ্যাতোখানি ভেতরে এসে পড়েছে—এলো কি করে? ভাবতে ভাবতেই সিকিউরিটির লোক আমায় ধরবে আর লাথি কষাবে।

প্রথম ঘুষিটায় নিশীথ ঘুরে পড়তে পড়তে একটা পোল-স্টান্ড ধরে ফেললো। অমনি আরেক ঘুষি। তখন নিশীথের চাপা গলা পেলাম। ওঃ। ছোড়দা। কি ব্যাপার?

এর পর আমি কিল, চড়, ঘুষি মেরেই চলেছি। আশপাশের লোক ছুটে এলো। মার খেতে খেতে নিশীথ চাপা গলায় বললো, ওকে মারতে দাও। বাধা দিও না কেউ—

আমি তখন একটা লাথি মেরেছি। নিশীথ এখন পর্যন্ত কোন বাধা দেয় নি। ঘুরে পড়তে পড়তে একটা তাকমত জায়গায় বসে পড়ে টাল সামলালো।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, ফ্রড্! একের নম্বরের চিট।

ওর লোকজন আমায় তুলে জলে ফেলে দিতে পারতো। নিশীথ হাত তুলে তাদের এগোতে বারণ করলো। তারা আমাদের দু'জনকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। হয়তো তারা চায় না—জাহাজের বাকি লোক আমাদের এ অবস্থায় দেখুক।

ঠোঁটের কোণে রক্ত টের পেয়ে নিশীথ হাত দিয়ে মুখ মুছলো, তারপর বললো, আমারও কিছু কথা ছিল ছোড়দা। কিন্তু আজ থাক। আপনি আগে আমায় মেরে নিন—বলতে বলতে নিশীথ আমার লাথি, কিল চড়ের এরিয়ায় আবার চলে এলো। আপনি আগে আমায় মেরে টায়ার্ড হয়ে নিন। তারপর কথা বলা যাবে ধীরে সুস্থে।

জামা ছিঁড়ে গেছে। মাথার চুল খানিকটা কপালে। ডান চোখটা ফুলে উঠেছে নিশীথের। এ অবস্থায় আমি নিজেই থেমে গেলাম।

তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার ঘেন্না করে—বলে যেমন এসেছিলাম তেমনি গ্যাংওয়ের রেলিং ধরে টলতে টলতে নেমে এলাম। এখানে মানুষের আটকানো জলে জাহাজগুলো ভেসে আছে। ডক থেকে বেরিয়ে বুঝলাম—আমাদের ফ্যামিলিতে আর কোনদিন সুখ আসবে না। আমাদের কিচ্ছু নেই। এখন থেকে আমাদের এভাবেই চলবে। সুখের দিনগুলো আমরা ফুরিয়ে ফেলেছি।

দীপা মাস দুই বাদে পুরো গল্পটা বলেছিল। নিশীথের বাবা ধড়িবাজ নাম্বার ওয়ান। সে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে অনেকদিন ধরেই টাকা নিচ্ছিল। তারা ছাড়বে কেন? ভেবে দ্যাখো ছোড়দা! এ অবস্থায় তুমি বেরিয়ে আসতে পারতে? নিশীথই বা কি করবে?

আমি কিছুই বলি নি। দীপা যে ব্যাপারটায় ভেঙে পড়ে নি—এটাই ভালো লাগলো। বললাম, তোর কাছে তিরিশটা টাকা হবে?

দিচ্ছি। কিন্তু রেস খেলো না।

পাশেই বসেছিল মাসী। কে বলবে তার পেটে তখনো তিন চার মাসের পুরনো কাঁটা বিঁধে রয়েছে। দীপার কথায় মাসী ফোড়ন দিল, জানোই তো খেলবে—তবু টাকা দিচ্ছো কেন?

কিছু না বলে দীপা বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে ঘরে টাকা আনতে গেল। আমাদের মাথার ওপর আশ্বিনের পরিষ্কার আকাশ। মাসী একা। এখন দুপুর শেষ হয়ে যাবে।

এখনো একটা কিছু করো মাসী। আমি আর পারছি না ভাবতে। আমার মাথার ভেতর শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করো। তোমার কোন ক্ষমতা কাজে লাগাও।

মাসী নির্বিকার। শুধু বললো, এই তো সময় হয়ে এসেছে।

দীপা এসে পড়লো। টাকা নিয়ে বেরিয়েই বুকির ঘরে তিনের দরে পরপর দুটো ঘোড়ায় দশটা টাকা লাগিয়ে দিলাম। একটায় হেরেছি—একটায় জিতেছি। কাটাকুটি করে উনিশটা টাকা এলো হাতে। দশ লাগিয়ে উনিশ—এ তো প্রায় হান্ড্রেড পারসেন্ট।

কবিরাজরা শুনেছি, শেকড়-বাকড় দিয়ে খালাস করে দিতে পারে। কিন্তু এখন কি আর তা সম্ভব? এখন তো শরীর হয়ে গেছে। টু লেট।

ব্যারাকপুরে আমাদের ছেলেবেলার শহরের একজন কবিরাজ এসে ঘরবাড়ি করেছে শুনেছি। খুব নাকি পসার। যাই তো তার কাছে একবার। ব্যারাকপুর স্টেশনে নেমে কবিরাজের নাম যাকে বলি, কেউই ঠিক চিনতে পারে না। কেউ বলে, ভেতরের দিকে আরও তিন মাইল যেতে হবে। কেউ বলে, আগের স্টেশনে

ফেলে এসেছেন। অত বড় কবিরাজ—ওখানেই থাকে নিশ্চয়।

এসেছি যখন ঘুরে দেখি—এই আইডিয়ায় একটা সাইকেল রিকশা নিলাম। ঘুরতে ঘুরতে গঙ্গার ঘাটে এসে পড়েছি। অনেকটা জায়গা গাছের ছায়া রোদ থেকে ঢেকে রেখেছে। সাইকেল রিকশাকে বললাম চলে যাও।

রিকশাওয়ালা বললো, ঘুরে এসে নিয়ে যাবো?

দরকার নেই। আমি একাই ফিরে যাবো। তুমি চলে যাও ভাই।

লাটবাগান দেখবেন না ঘুরে?

না ভাই।—কি করে বলি, আমি এখানে বেড়াতে আসি নি।

রিকশাটা চলে যেতেই আমি অনেকটা জুড়ে ওই বিরাট ছায়ার দিকে চলেছি। যতই এগোচ্ছি—ততই চিনতে পারছি। আরে! এ যে দেখছি—খুবই চেনা জায়গা। চড়া রোদের ভরা বিকেল এই গাছতলায় এসে দেখলাম বেদম মার খেয়ে ছায়ার সঙ্গে মিশে আছে। সে ছায়ার এখানে সেখানে অসম্ভব ঝকঝকে কয়েকটা রোদের চৌকো। সেই গাছের গুঁড়ি। আমি চমকে উঠলাম। ওখানটায় মাসী একদিন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। না। কোন খোড়োঘর নেই। মাসীর সঙ্গে কাজে বসতেই মাসী আমায় এখানে আনে।

আমি নদীর দিকে নেমে গেলাম। সেদিকটায় বিশাল গাছগুলোর ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে তারই বাইরে চকচকে নদী। সেখানে একটা লোক ফতুয়া গায়ে দাঁড়িয়ে। হাতে টোন সুতো। চোখ ভাসন-কাঠিতে। কাঠির নিচেই বঁড়শী ঝুলছে। নদীর গায়ে এমন সুতোর ফাঁদ আমাদের ছেলেবেলার শহরে নদীটার পাড়েও দেখেছি।

ভাটিতে জল নেমে গেছে। পাঁক নেই বিশেষ। শক্ত মাটি। লোকটার দিকে যাচ্ছিলাম। আশেপাশে কেউ নেই। আরেকটু গেলেই ওর কাকে পৌঁছে যাবো।

টোন সুতো গোটাতে গোটাতে আমার দিকে ফিরলো লোকটা। নাঃ! এবেলা মাছ পড়বে না।

আমাকে দেখে একটুও চমকালো না লোকটা। বললাম, কি মাছ পাওয়া যায় এখানে—

সবরকম। বলতে বলতে লোকটা পাড়ে উঠছিল। আর সুতো গোটাচ্ছিল। আমরা দু'জনই ঘন ছায়ায় চলে এসেছি। যেন কতদিনের চেনা।

আমি পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। ওকে দিতে গেলাম। নিলো না। এখন খাবো না।

আমি বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

পাড়ে উঠে লোকটার সুতো গোটানো শেষ হোল। অলঙ্গ বর্মনের কাছে বিপদে না পড়লে কেউ আসে।

আমার ভারি বিপদ।

কোন কথা না বলে লোকটা আবার নাবিতে নামলো। নেমে পাড় ধরে হাঁটতে লাগলো। আমি উঁচুতে। ওর কাঁধ দেখতে পাচ্ছি। পাচ্ছি মাথাটাও দেখতে। ফরসা সিঁথির দু' ধার দিয়ে যাকে বলে কেশ—তা রীতিমত বিরল কিন্তু নাকের নিচেই বেশ লাগদার গোঁফ। কালো। ফতুয়ার নিচে লাল রঙে ছোপানো ধুতি।

নদীর পাড় ধরে খানিকটা হেঁটেছি। অলঙ্গও হেঁটেছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে। এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, সঙ্গে আসচো কেন? তুমি যাও।

আমি যাবো না অলঙ্গ। আমি শুধু শুধু আসি নি।

তা তো জানি। কিন্তু এখন যাও।

আর যদি দেখা না হয়।

হবে। হবে। অনেকবার দেখা হবে।

কেন ভাই ঘোরাচ্ছো। জানো যখন আমার বিপদ।

চুপ করো। ওই শোনো।

চারদিক একদম খুন করার শব্দহীন নির্জন। সন্ধ্যের জন্য গঙ্গায় লালচে আলো পাঠাচ্ছিল সূর্য। সেই চেনা একতারার গুণগুণ। সেই সঙ্গে ভারি সুরেলা পুরুষ গলা। অদৃশ্য বাতাসে সুদৃশ্য সব ঝরা পাতা উদাস করে উড়ে উড়ে নদীতে গিয়ে পড়ছিল। আমি জানি অলঙ্গ—এবার কি হবে।

জানো যখন—তবে এয়েচো কেন? কেন এয়েচো শুনি?

আমার ভয় করছিল। খুব ভয়। আমি একদম একা। অবশ্য অলঙ্গও একা। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লে অলঙ্গ আমার সঙ্গে পারবে না। মুখ পরিষ্কার হাসি দিয়ে ভরিয়ে বললাম, অলঙ্গ সন্ধ্যে হয়ে আসছে—এটা সর্বনাশী ঘাট। আমি জানি। চিনতে পেরেছি। বগলাবাহী গঙ্গাকেও চিনি।

সবই জানো দেখচি। কে তোমার ভৈরবী গো?

আছে একজন। আমি বড় বিপদে আছি।

এ টা কাঁটা খসাতে হবে তো? বুঝিচি।

সবই জানো যখন— তাহলে আর ঘুরিয়ে লাভ কি অলঙ্গ?

টাকা কি আছে?

আমি পকেট থেকে টাকা বের না করে হাতের আঙুল পাঠিয়ে নোট গুণে দেখছিলাম পকেটের ভেতর। আমি জানি—সিরিস কাগজ, ভালবাসা, ষড়যন্ত্রের আলাদা আলাদা গন্ধ থাকে। কিন্তু এই আছি—এই নেই—বৃত্তসাধকদের এসে পড়া—চলে যাওয়া—কিংবা উবে যাওয়া—কিছুই আমি ধরতে পারি না। এ গন্ধ আমি চিনি না। মাসী আমায় নিয়ে কাজে ব সছে ঠিকই—কিন্তু কিছুই শেখায় নি।

দু'জনই একই সঙ্গে দেখতে পেলাম। ভারি গলায় পুরুষ বাউল কোমরের খুঁটনি খন্তা দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। একতারা সামলে কোন বাউল মেয়ে মরা বাচ্চা

সামলাচ্ছে। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। আমার প্রথম সন্তানের ঘাতক আমি নিজেই। যেখানে চাই না—সেখানে যদি নতুন প্রাণ আসে—তাকে আনাও এ পৃথিবীতে কঠিন। রাখাও কঠিন। আবার কুঁড়িতে বিনাশ—সেও তো দুঃখের। কোনদিকে যাবো। আমার তো দিগ্বিদিক নেই এখন।

অলঙ্গ বর্মন বললো, আমিই তো ওদের এভাবে আসতে দেখছি—তা তিরিশ বছর।

হয়তো তিনশো বছর ধরে আসছে অলঙ্গ। আমরা কতটুকু জানি!

বিচিত্তর না। যে যার কর্মে সর্বনাশী ঘাটে এভাবে ঘুরতেই থাকে।

আমি নিজে জানি না অলঙ্গ—হয়তো আমিও এভাবে এখানে পাঁচ সাতশো বছর ঘুরছি। নিজে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছি বলেই টের পাই না—

হতে পারে। কিন্তু টাকার কথা বললে না তো।

আমার বেশি নেই অলঙ্গ। এর ভেতর করে দিতে হবে। বলছিলাম—আর দেখছিলাম—অন্ধকার এখুনি আমার চোখের সামনে থেকে অলঙ্গকে মুছে দেবে। সেই অবস্থাতেই আন্দাজে সাতাশ টাকার নোট তুলে দিলাম হাতে। এই আছে আমার হাতে—

কত আছে? না গুণেই অলঙ্গ বললো।

তিন টাকা কম তিরিশ।

এয়ারকি কোরো না। বলে টাকাটা ফেরত দিল অলঙ্গ।

আমি হাত চেপে ধরলাম। তুমি আমার ভাই। কুড়িয়ে বাড়িয়ে এই এনেছি। এর ভেতর করে দাও এই বারটি।

ততক্ষণে বাউল জুড়ি ফিরে গেছে। এবারে বৃত্তসাধকের আসার সময় হোল। প্রথমে কার যেন নাম ধরে ডাকা। তারপর গোর খুঁড়ে মরা শিশু বের করে হাতে ঝোলাতে ঝোলাতে সেটাকে ছাগলছানা করে ফেলবেন বৃত্তসাধক। ট্যাঁ ট্যাঁ করে কেঁদে উঠে ছাগলছানা মানুষের ছানা হয়ে যাবে। আবার গোরে ফিরে গিয়ে মরেও যাবে। এও কি বৃত্তসাধকের একই বৃত্তে ঘুরে বেড়ানো নয়? হয় তো বছরের পর বছর সাধকমশার এই বৃত্তেই রয়ে গেছেন। আর ওঠেন নি। সেই খোড়ো ঘর। সেই ভৈরবী। আবার ভারি পুরুষ গলার গান।

অমনটি ভেবো নি বলে দিলাম।

কার কথা বলছো অলঙ্গ?

যার কথা ভাবছিলে!

তাঁকে চেনো তুমি?

তাঁর কাছেই তো যাচ্ছি। জিনিস তো তিনিই দেবেন।

আমায় নিয়ে চলো অলঙ্গ।

যাবে কি করে! তুমি যে ওভাবে ভাবছো তাঁকে—

আমি সাধারণ। সাধারণী দোষ ক্ষমা করে নেবেন তিনি। বলে তো

দিলাম। এগোচ্ছি আর ভাবছি—অলঙ্গ বর্মন থট্ রিডিং জানে দেখছি। যদি গিয়ে দেখি—ইনিই সেই বৃত্তসাধক—তাহলে কি হবে? উনি নিজেও হয় তো জানেন না—একই ভাবে বছরের পর বছর ওই একই জায়গায় আছেন। দিনের পর দিন একই চক্রে ঘুরে চলেছেন।

আশ্রয়ও নয়—পর্ণকুটীরও নয়। মাটির দেওয়াল। টালির ছাদ। চ্যাচারির বেড়া দেওয়া কম্পাউন্ড ওয়াল। একটা লাউ চারা উঠে গেছে পেছন দিক দিয়ে। বোধহয় সরকারী জায়গায় ঘর তোলা হয়েছে। কেননা, নদী এক সময় চ্যাচারির বেড়ার কাছাকাছি জল তুলে দিচ্ছিল। জলের এত গায়ে তো গেরস্থর বসত বাড়ির জায়গা থাকে না।

বারান্দায় উঠেই অলঙ্গ বর্মন চেঁচিয়ে ডাকলো, ও বাবা। কে এসেচে দ্যাখো—

ঘরের ভেতর থেকে গম গম করে উঠলো গলা। আসবে জানতাম। নিয়ে আয়।

অলঙ্গের পেছন পেছন ঢুকে পড়লাম ঘরে। খালি গা। সেই বৃত্তসাধকই মনে হচ্ছে। লাল ধুতী পরনে। গলায় রুদ্রাক্ষ। মাটির মেঝেতে মড়ার মাথার ওপর বসে আছেন বাবা। বেশ ভাল স্বাস্থ্য। অন্ধকার চোখে সয়ে যেতে আরও কয়েকটা মাথা দেখতে পেলাম। মেঝেতে পাশাপাশি তিনটে ত্রিশূল প্রায় গলা অব্দি বসানো। কারণ, মেঝে থেকে মাত্র বিঘতখানেক উঁচুতেই তিন তিনটে ফলা। কলাফুলের চওড়া পাতায় একগাদা জবা। অলঙ্গর বাবা বললো, ক'টা বাজে দ্যাখ তো।

আমি চুপ করেই আছি। বাবা ধমকে উঠলো, তোকেই বলেছি। অলঙ্গ কি ঘড়ি দেখতে জানে?

বললাম, পৌনে ছটা।

ঘড়িটা দে।

শুধু শুধু ঘড়ি দেব কেন?

একঘরে দু' রকম যন্তর থাকতে পারে না। এ ঘরে কুলকুণ্ডলী যন্ত্র চালু। এর ওপর ও ফালতু যন্ত্র ঘরে ঢুকিয়ে ব্যাঘাত করা কেন? জলে ফেলে দেবো।

মনে মনে ভাবলাম, যে জন্যে এসেছি—তার কিছু হোল না। তারপর অভাবের দিনে সম্বল এই ঘড়ি। বেচেও একশোটা টাকা আসতে পারে। তা দিই কি করে? বললাম, বড় বিপদে পড়ে এসেছি বাবা। উদ্ধার করে দিন আমায়—

না হলে কি আসতিস। ওই ঝাঁটার বাঁধুনীতে তোর ওষুধ রয়েছে। ভৈরবীর কোমরে বেঁধে দিবি। খালাস হয়ে যাবে। ঘড়িটা দে বলছি।

খুলে দিয়ে দিলাম।

হাতে নিয়েই হেসে বললো, ঘড়ি কোথায়। এ তো তোর চিরুনী দেখছি।

সত্যিই তো। ঘড়ি নয়। বাবার হাতে একখানা চিরুনী। সন্ধ্যে হয় হয়, নদীর চওড়া আলো ঘরে ঢুকে কিছুটা দেখতে দিচ্ছে। বাবার মুখখানা বেশ গোল। চোখ দু'টি জবা।

আমার কাছে আর কিছু নেই বাবা।

আছে। ক'টা টাকা আছে। এ ঘরে মিথ্যে বলবি নি। বের করে দে—

আমার ওষুধ?

ওই তো অলঙ্গ দিচ্ছে।

দেখলাম অলঙ্গ বর্মন ঝাঁটার গিঁট খুলে একটা ছোট্ট কাঠের ডুগডুগিপানা জিনিস বের করলো।

আমি ভয়ে, দুশ্চিন্তায় সবই দিয়ে দিচ্ছিলাম। বাবা বললো, পাঁচটা টাকা রাখ। নয় তো ফিরবি কি করে? অমন ভৈরবী যার হাতে সে কি সংসারে থাকে! তোকে আসতেই হবে। আবার আসবি তুই।

অলঙ্গ প্রসাদী থেকে দু'টো জবা তুলে ঝাঁটার খিল—সেই ডুগডুগির মত কালো কাঠের টুকরোটায় ভালো করে বেঁধে সব একসঙ্গে আমার হাতে দিল। আমি ভাবছিলাম—মাসী তাহলে আসলে একজন ভৈরবী। অথচ সংসারে মাসী সেজে আছে। স্কিপিং করে স্লিম থাকে। শরীরটা যাতে পুরুষদের লোভানী দেয়। এটা কাম? না, তন্ত্র? আমি অশিক্ষিত। কিছুই জানি না। শুধু জানি—বাড়ি ভর্তি লোক—তার ভেতরে মাসী যদি আমার প্রথম সন্তানকে জন্ম দিয়ে বসে? উঃ! কী কেলেঙ্কারি। নার্সিংহোমে গিয়ে বেআইনী খালাসে অনেকে মারাও যায়—ধরাও পড়ে—আর অত টাকাও তো নেই আমার। আর কার পেটে কার ছেলে ভাবতে গিয়ে তো মা অজ্ঞান হয়ে যাবে। দীপা, অভিজিৎ, খোকন—ওদের কাছে আমি মুখ দেখাবো কি করে।

এই দ্যাখ তোর চিরুনী।

তাকিয়ে দেখি বাবার হাতে চিরুনীর জায়গায় আমার হাতঘড়িটা। বললাম, ওটাই আমার শেষ সম্বল। আর কিছু নেই আমার বাবা—

যাঃ! কাঙাল। নিয়ে যা—বলে ঘড়িটা আমার কোলে ছুঁড়ে দিল বাবা। তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে পরে নিলাম।

এই আমার আসন। এই পাঁচমুড়ি রাত হলে কথা বলবে। থেকে দেখে যা। তখন যা চাইবি—তার হদিশ ওরাই দিয়ে দেবে। ওদের জাগাবো। আরেকটু বোস। ভৈরবী এসে চা করবে। খেয়ে তবে যাবি।

রাত হয়ে যাচ্ছে বাবা। আমায় সেই কলকাতার শেষ দিকে যেতে হবে।

হা হা করে হেসে উঠলো বাবা। কলকাতার শেষ আছে নাকি। স্বয়ং কালী কলকাত্তাওয়ালী। তার শেষ থাকে? যাবি যা। সাবধানে যা—

অলঙ্গ একটু এগিয়ে দেবে?

অলঙ্গ যাবে না। নন্দী যাক—এই নন্দী। নন্দী। ব্যাটা ঘুমোয় শুধু। বড় রাস্তায় পেঁছে দিয়ে আয়—

বাবার গলা গমগম করে নদী অব্দি চলে গেল। অন্ধকার থেকে প্রায় দেড়মণি কুকুর উঠে এলো। কালো। দিশী কিংবা দো-আঁশলা। লাল মার্বেল চোখের গর্ত। পাশে এসে দাঁড়াতেই ভক্ করে একটা গন্ধ ছাড়লো। সে গন্ধে পচা মাংস আর দিশী মদের বাস মিশে আছে। সেই সঙ্গে অনেক কালের চান না করা কাদা মাখা গন্ধও ওর গায়ে। আমার কান, মাথা শুকে নিল টুক করে। আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছি। সরান বাবা—সরান ওকে—গন্ধ।

তা একটু তো হবে।

চান করে না কত দিন?

হা হা করে বাবা হাসলো। সেই সঙ্গে অলঙ্গ বর্মন। জোড়া হাসি থামিয়ে দু'জনই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো—নন্দী তো সারাদিনই গঙ্গার গা দিয়ে ঘোরে। অলঙ্গ বললো, ভাটার জলের সঙ্গে নেমে গিয়ে জ্যান্ত কাঁকড়া আসটা ধরে আনে। সে জন্যেই কাদা লেগে থাকে গায়ে।

বাবা আলাদা করে বললো, নন্দী নিজে নিজে সাঁতারও দ.য়। মাঝে মাঝে গাঙ-চিংড়িও বড় মত পেলে ধরে ফেলে। মুখে করে নিয়ে আসে।

অবাক হবারই কথা। এত বড় কুকুর। দো-আঁশলাই হবে। গন্ধেই বোঝা যাচ্ছে—বাবার প্রসাদীও পায়। মুখে বললাম, তাই নাকি বাবা?

জলপুলিস জানিস তো। ওকে তুই জলকুকুরও বলতে পারিস!

কদ্দুর যায়?

তা গঙ্গার মাঝামাঝিও ঘুরে আসে এক একদিন। অলঙ্গর জ্বর-জারিতে নন্দীই তো বড় কাজগুলো করে—বাবা বলতে বলতে আমার দিকে তাকালো। এতক্ষণে অলঙ্গ বর্মন লণ্ঠন ধরিয়ে ফেলেছে। ঘরখানা খুব ছোটো নয়। বাবার তক্তায় পুরু তোষাকের বিছানা। তোলা উনুনে একটা বড় কড়াই। পরপর অনেকগুলো বোতল। কেরোসিন কি দিশীর—তা এতটা দূরে থেকে বুঝতে পারছি না।

বাবার চোখ চকচক ক.ছে।

বড় কাজ? কুকুর দিয়ে বড় কাজ? সে কি কাজ বাবা?

বোস তাহলে। দেখাই—

অলঙ্গ বর্মন বললো, ওকে ছেড়ে দাও বাবা। কলকেতার মানুষ—অনেক দূরে যাবে। গেরস্থ বাড়ির ছেলে—

চুপ করো হারামজাদা। আমায় শেখাচ্ছো? কে বাবুর বাড়ির ছেলে—কে গেরস্থর!

সে ধমকে অলঙ্গ তো বটেই—নন্দীও লেজ গুটিয়ে তার জায়গায় গিয়ে বসলো। তারপর ভক্তি আর ভয়ে মাথাটা, গলাটা মেঝেতে লেপটে দিয়ে

ত্রিশূলসারির দিকে তাকিয়ে থাকলো চুপ করে।

বাবা তখনো রাগে গরর্ গরর্ করছিলো। ছিপি খোলা সোডার ঝাঁঝে ফের চেঁচিয়ে উঠলো। আমি আর ফেরার কথা তুলতে সাহসই পেলাম না।

মেছোর ব্যাটা মেছো। ধরতিস মাছ—হয়েছিস তন্ত্রধারক।

তা বলি নি বাবা।

মাছ মারা ভুলে মাদুলি বিকোস—চড়া দামে—তা আমি জানি। আমি সব জানি অলঙ্গ। ভাসা মড়ার জো এলে জ্বর আসে গায়ে। তখন ডাকো নন্দীকে। অবলা প্রাণীটা তখন সাঁতরে গিয়ে দাঁতে করে কুটো মড়া আনুক।

রাগ করো কেন বাবা। আমারও তো বয়স হচ্ছে। নন্দীকে কেমন ট্রেনিংটা দিলাম তা সে কথাটা তো বললে না।

বাবা আর কথা বাড়ালো না। সুর কেটে যাওয়া মানুষ যেভাবে হাতড়ায় —কথা পায় না—দরকারী জিনিস পায় না—সেভাবে আমার দিকে তাকালো বাবা। তোর ফেরার ভার আমি নিলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে বোস তো—এ ঘরে ঢুকে ডরাবি না। তাহলে ভয়ই তোকে পিষে মারবে। এ জগতে থাকতে কত লোকের আশ মেটে নি। তারা ভেসে বেড়ায় গাঙের বাতাসে। আশপাশে ঘোরে। যদি পারে ওদের দুনিয়ায় আমায় নিয়ে যায়। অত সহজ নয়—

বাবা আমি উঠি আজ।

বোস না। এই তো চায়ের সময় হোল। না অন্য কিছু খাবি?

কিচ্ছু খাব না।

তাহলে চা খা।

এর ভেতরেই অলঙ্গ আবার ক্রেডিট নিতে চাইল। ও কথাটা বলো বাবা। অবলা বলে অবলা!

রাগ পড়ে গেছে বাবার। হেসে হেসে বলে—জানি, আজ জোছনা রাতে মাঝগাঙে অমুক জায়গার আত্মঘাতী বউ কী কুঁয়ারী ভাসতে ভাসতে যাবে। ছ'দিনের পথ ভেসে এয়েচে তিন দিনে—বর্ষার ঘোলা জলে—পাশাপাশি আরও তিন জায়গার মড়া—একটা মালদায়, দুটো বহরমপুরে—সঙ্গ নিয়েচে বউটার কী কুঁয়ারীর। নন্দী ঠিক বেছে নিয়ে মেয়েমানুষের মড়া দাঁতে কুটো করে ফিরে আসবে। আবার নজর আছে! পাছে দাঁতের কামড়ে ফুটো হয়ে সুন্দর শরীর-খুঁতো হয়ে যায়—কাজে না লাগে—তাই পরনের কানি কি শাড়ির ওপর দাঁত বসায়।

ঐ ট্রেনিং কে দিলো বাবা? সে কথাটা বলো।

তা অলঙ্গ দিয়েছে। নন্দী ছেলেবেলায় অলঙ্গর সঙ্গে নৌকোয় মাছ ধরতে বেরোতো। জল জানে। সোতা চেনে। কোন লাভ নেই। মাছ বলো, ক্যাঁকড়া বলো—যা পাবে দাঁতে করে আগে এনে দেখাবে। দিলাম তো খেলো। নয় তো আমার জন্যে সামনে নিয়ে বসে থাকবে। বড় গুণবতী। জলপুলিসের

মেয়ে জলকুকুর।

গুণবতীর চোখে চোখ রেখে ভাবছিলাম—কোথায় এসে পড়েছি। আমার এই আসাটাও এদের কাছে ভেসে আসা মড়ার মতই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। বাইরে গঙ্গার বুকে হাওয়া দাপাচ্ছে। আশ্বিন কার্তিকের ভরা নদী। এর পর কিছুদিন বাদেই রোগাপানা হতে শুরু করবে। আমাদের ছেলেবেলায় শহরে থাকতে থাকতেই নদী দেখার অভ্যেস হয়ে আছে আমার। বেশি কিছু আগাম ভাবাও এ ঘরে ঠিক নয়। দু'জন থট রিডার আমার সামনে বসে। উপরন্তু নন্দী। কুকুরটাও কি মনের কথা পড়তে পারে?

কোথায় পেয়েছিলে নন্দীকে?

অলঙ্গ গর্বের হাসি হেসে বললো, পাটকলের এক ম্যানেজারবাবুর। চুরি করেছিলাম।

শুধরে দিল বাবা। ওকে চুরি বলে না। দেখে ভালো লেগেছিল—ভালো-বেসেছিলি—তাই তুলে আনলি অলঙ্গ। এইবেলা চা খাওয়া যাক। ওঠো গো। ওঠো। সন্ধ্যে হয়ে গেল। আর কত ঘুমুবে?

নন্দীর পেছনে দেওয়াল ঘেঁষে আবছা জায়গায় কী যেন নড়ে উঠলো। আমি মাটিতেই ঘট হয়ে বসে গেলাম। পাঁচটি বড় সাইজের নরমুণ্ডুর ওপর মোটা আসনে বাবা বেশ পদ্মাসনে বসে। বাঁধন থেকে পা আদৌ ছুটে যায় নি এতক্ষণ। ত্রিশূলের সামনে জবার পাহাড়ের ভেতর থেকে আরেকটা মুণ্ডু বের করে মুখে তুললো বাবা। দিশী জাতীয় কিছু হবে। মুখ থেকে নামিয়ে ঠোঁট মুছলো বাবা। খাবি? দেবো?

মাথা নাড়লাম। বাবা তখন মুণ্ডু থেকেই খানিকটা ধারা করে ছাড়লো। নন্দী জিভ বাড়িয়ে সাবধানে সবটা মুখে নিল। একটুও মাটিতে পড়তে দিল না। জিভ দিয়ে নিজের নাক চেটে নিয়ে লেজ গুটিয়ে ফের একই ভঙ্গীতে বসলো নন্দী। এখান থেকে লোকালয় হেঁটে গেলে বড় জোর চল্লিশ মিনিট। আরও হাঁটলে তবে ব্যারাকপুর রেল স্টেশন। বুঝতে পারছি—এখান থেকে আমি আর কোনদিন ফিরতে পারবো না। এই লণ্ঠনের আলো। নদীর গায়ে এমন বেপট জায়গায় নরমুণ্ডু ছড়ানো ঘরে বসে আছি। আমার জীবনও তো এমন ছিল না। আমি যা করেছি—তার নাম পাপ? না, লোভ? জীবনটা হাতে পেয়ে আমি তার মানে বুঝি নি। আদিকাল থেকে নানা ঠোক্কর খেতে খেতে মানুষ জীবন করতে শিখেছে। আমি সেই শেখা পথে যাই নি। তাই আজ আমি এখানে। ভাসা মড়া কুড়িয়ে আনার ঘর গেরস্থালী।

এবারে চোখ পড়লো। এতক্ষণ নন্দীর পেছনে সাদা কাপড়ে কি ঢাকা ছিল। ঢাকনা ঢাকা জিনিসটা উঠে বসলো। তা হলে কোণে কেউ শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল পড়ে পড়ে। এই অবেলায় এত ঘুম?

হাঁটাচলায় বোঝা গেল মেয়েমানুষ। শাড়ির জমি সাদা হলেও পাড় বেশ

পাহাড়ী। সুন্দর পায়ের পাতায় আলতার বর্ডার। গোল অপূর্ব সুন্দর নখ। পায়ের গুছি হাঁটাচলায় যেটুকু বেরিয়ে পড়ছিল—তা না দেখে আমি পারছিলাম না। কোণে কাঠের তাক থেকে ছোট মত স্টোভ আর কেরোসিনের শিশি পাড়লো মেয়েলোকটি। ঢাকা পিঠ, হাতের গোড়া, গোড়ালির ওপর খানিকটা, এমন কি এই বিপজ্জনক জায়গায় মেয়েলোকটির পেছনটা না দেখে আমি পারছিলাম না। তবে লুকিয়ে লুকিয়ে। একবার চোখ পড়লো বাবার মুখে। দেখি—মিটি মিটি হাসছে, আর আমাকেও দেখছে বাবা। আমার ধরা পড়া চোখ অন্য দিকে সরিয়ে নিলাম।

আমাদের চোখের সামনে এক পাশ করে মেয়েলোকটি চা চাপালো স্টোভে। পাকা হাতে ছাঁকলো। চিনির ডিবে থেকে মাপসই চিনি চামচেতে তুলে মেশালো। খানিক আগে তক্তার তলা থেকে এক সেট পিরীচ পেয়ালাও বের করেছে। এত ওঠাবসায় শরীরের যেখানকার যা গঠন তা যেন ছবি হয়ে আমাদের চোখে লেগে যাচ্ছিলো। বাবার চোখে তো হাসির সঙ্গে রীতিমত তারিফ। সেই সঙ্গে আমার চোরা চোখকে ধরে ফেলার তল্লাসী দৃষ্টি।

গোড়ায় চা দিল বাবাকে। তারপর আমাকে আর অলঙ্ককে। শেষে নিজের কাপটি নিয়ে তক্তা ঘেঁষে ছোট্ট এক আসনে বসলো মেয়েলোকটি। মুখে ঘোমটার আড়াল। চিবুক সামান্য চোখে আসে। ওইটুকু আসনে ধরবার মত মানুষ নয় মেয়েটি। তাই বেশির ভাগই মাটির মেঝেতে।

আঃ! বলে বাবা সুড়ুৎ করে অনেকটা চা খেয়ে নিল। বোঝাই যায়—এ হোল গিয়ে কারণ শুষে নেওয়া ঠোঁট। তাতে চা শুধু মুখ বদলানোর তরল। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। হয় তো কোন সময়ে গৃহী ছিল বাবা। তখনকার সংসারসঙ্গিনী এ অভ্যেস ধরিয়ে থাকতে পারে।

কেমন লাগলো চা?

বাবার কথায় মাথা নেড়ে বললাম, চমৎকার।

ভৈরবী আমার রাঁধেও ভালো। নন্দী তো চুলোর পাশের থেকে নড়তেই চায় না। মাংস রান্নার গন্ধ গঙ্গা দিয়ে ভুরভুর করে চারদিক চারিয়ে যায়। কি? ঠিক বলি নি গো?

ঘোমটার ভেতর থেকে গলা ভেসে এলো। তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো গো।

নিজের অজান্তেই যেন চমকে উঠলাম।

বাবা হেসে বললো, কি হোলো? পিঁপড়ে কামড়ালো নাকি।

না।

ঘোমটার ভেতর থেকে ভাঙা গলার ভাঙা হাসি বেরিয়ে এলো। বর্ষা চলে গেছে। এখন আবার পিঁপড়ে বেরোবে কোত্থেকে।

আমি চেঁচিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। গলার শিরা ছিঁড়ে যায় যায়। তুমি কে? তুমি কে আসলে বলো?

আমার উঠে দাঁড়ানোয় নন্দীও উঠে দাঁড়িয়েছে। লাল মারবেল দুটো তুলে আমার মুখে তাকালো। বাবার মুখের তারিফ বা হাসি একটুও পাল্টায় নি। বরং উল্টে জানতে চাইলো, কেন? কি হয়েছে বল না?

আমি চলে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু অবাক যেমন হয়েছি—জানার ইচ্ছেও তেমন বেড়ে গেছে। ধপ করে বসে পড়লাম।

বাবা বললো, চেনা লাগছে? পরিচয় ছিল? তা তো অনেক জন্মে অনেকের সঙ্গে দেখা হয় রে। সুতো গেঁথে গেঁথে সব ভাবপরিচয় এক জায়গায় করা যায়? দুই টাইম তো এক ঘড়িতে মেলে না।

ঘোমটার দিকে তাকিয়ে বাবা বললো, মুখখানা দেখাও না। হয়তো ভুল করছে। হয়তো ঠিক বলছে। বগলাবাহী গঙ্গার সামনে বসে অনেকেই তো কয়েক জন্মের সংস্কারের পুরু ময়লা চুলকে তুলে ফেলে গো। এখানে থেমে মুণ্ডু থেকে আবার মুখে ঢাললো বাবা। আঃ মত একটা শব্দ করে গাঢ় গলা বের করলো। তখন তো স্মৃতি বেরিয়ে পড়বেই। তুমি চেনো নাকি?

ঘোমটা হাঁ বা না কিছুই জানালো না।

বাবা তখনও বলে যাচ্ছিল। তুমি আমার কার্যসঙ্গিনী। তুমি আমার কারণসঙ্গিনী। কতকাল পরে তুমি ভেসে এলে। ভাগ্যিস নন্দী তোমায় প্রথম দেখে।—এখানে থেমে বাবা আমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো, কি? খুব চেনা লাগে?

আমি আস্তে বললাম, না। একদম না।

তখনি বাবা বললো, আমি তো কাজে বসবো। অলঙ্গ—লণ্ঠন নেভা।

লণ্ঠন নিভলো। সারা ঘর গোলাপী আলোয় ভরে গেল। খুব ভোর-বেলার সূর্যের আলো যেন। পাখি ডাকছে। একটু বাদেই কেউ বোধহয় নৌকো ছেড়ে দেবে নদীতে। আমরা তীব্র সুগন্ধী এক কামিনী ফুলগাছতলায় বাঁধানো বেদীতে বসে আছি। আমি আর অলঙ্গ বর্মন। নীচে ত্রিশূলের সামনে বাবা। উল্টো দিকে নন্দী। আগের সেই একই ভঙ্গীতে এরা সবাই আমার কতকালের চেনা। বাবার আসন এখন একটা শরীর। মেয়েলোকের শরীর। দুই উরু শুরু হওয়ার জোড়ের জায়গায়। সেখানে আসনে ঢাকা পাঁচ মুড়ির ভজঘটের কোন বালাই নেই। মগ্ন, শান্ত—বাবাকেও বেশ লাগছে। দু' জনের শরীরের কোথাও একগাছা সুতোও নেই। বাবার তুলনায় অল্পবয়সী শরীরের ওপর দিকটা গোলালো ভরা দু'বাটি পাথরে উঠে গলায় নেমে যাবার মুখে আবছা হয়ে গেছে। সেখানটায় এই গোলাপী আলো ফুরিয়ে আসায় কোনক্রমে চিবুক, ঠোঁট, নাকের ডগা দেখা যায়—তারপর সবটাই আবছা। সেই আবছায় কালো চুলের আভাসও মিশে আছে।

বাবার ডান হাতের ভেতর মাটিতেই এক সরা ভর্তি ভিজে ছোলা কাঁচা লঙ্কা

মিশিয়ে স্তূপ করে রাখা। বাঁ হাতে সেই মুণ্ডুটা বাটির কাজ করছিল। দু' মুঠো মুখে দেয় তো একবার বাঁ হাতের মুণ্ডুতে গলা ভেজায়। আবার এক এক সময় চেঁচিয়ে ওঠে—খাবি নে মানে? তোকে খেতেই হবে। ডান হাতে বোজা ঠোঁট জোর করে ফাঁক করে বাঁ হাতের মুণ্ডুবাটি কাত করে ঠেসে ধরে সেই ফাঁকে। দুটো ছোলা ভাজা খাবি? বেশ ঝাল ঝাল। আজ তো অলঙ্গ মাছ পায় নি। কি করি বলো? এবার বাবার গলা অনুনয়ে প্রায় গলে যায়।

কামিনী ফুলের তীব্র গন্ধেরও একটা গণ্ডী রয়েছে। সেই বাসের সীমানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে গোলাপী আলোর দৌড়। ঠিক তার বাইরেই এক এক সময় এক এক খেলা হয়ে যাচ্ছে। ভোর রাতের নদীর আকাশে কড়কড়াৎ বাজ পড়লো। অসময়ের ঝোড়ো বাতাস। একেবারে পৃথিবীর শেকড় ধরে টান দিচ্ছে। কামিনী ফুলের গাছটা ডালপালা নিয়ে শুয়ে পড়ে পড়ে। বাবা খানিকটা সেদ্ধ ছোলা ভাজা মুখে দিয়ে কি বিড়বিড় করে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

অলঙ্গ বললো, আলো ফুটি ফুটি এই ভোর রাতটা বাবা এবার অনেকক্ষণ ধরে রাখবে। একেবারে ফর্সা ভোর কিছুতেই হতে দেবে না দেকো।

কত জিনিস যে একসঙ্গে দেখছি—তার ঠিক নেই। সব গুলিয়ে গেছে আমার। আমি যেন কামিনী গাছতলায় ব্রাহ্ম মুহূর্তের গোলাপী আলোতেই চিরকাল আছি। কারও কোন বিঁধে যাওয়া চার পাঁচ মাসের কাঁটা তুলবো বলে এখানে আসি নি। কাছেই নদী আছে। তার বুক বেয়ে পাখির কিচিরমিচির বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছিল। দেখতে দেখতে গাছ ভর্তি কামিনী ফুল লাল হয়ে গেল। ওরা তো চিরকালই সাদা। এই স্মৃতিটুকু যে মুছে যায় নি তা টের পেলাম।

বাবাকে আর অতটা বাবা মনে হচ্ছে না। বেশ নাগর নাগর চেহারা হয়েছে। মুখের ভাবটিও এখন আর তাকে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বলছে না। অনেক কমের দিকে। খুব মোহন হেসে বাবা জানতে চাইলো, এর আগে আমরা কোথায় ছিলাম?

চোখ দেখা যায় না। অথচ ঠোঁট পরিষ্কার কথা বলে। কোন বারেরটা বলবো?

যেবারে হিঁদু শেঠরা মুর্শিদাবাদে দল পাকালো। আসল গোলমাল তো তোমাকে নিয়ে।

জানো যখন শুনতে চাইছো কেন?

তাতে রগড় বাড়ে। খুলে বলো।

আমি শুনছি আর মনে মনে ভৈরবীর মুখের ওপর আবছা জায়গায় আমার চেনা চোখ চেনা কপাল বসিয়ে যাচ্ছি। ভৈরবীর গলা আমায় তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না। বাবার মুখখানা এখন অনেক মোহন।

হিঁদু রাজার অল্পবয়সী বেওয়া আমি তখন। তুমি সব জানতে গো। তুমি

তো বড় শেঠের ভাইপো। তোমারো নজর ছিল। যখন শুনলে পাটনার সুবেদার দিল্লী রওনা হবার আগেই বাংলার নবাবের কাছ থেকে আমায় ভেট হিসেবে পাবে—কোনদিন আমি আর দিল্লীর বাইরে পা বাড়াতে পারবো না—সে কি তোমার আকুলিবিকুলি।

নবাব তোমায় জানতেন?

ষোল আনা জানতেন। নদীতে পালকিসুদ্ধ চান করছি—ঘাটে উঠবার মুখে চুল ছেড়ে দিয়ে দাসী আমার মাথা শুকিয়ে দিচ্ছিল—নবাব বজরার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে নাকি অনেকক্ষণ সে দৃশ্য দেখেন। মুর্শিদাবাদ সব সময় পাটনাকে খুশী রেখে দিল্লীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতো। শেঠেদের আরও অনেক ব্যাপার নিয়েই রাগ ছিল। আমার ব্যাপারটাই তাদের এককাট্টা করে দেয়।

ওরা সব জানলো কি করে?

আমি ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলাম।

আমি পার্থ দত্তগুপ্ত—আমার নামটা শুধু মনে রাখতে চাই। সব যে ভুলে যাচ্ছি। আমারও কোন এক স্মৃতি বলে দিচ্ছিল—এ গলা আমার চেনা। এ গলার সঙ্গে কোন এক জীবনে আমিও যে কথা বলেছি। এই গোলাপী আলোটাই কিছু পর পর ভাবতে দিচ্ছে না। যখনই ভাবি—তখনই গুলিয়ে দেয়। ওর সঙ্গে আছে সুগন্ধী বাতাস।

আরেক বারেরটা বল না।

কোন বার চাইছো?

যখন রেল লাইন বসে নি। সবে মাটি ফেলা হচ্ছে। কেষ্টনগর লাইনে মাটি ফেলার সময় আমি টোলে ঢুকেছি। সবে সংস্কৃত শুরু। বড় ইচ্ছে আমিও আমার বাবার মত উপনিষদ পড়তে পারি।

আমতা-শিয়াখালা ছোট লাইনে মাটি পড়ল তো সেদিন। মহারানী মারা যাবার পরের বছর থেকে। সরস্বতী নদীতে তোমার তখন তিনখানা মাছ মারার ছিপ। সরু ঘেরের জাল সাত আটটা। অলঙ্গ নেহাত বালক। ওকে নিয়ে বড় নদীতেও যাতায়াত করো। আমি রূপনারায়ণ থেকে ভারার নায়ে ঘাটে ঘাটে ফিরছি। মহাজন আমায় বেচবে। ফিরি হয়ে চলেছি। অল্পবয়সী জমিদাররা কেউ এত ছোট মেয়ে কিনবেন না। তোমার বয়স একটু বেশি ছিল। তুমি কিনলে—ভেবেছিলে ডাগরটি করে পোষ মানাবে।

এসেই তো অলঙ্গর মুণ্ডুটি চিবোলে।

আহা! আমার জীবনটা ভাবো তো। কুলীনের মেয়ে আমি। বাবা নিজের হাতে বেচে দিলো ঘাটে দাঁড়িয়ে। মা নেই আমার। এগারো চলছে সবে। আমি অলঙ্গকে নষ্ট করবো না তো কে করবে বল?

এক একটা কেচ্ছা গুছিয়ে তোলে ভৈরবী—আমি তা চোখের সামনে ঘটতে দেখি। শুধু আমার জন্যেই আমার চোখের সামনে ঘটে যায় সে সব ঘটনা।

বড় রেলের কথা বলছিলাম। লাইট রেলওয়ে তো সেদিনের। বারাসাত-হাসানাবাদ ছোট রেল তখনও বসে নি। বড় ট্রেন খুলনা অব্দি যাচ্ছে বছর তিরিশেক। তারও আগের কথা কিছু মনে নেই। কলকাতা থেকে তারকেশ্বর অব্দি লাইন বসানো সারা। মাটি পড়ছে চাঁপাডাঙ্গায়। ঠিকাদার সাহেব একদিন সন্ধ্যেরাতে তোমায় ডেকে পাঠালো। তুমিই এ লাইনে মাটি কাটার লোক দিয়েছো। তোমার কথায় অনেকে ওঠে বসে। তুমি ঠিকেদারের তাঁবুতে ঢুকতেই লোকটা বললো, তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না রমজান সর্দার। আমায় বাঁচাও—

ভৈরবী বলে যাচ্ছে—আর আমি চোখের সামনে তাঁবুর ভেতর সব দেখতে পাচ্ছি। ঠিকাদার বলছে, দ্বারুকেশ্বরের ওপর তিন তিনটে পোল দিলাম। একটাও টিকলো না।

আমাদের পুজো দিন তাহলে।

দিয়েছি। তাতেও কোন কিনারা হোল না। স্বপ্নাদেশ পেইছি। একটি সুলক্ষণা মেয়েকে দ্বারুকেশ্বরের চড়ায় অমাবস্যার রাতে বাবা দ্বারুকেশ্বরের নামে বলি দিতে হবে।

আমাদের ঘরের মেয়ে তো চলবে না।

না। হিঁদুর ঘরের সুলক্ষণা ব্রাহ্মণের মেয়ে চাই।

সে আমি কোথায় পাবো? আমাদের বেরাদরির ভেতর হলে না হয় হোতো! কোন দুঃখীর পরিবার থেকে ভুজুং দিয়ে ভাঙ্গিয়ে আনতাম। বলতাম—দূরদেশে বড় লোকের ঘরে নিকে দিয়ে দিইছি।

আমার যে উপায় নেই সর্দার। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বাঁকুড়া জেলায় মাটি ফেলতে ফেলতে যেই ঢুকবো—অমনি কোতলপুর ছাড়িয়েই বাবা দ্বারুকেশ্বর শুয়ে আছেন। পোল বানাচ্ছি আর বর্ষায় ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দ্বারুকেশ্বর।

আমার চোখের সামনে একটা অজানা শাল জঙ্গলের ভেতর বর্ষাকালের ক্ষ্যাপা নদী বিশাল রেলপোল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। ঝামা ইটের গাঁথুনী, লোহার বীম, কাঠ, পাথর দলা পাকিয়ে খিচুড়ি অবস্থায় আকাশে উঠলো—তারপর স্পষ্ট দেখলাম বিশাল ঢেউ তুলে বর্ষার ঘোলা জল সে সব মুহূর্তে ভাসিয়ে দিল।

ভৈরবী বলে যাচ্ছিল, আমি তখন হাবা মতন এক টুলো পণ্ডিতের নতুন কনে বউ। অল্পকাল বিয়ে হয়েচে। স্বামী আমার কচি পণ্ডিত। নিজের ভালো জানে না। রমজান সর্দার তুমি যা আমাদের সর্বনাশ করেছিলে—তার আর তুলনা হয় না।

বাবা আসনে বসা অবস্থাতেই হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চাইলো। তারপর ভৈরবীর শোয়ানো আবছা মুখে তাকিয়ে বললো, সব্বোনাশ না ছাই! টুলো পণ্ডিত তোমায় খাওয়াতে পারতো? নিজেরই খাবার জুটতো না। শিষ্য

পড়িয়ে, শা বাড়ি যজমানি করে নিজেরটাও ভালো করে হোত না। তারপর ভৈরবী তুমি আর কতদিন ওনার ঘর করতে? নিশ্চয় ভেগে যেতে। সেই সময় আমি গিয়ে পড়লাম।

তাই বলে বোকা-সোকা অভাবী মানুষটাকে ঠগালে সর্দার! আমায় বড় ভালবাসতো।

জিজ্ঞাসা করবো নাকি? বলতে বলতে বাবা আমার দিকে তাকালো একবার।

না না। কি দরকার পুরনো দুঃখু খুঁড়ে বের করার। না জেনে ভালোই আছে মানুষটা। তুমি আমায় মুখে কাপড় দিয়ে তুলে নিয়ে গেলে ভাঙা ঘর থেকে। সে রাত যে কি কেটেছে সর্দার কি বলবো। তুমি আমার অনেক জন্মের সর্দার। বারে বারে ঘুরে ঘুরে তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছি। আর আমার একটা করে ভালোবাসার মানুষ ছটকে হারিয়ে যাচ্ছে। ছোটো রেল আমতায় বসাবার আগেও তুমি অলঙ্গকে রূপনারাণে পাথর বেঁধে জ্যান্ত ডুবিয়ে দিলে—মহারানীর রাজত্ব তখনো ফুরোয় নি।

এই দেখছিলাম—বাইশ-চব্বিশের কচি এক টুলো পণ্ডিত খোড়োঘরে মাঝরাতে উঠে বসে বৌকে খুঁজছে বিছানায়। এক লহমায় সেখানেই আরেক ছবি। আড়াআড়ি বুকের সঙ্গে পাথরের বড় চাক পিঠে বাঁধা এক তাগড়া জোয়ানকে মাঝ নদীতে নৌকো থেকে আধবুড়ো আরও জোয়ান একজন ঠেলে জলে ফেলে দিচ্ছে। পা দিয়ে। তার হাতে লণ্ঠন। কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থায়ী ব্রাহ্ম-মুহূর্তে সব দৃশ্য ফুটে উঠেই মুছে যাচ্ছিল পরের দৃশ্যকে জায়গা করে দিতে। হাত পা বাঁধা অলঙ্গ জলে পড়লো—ঝপাং—নদীর জল যেন ছিটকে আমার গায়ে এসে পড়লো।

না জেনে ভালোই আছে মানুষটা! তাই না গো?

বাবার কথায় ভৈরবী হেসে উঠলো। ভাজা ভাজা ভাঙা গলায়। তোমার যে কত গুণ সর্দার—তা তো সবাই জানেও না। মুখে কাপড় দিয়ে ভাঙা ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেলে। সেই রাতেই আমায় নিয়ে উস্তমকুস্তম সুখও করলে নিজের ডেরায়।

বাবা বললো, ডেরা কোথায় গো? আমি তো তখন খড়ের গাদায় পড়ে থাকি। ওপরেও দু' ভাঁজের খোড়ো চাল। সারা বেঙ্গল পিসিডিন্সি জুড়ে বড়লাট রেল বসাচ্ছে—পোল বানাচ্ছে, টেলিগ্রামের খুঁটি বসাচ্ছে—কত লোক চাই। মিউটিনির পর সরকার বাহাদুর রাস্তাঘাট-রেল-খবর চালাচালি সব দুরস্ত করে গড়ে নিচ্ছিল।

আর তাদের সুবিধের জন্যে শেষ রাতে আমায় নদীর চড়ায় নিয়ে গেলে সর্দার। ভোগ করলে পয়লা রাতে—এক গ্লাস জল দেবার কথা মনে এলো না? অন্ধকার দ্বারকেশ্বরের বুকে আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে পিপাসায়।

বলতে পারতে। জল কি দিতাম না?

আমার কি কথা বলার অবস্থা ছিল তখন। বার বার এভাবেই তোমার ফাঁদে পড়েছি আমি। আর সময়ই বা পেলাম কোথায়? নদীর চড়ায় পেঁছিতেই পিছমোড়া করে নতুন বসানো হাড়িকাঠে আমার গলাটি ঢুকিয়ে দিলে!

আমি—পার্থ দত্তগুপ্ত আর থাকতে পারি নি। সবই আমার চোখের সামনে চলচ্ছবি হয়ে ঘটে যাচ্ছিল। দ্বারকেশ্বরের বুকে অনেক পাথরের চাঙ জলের সঙ্গে পাহাড় থেকে গড়িয়ে এসেছে। মাঝখানটায় বড় কোন জন্তুর পিঠের কায়দায় বেলেজমির ঢাল। নদীর দু'ধার দেখা যায় না। শেষরাতের অন্ধকার ঝাপসায় নদীতীরের শালজঙ্গলের আবছা রেখার বেশি কিছু আর এই তিনটে মশালে দেখা গেল না। বড় মশালটার নিচে রমজান সর্দার মোটা থাম হয়ে দাঁড়ানো। উল্টো দিকে তিন-চার জন। একজন মিশমিশে কালো রঙের লোকের কপালে তেল-সিঁদুর—হাতে রামদা। তারই পায়ের কাছে হাড়িকাঠে গলা ঢুকিয়ে দিয়ে একটি মেয়েছেলের ঘাড়ে কুলুপ আঁটা সারা। হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধা। আমার চোখ গিয়ে রামদায়ের ওপর আঁকা চোখে আটকে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলাম। এ কিছুতেই হতে দেব না—

আমি চেঁচিয়ে উঠেছি। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী উঠে বসলো। একেবারে আমার চোখের সামনে। ঝাপসা মত আর কিছু আবছায়ায় নেই। কালো চুলের ঢালে পড়তে পড়তে দেখছিলাম স্থায়ী গোলাপী ব্রাহ্ম মুহূর্তটা মুছে গিয়ে ঘরের লণ্ঠনজ্বালা ঝাপসা আলো ফিরে আসছে। অলঙ্গ বর্মন যেন আমার দিকে এগিয়ে এগিয়ে আসছে।

চোখ চাইলাম ব্যারাকপুর কার-শেডে। দিনের পয়লা ব্যারাকপুর লোকাল শেড্ থেকে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে চলেছে। পাশেই একজন রেলের লোক ফাঁকা কামরায় শুয়েছিল। সে-ই অবাক হয়ে দেখছিল আমায়। ট্রেনের নামটাও সে আমায় বললো। লোকটি বোধহয় কার-শেডের মেকানিক।

দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে দেখি, দীপা একজন স্যুট-টাই পরা লোকের সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে গল্প করছে। মাসী চা বানাচ্ছিল। রান্নাঘরে গেলাম সোজা। পেছনে ফিরে বসা মাসী দরজায় আমার দাঁড়ানোর ছায়াও দেখে নি। দিব্যি বললো, এসেছো?

আমি চমকে উঠলাম। সে ভাবটা বুঝতে না দিয়ে বললাম, এখন চা করছো?

বাঃ! তোমার চাকুরে বোন লায়েক হয়েছে। অফিসের বন্ধু নিয়ে গল্প করছে। চা দিতে হবে না।

মা কোথায়?

বড়দি? ওপরে ঘুমোচ্ছে। দুঃখ করছিলো—কোথায় যাও—কোথায় থাকো সারারাত—কিছু বলে যাও না বাড়িতে।

তুমি জানো না কোথায় যাই! বলে দিলে পারো তোমার বড়দিকে।

চোখ নামিয়ে নিলো মাসী। ঘরো। চা দিয়ে আসি।

আমি সরে দাঁড়ালাম। ফিরে এসে মাসী বললো, চা খাবে? করবো?

নাঃ। পকেট থেকে কালোপানা কাঠের সেই ছোট্ট ডুগডুগিটা মাসীর হাতে দিয়ে বললাম। কোমরে বাঁধবে আজ। দেখি বেঁধা কাঁটা ওঠে কি না? নয় তো আমায় আত্মঘাতী হতে হবে। বলছি আর নিজেই নিজের মাথার চুল টানছি। আমার মুক্তি নেই। ছুটি নেই। জোরে চেঁচিয়ে বলে যে হালকা হবো তারও উপায় নেই। পাপের বেতন একটু একটু করে পরমায়ু দিয়ে শোধ করে চলেছি।

মাসী হাসতে হাসতে বললো, বালাই ষাট! শুধু শুধু আত্মঘাতী হতে যাবে কেন? ওষুধ তো পেয়েই গ্যাছো।

আমি আমার পেছনে তাকাই নি। সেখানে মাসী দাঁড়িয়ে। আমি বাড়ির পেছনের বারান্দার ধাপে বসে। দূরে ক্লাবের একটা প্লেন আকাশে উঠলো। পলকা ফড়িং। বাতাসের তোড়ে ডানা দুটো কাঁপছে দেখতে পাচ্ছি। অভিজিৎ কুন্দন—দু'জনেই পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। সামনের ঘরটা দেখা হয় নি। নিশ্চয় বাবা দারোগাদের বগলদাবা হয়ে কোথাও নতুন টাকার টানে গিয়ে পড়েছেন।

মাসী এত সিওর? পেছন থেকে মাসী বলল, দাঁতে কেটে দাও তো দড়িটা—

ফিরে দেখি, মাসী তার বাঁ দিকের কোমরে সায়া আলগা দিয়ে সেই ছোট্ট ডুগডুগিটা বেঁধেছে—একটু নামিয়ে।

কিসের দড়ি বাঁধলে? এত লম্বা।

কেটে দাও না দাঁতে। আরেকটা সায়ার দড়ি খুলে নিয়েছি তাড়াতাড়িতে।

দাঁতে কাটতে গিয়ে গালটা লাগল মাসীর কোমরে। একটা আলাদা গন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, লালচে ব্রাহ্মমুহূর্তে কামিনী গাছটার সাদা ফুলগুলো আগাগোড়া লাল হয়েছিল।

সোজা দাঁড়িয়ে বললাম, তুমি কে? কে তুমি মাসী? আসলে মাসী কে তুমি?

এই শুরু হল ফের। নাও—চান করে খেয়ে নাও তো। চোখ তো জবাফুল হয়ে আছে।

জবা কথাটা শুনে আরেকবার চমকে উঠলাম।

সন্ধ্যেবেলা মা আমার কথা একটাও জানতে চাইল না। শুধু বলল, তুই বড় ভাই। ছোট বোনের খোঁজখবর তো রাখবি।

কেন? দিব্যি চাকরি করছে। সংসারে টাকা দিচ্ছে।

এ স্বাধীনতা আমার ভাল লাগে না। এক এক দিন এক একজন বন্ধু নিয়ে আসে। পাড়ার রিকশাওয়ালারা নাকি টিটকিরি দিয়েছে সেদিন। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াস? কোন খোঁজ রাখিস বাড়ির?

একতলায় তিন ঘরে আমি, বাবা আর মাসী আলাদা আলাদা শুই। দিনের বেলা সবাই একতলায় নেমে এলেও রাত্রে দীপা, মা, অভিজিৎ ও কুন্দন ওপরে গিয়ে শোয়।

এই প্রথম মাসী আমায় ডাকলো নিশুতি রাতে—আমার ঘরের জানলায় টোকা দিয়ে।

জানলায় মুখ বাড়িয়ে বললাম, কে?

চুপ। চেঁচিয়ো না। আস্তে বেরিয়ে এসো।

কেন? আমার চোখে তখনও ঘুম ছিল। কিছু বুঝতে পারছি না। বহুদিন পরে ভাল করে ঘুমোচ্ছিলাম।

বেরিয়ে এসো। তোমার ছেলে হয়েছে।

ভয়ে আমার পা কাঁপতে শুরু করল। মাসী সত্যিই ভৈরবী। এ অবস্থায় কেউ হেঁটে আসে? না পারে?

আমি ঘর থেকে বেরোচ্ছি না দেখে মাসী বেশ জোরে ফিসফিস করে বলল, আমার কষ্ট হচ্ছে দাঁড়াতে।

এই বুঝি আমার প্রথম সন্তান ট্যাঁ-ট্যাঁ করে ওঠে!

বেরোও বলছি। এবার মাসীর গলায় ধমক। ভয় নেই। মরা ছেলে হয়েছে। ঘর পরিষ্কার করে ফেলেছি। তুমি শুধু ফেলে দিয়ে আসবে। পারলে মাটি চাপা দিও লক্ষ্মীটি।

মরা জেনে দুঃখ হল না। আনন্দও হল না। বুঝলাম—আমার পরমায়ুর খানিকটা চলে গেল। ফ্লাইং ক্লাবের মাঠে এখানে ওখানে জোনাকি। আশ্বিনের শেষ। বৃষ্টি নেই। নাবির ঢালু নালায় তখনও সদ্যগত বর্ষার জল অনেকটা। আমি আমার সদ্যজাত সদ্যগতকে দু'খানা ইট বেঁধে নালায় ছেড়ে দিলাম। গুপ করে ডুবে যাওয়ার একটা শব্দ হল শুধু।

তখনই মনে হল, মরাই জন্মেছিল? না, মাসী গলা টিপে মেরেছে? ভাবছি—আর ভিজে মাঠে বসে আছি। ঘাসে হিম পড়েছে সারারাত। কিছুতেই উঠতে পারছি না।

মাথা ধরে আছে বলে ক'দিন শুয়ে ছিল মাসী। দীপা একদিন মাকে

পরিষ্কার বলল, মাসী যেমন তোমায় হেলপ করতো—তেমন করতে বলো। আমরা কি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো ?

এখানে আমরা মানে—আমি। দাদা তো টাকা পাঠিয়ে খালাস। বাবার সংসার—বাবা তো টাকা দেবেই। ছোড়দা বেকার—উপরন্তু পড়া ছেড়েছে। নাবালক ভাই দু'জন স্কুলে। এখানে কথাটা দাঁড়াচ্ছে—আমি মেয়ে হয়ে চাকরি করে টাকা এনে দিচ্ছি। সেখানে মাসী কি করে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দেয়।

মা শুধু বলল, ও কি কথা ? শরীর খারাপ হয়েছে—ক'টা দিন শুয়ে থাকবে না ? কাজেকর্মে সাহায্য তো করেই আমাকে। তুই বরং শুয়ে একটু বিশ্রাম কর তো। ঘুরে ঘুরে কি ছিরি করেছিস মুখের ?

অতটা ঠেঙিয়ে অফিসে গেলে কার বা ছিরি থাকে মা। বলেই দীপা যেমন এসেছিল--তেমনি চলে গেল। আমিও দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলাম না। এর ভেতর একদিন দীপার ব্যাগ হাতিয়ে একটা দশ টাকার নোট সরিয়েছি। ডাক্তারির বইগুলো কবে রেসের মাঠে চলে গেছে।

শীতের শুরুতে অনেক দিন পরে একখানা চিঠি এলো দাদার। আমায় লেখা। তুমি এখন বড় হয়েছো। ডাক্তারি যখন পড়লে না—প্রাইভেটে বি-এ পরীক্ষাটা দাও, তারপর চাকরির চেষ্টা দ্যাখো। বাবার বয়স হয়েছে। বাবার স্বভাব তো জানো। আমি এখানে সংসারে জড়িয়ে আছি। ওখানকার সংসার তোমাকেই দেখতে হবে। সেজন্য এখন থেকে তৈরি হও। এর ভেতর আশার কথা—দীপার চাকরি হয়ে যাওয়া। অভিজিৎ আর কুন্দনকে এ বছর ক্লাস প্রোমোশন পেতেই হবে। এর পর নীচে লেখা—আং দাদা।

মনে মনে বললাম, আং—গাধা। তুমি একটি নীরেট গাধা। তোমার জন্যেই আজ আমরা একটু একটু করে সবাই এ রকম হয়ে গেলাম। কথাটা ভেবেই মনে হল—না, সবটা বলা যায় না। আমি—আমার কথাই ধরা যাক। আমি তো জীবনের দামই জানতাম না। ভেবেছিলাম—পরীক্ষায় নম্বর তোলার মত—জীবনেও সব জায়গায় নম্বর তুলে যাবো। আমি জানতাম—আমি খুব চোস্ত লোক। কিছুতেই কিছু হবে না আমার। বরং আমিই অন্যদের নষ্ট করে দিতে পারি। এখন দেখছি, আমার চোখেও কেউ কেউ রহস্য হয়ে দেখা দিতে পারে। যেমন মাসী। আমি তো কোন দিক থেকেই তাকে নাগালে পাই না। শুধু শরীর দিয়ে পেড়ে ফেলায় কি একটা মানুষের নাগাল পাওয়া যায় ? আবার এও মনে হয়—আমি আর মাসী এ রকম জীবন কয়েক জন্ম ধরে করে আসছি। যোগে যোগে দেখা হয়। জানি না বলে ভাবি—এই বুঝি প্রথম দেখা হল। ওঃ! রমজান সর্দার—

খোকন আজকাল আসেই না প্রায়। মাঝে একদিন এসেছিল। বার বার একটা কথাই বলল, তুই কি করে বেড়াচ্ছিস বল তো ? আমি কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না পার্থ।

আজকাল হিতৈষী গলা একদম সহ্য হয় না আমার। বললাম—তুই কি করিস? গল্প উপন্যাস বানিয়ে বানিয়ে লিখে লোক ঠকাচ্ছিস!

না, বানানো ঘটনার বিবরণ তো থানার ডাইরিতে থাকে। লোকে পড়লে সেগুলোই তো ছেপে দেওয়া যেত।

মনে মনে বললাম, তা সত্যি। মুখে বললাম—তোরাই বা কি আহা মরি বিবরণ দিস?

আমি এমন কিছু লিখি না। আমার কথা বাদ দে। আমি লেখকদের কথা বলতে পারি।

ভাষণ দিস নে।

শোন শোন। যা ঘটে--তা সব সময় লেখার জিনিস নয়। যা ঘটলেও ঘটতে পারে—তাই হল গিয়ে লেখার জিনিস। ও সব কথা থাক। আমি গ্রাজুয়েট হতে চলেছি। রেগুলার কোর্সে। তোর জন্যে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়ার ফর্ম এনেছি। তুই ফিল আপ করে দে। আমি জমা দিয়ে দেব।

বই নেই, কিছু নেই। কোত্থেকে পরীক্ষা দেব?

দীপার বই আছে। আমার কিছু বই দেব। তুই পড়লেই পেরে যাবি। এখন আমরা কত ম্যাচিওর। দেখবি সেক্সপীয়রের নাটক পড়তে তোর খারাপ লাগবে না।

হো হো করে হেসে উঠলাম। বেচারা সেক্সপীয়র! আমাকে ভাল লাগাবার জন্যেই যেন চুপচাপ বসে আছেন এই ক সেঞ্চুরি। ও সব পরীক্ষা টরীক্ষা রাখ। ও আমায় দিয়ে হবে না।

তা হলে আমিই তোর নাম সই করে ফিল আপ করে দিচ্ছি।

যা ইচ্ছে তোর।

একদিন শীতের বিকেলে ফ্লাইং ক্লাবের মাঠে একটা প্লেনের ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছিল। দূরে দূরে গাছপালার আড়ালে বাঙালীর গ্রাম। শহর মুছে গিয়ে আদি বাংলার আঁশ বেরিয়ে আছে ওখানটায়। খুব মন দিয়ে ইঞ্জিনটাকে গোঙাতে দেখছি। না জানি এর পর কি হবে? তাই ভাবছি। হঠাৎ চোখ পড়ল—অনেক দূরে মাঠের শেষ বর্ডারে দীপা কার সঙ্গে গল্প করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পাছে মুখোমুখি হতে হয়—তাই আমি আগেই উঠে এলাম।

সেদিনই রাতে দীপা রাগ করে বলল, খোকনদা আমার অফিসে বড় ঘন ঘন ফোন করছে। আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে বড় চিন্তিত। আমরা সবাই নাকি কি হয়ে যাচ্ছি। এ সব কথা বাড়ি এসে বললে পারে। তোমার বন্ধুকে বারণ করে দিও ছোড়দা। অফিসে নানা রকম কথা হয়।

বললাম, তোমরা দু'জনেই অ্যাডাল্ট। পরিষ্কার কথা খোকনকে বলে দিলেই পারো।

এ কথা বলছিলাম—আর মনে মনে ভাবছিলাম—আমার অনেক টাকা দরকার। যে টাকায় দীপা বাড়ি বসে পড়াশুনো করে সুন্দরী ভাল ছাত্রী হিসেবে একটি ভাল ছেলের বউ হতে পারে। বাবা দারোগাসঙ্গ ত্যাগ করে আবার যদি ঘরে বসে ইতিহাস পড়ে—তবে বাবাকে সংসারের মেইন খরচা আর হাতখরচা বাবদে কত টাকা দেওয়া দরকার মাসে? অভিজিৎ কুন্দনকে যদি ভাল স্কুলে দিতে পারা যেত। আমি ডাক্তার হলে একদিন ঐ সব খরচাই সামলাতে পারতাম। আমাকে এখন আবার পড়তে দিলেও—আমি কিছুই বুঝতে পারব না। সুতো কেটে গেছে। ফুটবল চালু রাখলে আজ যদি আমি বড় ক্লাবের প্রাইজ প্লেয়ার হতাম—তাহলে তো কেল্লা ফতে। কুন্দনকে স্টপার করে গড়ে তুলতাম।

ওসব হবার নয়। আর হবার নয়। জীবন এইভাবেই চলবে এখন থেকে। আমার জীবনের ভেতরকার মজ্জা, মেধা—সবই আমি অকালে ব্যয় করে বসে আছি। পাপের বেতন দিয়ে কোনক্রমে টিকে থাকার এই সেকেন্ড ক্লাস পরমায়ু দিয়ে আমি কি করবো? আমি জানি—আমি তো বয়ে গেছি। দীপাও যাচ্ছে। একই পথে যাবে—অভিজিৎ, কুন্দন। আমাদের তো এ রকম হওয়ার কথা ছিল না।

মাঠে অনেকবার গোল করেছি। পরীক্ষায় অনেকবার ভাল নম্বর তুলেছি। জীবনটা ঠিকমত চালানো আরও কঠিন খেলা। আমার বাড়ির জন্যে আমার মন এমন করে কেন? রেস আমাকে সাতদিন ঠকায়। একদিন কিছু টাকা দেয়। মাঠে আমি ঘোড়াদের মন বুঝি না।

বাড়িতেও আমি মাসীর মন বুঝি না। মাসীকে দেখি অথচ চিনি না। মাসী আসলে কে? মাসী কি তা জানে? ওঃ! রূপনারাণের মাছ মারা। ওঃ! অলঙ্গ বর্মন। ওঃ! রমজান সর্দার! তোমার নন্দী এক একদিন শীতের ভোরে ফ্লাইং ক্লাবের মাঠে ঝুলন্ত কুয়াসা দিয়ে চেহারা পায়। কুয়াসার দলায় বিরাট এক নন্দী ফ্লাইং ক্লাবের এয়ার-স্ট্রিপ জুড়ে শুয়ে থাকে। আমি মনে মনে চোখের জায়গায় দুটো লালচে মার্বেল বসিয়ে নিই। ওই মাঠের নাবিতে মাঠেরই নিজস্ব নালায় গত বর্ষায় আমার প্রথম সন্তানের মরা শরীর ভেসে চলে গেল। এখন নালায় একটুও জল নেই। শীতের মুখে কিছু দুর্বল ঘাস জন্মাবার চেষ্টা করছে। সেদিন দেখলাম।

মাসী দিব্যি স্কিপিং করছে। মায়ের সঙ্গে হাঁড়ি ঠেলছে। তার জামাই-বাবুকে হুইস্কির সঙ্গে চাট বানিয়ে দিচ্ছে—খাসির শরীরে করেলি বলে একটা জায়গা আছে—সেই মাংস দিয়ে। অনেক দিন পরে মাসী আমার মাথার কাছে খাবার জল ঢাকা দিতে এলো আজ। জল রেখে বললো, বিছানাটা কি করে রেখেছো বলো তো? সরো।

খাটে উঠে মশারীর দড়িটা ঠিক করতে নিজের শরীরটাকেই ক'বার মোচড়

দিল মাসী। এসব বোধহয় রমজান সর্দার ওরফে গঙ্গাকূলনিবাসী বাবা মহারাজের (!) শেখানো মুদ্রা। কাল উইন্টার গোল্ড কাপের খেলা। আমি তিনটি ঘোড়ার বংশ পরিচয় নিয়ে তুল্যমূল্য অঙ্ক কষছিলাম। আমার যে অনেক টাকা দরকার। মাসী চলে যেতে ঘুমিয়েও পড়লাম এক সময়। স্বপ্নে দেখি একটা ভিজে মাঠে বহু সিকি, আধুলি, কাঁচা টাকা ঘাসে আধখানা ঢেকে পড়ে আছে। শুধু কুড়িয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। কুড়িয়েই চলেছি। হঠাৎ ঝন-ঝন করে সব সিকি আধুলি পড়ে গেল। ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখি কতই বা রাত্তির। বড় জোর বারোটা সাড়ে বারোটা। সুন্দর শীত। আমি চেনা পথ দিয়ে অন্ধকারে মাসীর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আপনা আপনি দরজা খুলে গেল।

খোলা দরজায় একদম অন্যরকম অন্ধকার। সট করে সরে দাঁড়ালাম। মাসী বললো, এসো। আমি জানতাম তুমি আজ আসবে।

ভেতরে ঢুকে সাবধানে ছিটকিনি তুলে দিলাম। আমি আগের চেয়ে অনেক পরিণত। মাসী সুখী হোল। আমায় অনেকদিন পরে চুমু খেলো। গলায়, বুকে। আমার বিশেষ কিছু লাগছিল না। কেমন জলে ঢোসকা পিচবোর্ড। এর নাম মেয়েলোক। কিংবা মাসী। মায়ের কি এক সম্পর্কে যেন বোন। ভুলেও গেছি। মা বাবা কেউ নেই বলে আমাদের বাড়ি এসেছিল। আমাদের বাড়ির ভাঙনের মুখে মুখে।

তোমার বয়স কত মাসী?

কেন? বয়স দিয়ে কি হবে তোমার? ভয় নেই—তোমার চেয়ে ছোটোই হবো। অন্ধকারে আমায় দেখতে পাও না বলে বড় মনে হয় বুঝি।

ছোটো বড়তে আমার কিছু আসে যায় না।

মাসী অভিজ্ঞ শিল্পীর গলায় বললো, আসলে কাজে বসতে জানা চাই। 'কিরিয়াটা' তো সবার আসে না।

তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আর কি শিখেছো?

কেন! ভাত রেঁধে দিতাম বাবাকে। মা বেঁচে থাকতে বাবাকে তো কোনদিন পুরোপুরি বাগ মানাতে পারে নি। খোলাখুলি বাবা কাজে বসতো। বিশেষ করে ভরা অমাবস্যায়। আমি বা মা তখন সেখানে যাই নি।

তোমার বাবার কোন শক্তি ছিল? কোন ক্ষমতা?

বড় ঝাঁপা দিশী নিয়ে কারণসঙ্গ করতেন। মুঠো মুঠো চালভাজা চিবিয়ে খেয়ে ফেলতেন বাবা। কোন ভৈরবীকে বাবার তাঁবে কোনদিন অস্বৈরণ দেখি নি। নিজেই পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরতো বাবা। নিজেই রাঁধতো। তারপর কথা থামিয়ে মাসী আমায় আচমকাই জড়িয়ে ধরলো, তোমারও অনেক ক্ষমতা হবে দেখো। মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে পুকুর পাড়ে ডেকে দেখবে—বড় বড় রুই কাতলা অল্প জলের সিঁড়িতে এসে সাড়া দিচ্ছে।

আমার ইচ্ছে মত ঘোড়া দৌড়োবে ?

নিশ্চয়। প্রসাদী জবা চাই। তার পাপড়ি ধরে সংকল্প করো—দেখবে বেতো ঘোড়ার দাবনায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

একথাটা আমার মাথার ভেতর গিয়ে লাগলো। খট করে। সত্যিই তো। আমার তো খেয়াল রাখা উচিত ছিল। যারা ব্রাহ্মমুহূর্তকে বশ করে রাখতে পারে—কামিনীর ডালে লাল ফুল ফোটায়—তাদের পক্ষে ঘোড়ার পেশীতে একটু এক্সট্রা শক্তি জুড়ে দেওয়া এমন আর কি কঠিন ?

মাসীকে এক গ্লাস জল দিলাম। খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ির কি আছে! আমার তাঁবেও তোমায় অস্বৈরণ হতে হবে না। দেখো মাসী।

আমি কি তাই বলেচি কখনো।

এবারে কাজে বসে আমাদের যোগে যোগে একই সঙ্গে সব হয়ে গেল। মাসীও ছোটখাটো একটা ঘোড়া। পেছনের পেশীতে বেশ একস্ট্রা জোরের নমুনা দেখালো আজ মাসী। দুজনে দু'গ্লাস জল একই সঙ্গে আলাদা আলাদা খেলাম।

মাসী বললো, তোমার হবে। তুমি একদিন ঠিক পারবে। কোন ক্ষমতাই তোমার অবাধ্য হবে না। সব তোমার বশে আসবে দেখো।

আর কবে আসবে মাসী ? আর কবে ?

আমার কথা শেষ হতে পারলো না। দরজায় টোকা। পরপর তিনটে। সিগনালের মত। অন্ধকারেই মাসী দরজার কাছে চলে গেল। আমি কোথায় যাবো বুঝতে পারছিলাম না।

ওপাশ থেকে যে গলার চাপা স্বর এপাশে এসে পেঁছিলো তাতে আমার শীত বেড়ে গেল।

মাসী তখন চাপা গলায় বলছে, আপনি চলে যান জামাইবাবু। চলে যান বলছি।

খোল না দরজাটা। খোল বলছি। ছিটকিনি দিলি কখন ?

ভালো হচ্ছে না কিন্তু। ভালো হচ্ছে না বলে দিলাম।

দরজায় রীতিমত ধাক্কা। মাসী চেঁচিয়েই বললো, দোতলায় বড়দি জেগে গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

হোক কেলেঙ্কারি।

মাসী দরজা খুলে দিল। আমি খাটের নিচে চলে গেছি। শুধু তক্তার কিছু আওয়াজ। পরিষ্কার বুঝলাম—একই ঘরে আমরা দু'টি কুকুর। একটি ওপরে। একটি খাটের নিচে। আমার গায়ে এখন অনেক লোম। খাটের নিচে খালি মেঝেতে একটুও শীত লাগলো না।

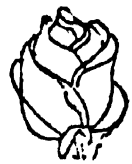

সেক্সপীয়র পড়লাম ডি. এন. ঘোষের নোট মারফৎ। ইতিহাসও সেরকম কোন নোট মেকারের। গরমকালে আমি ডিস্টিংশন নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে পড়লাম। খোকন বাংলা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। এর ফলে সেবারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের ছাদে কোন বজ্রপাত হয় নি। এমন কি খোকন শহরতলীর একটা স্কুলেও বাংলার টিচার হয়ে ঢুকে গেল। স্কেলে মাইনে—ডি. এ.। অবসরে সাহিত্যচর্চা। ওর একটু আধটু নামও হতে লাগলো। রেগে গেলে বলতো, তোর ডিগ্রি আমি কেড়ে নিতে পারি জানিস। অ্যাপলিকেশনে তো আমি সই করেছি—পার্থ দত্তগুপ্ত।

এখন দীপা খুব দেরি করে বাড়ি ফিরছে। একদিন বেশি দেরি দেখে আমিই মোড়ের মাথায় ট্রাম লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাত পৌনে দশটায় একখানা অ্যামবাসাডার থেকে নামলো। গাড়ি যাবার সময় হাত নেড়ে টাটা করলো। রিকশা-সাইকেলে বসে সবই দেখলাম। তারপর চাপা গলায় বললাম, উঠে আয়। দীপা দিব্যি স্বচ্ছন্দ ভাবে আমার পাশে এসে বসলো।

এত দেরিতে কোত্থেকে ফিরছিস? ও লোকটা কে? যাকে হাত নাড়লি?

ভদ্রভাবে কথা বলো। আমার অফিসের সিনিয়র কলিগ। ডক্টর সেন—

অফিসের ওঁরা রাত করে পৌঁছে দেন তোদের?

ন্যাকামি কোরো না। সবার সঙ্গে সোসাল হতে হয়। নইলে ক্লাস টেন ফেল অভিজিৎকে ফিল্ড অ্যাসিস্টান্টের পোস্টে ক্যাজুয়াল ঢোকাতে পারতাম না।

ঢুকছে বুঝি অভিজিৎ?

হ্যাঁ সামনের মাস থেকে কাজে যাবে। ছ'মাস অন্তর ছ'টা ক্যাজুয়াল রিনিউ করাতে পারলে পারমানেন্ট গভরমেন্ট চাকরি। এর ভেতর হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে নিলে আরও ওপরে ওঠার সুযোগ পাবে। চাকরি কি এমনি এমনি হয় ছোড়দা—

আর না পড়ে এখুনি ওর চাকরিতে ঢোকার ডিসিশন কে নিল? আমি তো জানি না।

তুমি কি বাড়ির কিছু জানো? ডিসিশন আমার। দাদা একটা খোঁজ নেয়

না—আর কথা এলো না দীপার মুখে। ভাগ্যিস রাত্তির। দীপা বসা অবস্থায় কাঁদছিল। আমরা ছেলেবেলায় একবার অকালবৃষ্টিতে রিকশায় বসিয়ে সরস্বতীকে ভাসান দিয়েছিলাম। সেই ছবিটা মনে পড়েই মনে মিলিয়ে গেল। এখন কোন কথাই বিশেষ মনে থাকে না। সব হারিয়ে যাচ্ছে।

চাকরি করি না। পড়ি না। ফুটবল খেলি না। রেস খেলি। দু' একটা টিউশনি করি। তাতেই নিজের হাতখরচ চলে যায়। এজন্যে বাবা আমায় কিছু বলে না। আমি বাবার সামনে যাই না। বাবা আমার সামনে পারতপক্ষে পড়ে না। যেমন—আমি আর দীপার সামনে পড়ি না। দীপার অফিসের কলিগরা যখন আমাদের বাড়িতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে—চা খায়—হাসে—তখন নতুন চাকরি পাওয়া অভিজিৎ চায়ের ট্রে এগিয়ে দেয়। চাকরিতে ঢোকার কিছুদিনের ভেতর সে গম্ভীর হয়ে গেছে। চা-টা পৌঁছে দেয়—কারণ সে তো দিদির ভাই। চাকরিতে ঢোকার সময়ে ও এত খুশী হয়েছিল। আমি বুঝতে পারি না—ও কি আমারই মত কোন পাপ করে চলেছে। কুন্দন ক'দিন হোল আর্মিতে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরির চিঠি পেয়েছে। এখন ভরা বর্ষা। আর দশ বারো দিনের ভেতর ও পুণা রওনা হবে। আমাদের বাড়িতে এখন মা আর আমি বাদে সবাই আয় করে। দাদা ঠিক থাকলে দীপার সময়মত বিয়ে হয়ে যেতো। আমার কথা বাদ দিচ্ছি। অভিজিৎ, কুন্দন—দু'জনেই ভালো কলেজে পড়তো এখন।

ভুল হয়েছে একটা। মাসীর কথা বলা হয় নি। মাসী বই পড়তে পারে। আগমবাগীশ তন্ত্রসাধকের মেয়ে। হাতের লেখাও ভালো। কিন্তু কিছু লেখে না। এমন কি কাউকে তো চিঠি লিখতে পারে। কিন্তু কেউ নাকি লেখার মত নেই। এমন কি খবরের কাগজ ছুঁয়ে দেখে না। পরিষ্কার বলে—পড়ে কি হবে? আছেটা কি কাগজে? একবার আমাদের আমতা লাইনে একজন মুড়ি ব্যাপারী চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে গেল। শিয়াখালার কাছাকাছি। বাবা একখানা কাগজ এনেছিলেন কোত্থেকে। তাতে ব্যাপারীর কথা এক লাইনও লেখেনি দেখলাম। যত আজেবাজে খবরে ঠাসা। মাসীর এমনই কনফিডেন্স—যাতে সে স্বচ্ছন্দে খবরের কাগজ ব্যাপারটাকেই বাঁ হাতে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। তা মাসী মাস মাইনের চাকরি কোথাও করতো না ঠিকই। কিন্তু ক'বছর তো আমাদের বাড়ির ডেগমাস্টারি করে যাচ্ছে। সেই পরিশ্রমের ব্যাপারটা কারও অস্বীকার করার উপায় নেই। পরিশ্রমী, ছিমছাম, সাজতে ভালবাসে, হাসি মুখ সব সময় আর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী—মাসীর এ চেহারা সবাই জানে। ফলে মাসীকে ঘিরে তার নিজেরই ব্যক্তিত্বের একটা বেড়া গড়ে উঠেছিল।

আমিও মাসীকে এভাবেই জেনে এসেছি। সেই সঙ্গে আমি জানতাম—আমি তলিয়ে যেতে যেতেও মাসীর সঙ্গে কাজে বসেছি। কিন্তু গত শীতে—

একই রাতে টের পেলাম—আমি আর আমার বাবা দুজনেই কুকুর। মাঝ-

খানে শুধু কয়েকখানা তক্তার ফারাক।

সে দিনের পরের রাতে ভীষণ শীত পড়েছিল। তার পরের দিনের কাগজে লিখেছিল—গত পঞ্চাশ বছরে এমন শীত আর পড়ে নি। অর্ধ শতাব্দীর শীতলতম রাত।

বাবা সে রাতে কাজে বেশিক্ষণ বসতে পারে নি। বড় হড়বড় করেছিল বাবা। বাবা কি এমন হড়বড় করেই আমাদের পৃথিবীতে এনেছিলো? কে জানে!

যেমন এসেছিল—তেমনি বেরিয়ে গেল বাবা। দরজায় ছিটকিনি দিয়ে মাসী আমায় চাপা গলায় ডাকলো, বেরিয়ে এসো।

আমিও বেরিয়ে এলাম। মাসী আমায় টেনে নিচ্ছিল তার কাছে। আমি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম।

মাসী বললো, নিজেকে নিয়ে এমন অসুবিধেয় পড়বো—অল্পবয়সে কোনদিন ভাবি নি।

আমি এগিয়েছি—বেরিয়ে আসবো বলে—মাসী সামনে এসে দাঁড়ালো। অনেক দিন পরে অন্ধকারে আবার তার চোখের শাদা দেখতে পেলাম। আমার সবচেয়ে ঘেন্না করছিল নিজেকেই! এই হোল গিয়ে আমার জীবন! আমি, আমার বাবা এবং এরকম কিছু লোক পৃথিবীটাকে পাল খাওয়ানোর খোঁয়াড় করে তুলেছি। আর এই জীবন নিয়ে এত আকচাআকচি। সম্মান, স্ট্যাটাস, ভবিষ্যত!

আমিই আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছি!

মাসীর এ কথাতেও আমি কিছু বললাম না। মাসী তখন দু হাতে আমাকে শক্ত করে নিজের বুকের ভেতর নিল। যে বই পড়ে না—কাগজ দেখে না—বুনো কায়দায় কালীর একখানা ছবি হাতের তেলোর ঘামে মাখামাখি করে রাখে—সে বললো, মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে নানা দিকে নিয়ে যায়। এর বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। বাবা আজ কাজে বসলেন। কালই সব ভুলে যেতেন।

বুঝলাম, নিজের বাবা আর আমার বাবার ব্যাপারকে মাসী বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছে না। জীবনে এরকমই হয়। এরকমই একটা ধারণা।

হঠাৎই বলে ফেললাম, স্কাউন্ড্রেলকে আজ রাতেই শিক্ষা দেব। জীবনের শিক্ষা—

বলেই মনে পড়লো, আমিই বা কি করছি! বাবা তো আমার খোয়াড়ে আগন্তুক যাত্রী মাত্র। পৃথিবীতে মেয়েলোক, বিষয়-সম্পত্তি—সবই তো সঙ্গ, অর্জন, অধিকারের নামে এক ধরনের খোয়াড় প্রথা। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে—আকাশের নীচে মানুষ প্রথম যে ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল—তা অনেক মনীষীর মতে ঘোড়া। ঘোড়া নাকি মানুষের প্রথম বড় ধাপ। গতি ইত্যাদি। কিন্তু আমার মতে—আকাশের নীচে মানুষের প্রথম বড় ধাপ আলাদা আলাদা জীবন-

যাপনের জন্যে আড়ালের আয়োজন—মানে ঘর বানানো। নইলে আজ রাতে কি আমি আর বাবা দুজনই একই সঙ্গে আমার চোখে কুকুর হয়ে যায়?

মাসী আমায় থামালো। জামাইবাবুকে দোষ দিও না। বয়েস হয়ে গেছে। বহু দিন বড়দির শরীর ভালো না। যদি একটু প্রবৃত্তি করেই ফেলে তাতে অত উতলা হওয়ার কিছু নেই। কত অসহায় বল তো মানুষটা। একটু থেমে বললো, বিশেষ কিছুই পারে না। হুড়মুড় করে এসে নিজের দপদপা একটুর ভেতর ঝিমিয়ে নিয়ে ফিরে যায়। কত অসহায়—তাই না? সবই অভ্যেসের ফেরে করে যান জামাইবাবু। পুরুষের অভ্যেস।

আর তুমি?

ভাবো তো—আমার শরীরটাও কতখানি দুঃখের।

আমি সবটা মানে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে বুঝতে পারছিলাম—মাসী যে বলে ধারণ, তন্ত্র, কিরিয়া—সবই মাসী বিশ্বাস করে। শরীরে থেকেও যেন মাসী শরীর ছাড়িয়ে যেতে পারে।

তুমি অনেক জানো মাসী। আমি তো অত জানি না। আমি দিনকে দিন পাপে তলিয়ে যাচ্ছি।

বোকা! পাপ বলে জগতে কিছু আছে না কি?

তাহলে পুণ্যও নেই বলো।

নেই-ই তো। পাপও যা—পুণ্যও তাই—বুঝেছো বোকাচন্দ্র। সবই মানুষের কাজ। এক একটার এক একরকম নাম দিয়ে থাকি আমরা। যে কোন রকমের কোন না কোন কাজ করাই তো মানুষের অভ্যেস।

শুনছি আর ভাবছি—এই-ই শাস্ত্র আলোচনার উপযুক্ত সময়, পরিবেশ—আর আদর্শ পাত্র-পাত্রী।

শীতকালের বাকি দিনগুলো আমি দু-হাতে টিউশুনি করলাম। রটে গেল আমার মত অলস্কোয়ার টিচার ট্রাম-লাইনের এপারে আর নেই। টাকাও আমার দরকার ছিল। কলকাতা, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর—সব রেসেই টাকা লাগাচ্ছি। বেশির ভাগই হেরে ভূত। একটা ট্রিপল্ টোট মিলিয়ে ফেলায় আচমকা আঠাশশো টাকা পেয়ে গেলাম।

খোকন এসেছিল। বললো, তোর মত অঙ্ক, ইংরেজি, সংস্কৃত, ভূগোল কে পড়াবে? গ্রামার, হায়ার সেকেন্ডারির সায়ান্স—তুই চেষ্টা করলেও ভুলতে পারবি না টাকাটা নষ্ট করিস নে। অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি নে। সেখানে গুছিয়ে টিউটোরিয়াল কর। বাড়ি এসে তোকে টাকা দিয়ে যাবে অভিভাবকরা।

কথাটা মনে লাগলো। তখন পর্ণশ্রী হচ্ছে সবে। চ্যাচারির বেড়া, সিমেন্টের মেঝে—ছাদে টালি—ইলেকট্রিক আর পুকুর সমেত চারঘরের সেপারেট দেওয়াল দেওয়া একতলা এক বাড়ি নিয়ে বসলাম মাসিক সত্তর টাকা ভাড়ায়। ভাবলাম, ছাত্র পড়াবার পর তেতাস খেলার মডেল বাড়ি হবে। টিউওয়েল, বাথরুম,

কিচেন—সবই আছে। তখন টিউশ্‌নির কাঁচা পয়সায় দিশী বিলিতি সবই ধরে ফেলেছি। আর খিদে পেলে কাছাকাছি তো বাড়িই আছে। গিয়ে খেয়ে আসবো। মায়ের হাতে টাকাও দিচ্ছি। দীপা একদিন এসে ইন্সপেক্ট করে গেল। যাবার সময় বলে গেল, দেখো ছোড়দা, একা একা বেশি মদ খেয়ে ফেলো না এখানে। তোমার স্বভাবে তো কোন কন্ট্রোল নেই।

সকাল থেকে পড়াচ্ছি। সিফটে সিফটে। দুটো বি এস সি রেখেছি মাস মাইনেয়। দিব্যি চলে যাচ্ছে। অনেকটা ডাক্তারদের মতই আমার পসার বেড়ে চলেছে। ফাঁকা থাকলে রেসের বই নিয়ে অঙ্ক কষি। বাজি ধরি। আবার এলাকার সেয়ানাদের সঙ্গে তেতাসের বোর্ড বসিয়েও মন্দ আসে না। আমি সব দিকেই প্রোফেশনাল হয়ে উঠছি। রাত দশটায় তালা ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। কোন কোনদিন আরো রাত হয়। ছাত্রদের মুখে মুখে পার্থদার টিউটোরিয়ালের নাম।

কয়েক সিফটের রুটিন, মডেল কোশ্চেন আনসার, তেতাস, রেস, দু' নম্বর বাংলা—সব মিলিয়ে মাথাটা জ্যাম করে বাড়ি ফিরি আর খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। এক একদিন মাসী আমার ঘরের জানলায় টোকা দিতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়। মাঠে নেমে গিয়ে তারপর সেদিককার জানলায় ধাক্কা দেয় বেশ জোরে। ধড়মড় করে উঠে পড়ি। যাচ্ছি—

এই যাতায়াতে কোনদিন বাবার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আমার এটা পাপও নয়। পুণ্যও নয়। অভ্যেস। পুরুষের অভ্যেস। আমি একদিন একগজ ফিতেও কিনে দিই নি মাসীকে। টাকা আসছে। বাবারই মত বলতে গেলে। নতুন টাকা এসে পুরনো টাকাকে চাপা দেয়। ব্যাচে ব্যাচে স্টুডেন্ট তো। ব্যাচে ব্যাচে টাকা পাই। খোকনও বাংলা, ইতিহাস পড়াতে আসে মাঝে মাঝে। পড়িয়েই চলে যায়। ও তাস জানে না। অঙ্ক বলে রেসের টিপস্‌ বোঝে না। এক একদিন বাড়ি ফিরে দেখি খোকন দিব্যি দীপার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, মাসীর সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছে। আমি বাড়ি ঢুকি চুপচাপ —আর মনে মনে বলি—বাঃ! বেশ। ভালো ভালো।

এক সময় টাকার জন্যে হন্যে হয়েছিলাম। এখন টাকা এলো। আমি ফিরে জীবন বানানোর দিকে গেলাম না। মানে—আবার তো ফার্স্ট এম বি পরীক্ষায় বসার চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করলাম না। আমার যে পসার হয়ে গেছে। আমি পড়াশুনোর একজন হাতুড়ে ডাক্তার—যার পসার চেম্বার খুলে বসতেই কয়েক মাসে হু হু করে বেড়ে গেল। সাইনবোর্ড আঁকাতে দিলাম।

দি পার্থজ টিউটোরিয়াল হোম
পাস উইথ গ্যারান্টি
ডিভিশন উইথ গ্যারান্টি
স্পেশাল কোচিং ফর স্পেশালি উইক
স্টুডেন্টস্ উইথ স্পেশাল ফি
সাবজেক্ট ওয়াইজ অ্যাটেনশন

অভিজিতকে ফিল্ড থেকে ফিরিয়ে এনে আবার পড়াতে পারতাম। অ্যালাউন্স নিয়ে খারাপ পায় না। ও হয় তো ফিরতেই রাজি হোত না। কুন্দনকে ফিরিয়ে আনা আরও কঠিন ছিল। ও ক'বছরের বন্ড সই করে ঢুকেছে। আসলে ওসবে আমার আর আগ্রহই ছিল না।

সরস্বতী পুজো হোল। নিজের স্কুলের পুজো ফেলে খোকন স্টুডেন্টদের মাঝখানে দীপার সঙ্গে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি দিল। চোখ বুজে ভক্তিভরে। অঞ্জলি দেবার সময় যে কোন মেয়েই চোখে ধরে যায়। বিশেষ করে দীপা যেখানে খোকনের ওল্ড্ ক্লেম। এরপর খোকন আবার দীপার ডবল প্রেমে পড়লো। স্কুলে অ্যাবসেন্ট হয়ে খোকন দীপার অফিসে যেতে লাগলো। দীপা বারণ করায় স্কুল থেকে আগে বেরিয়ে দীপার অফিস গেটে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো। উদ্দেশ্য, ছুটির পর দীপাকে নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের মত বেড়াতে বেরোবে—ভিক্টোরিয়া, ময়দান আউটরাম ঘাট—এই সব আর কি।

দীপা একদিন বললো, খোকনদা তুমি এসো না এমন করে। তোমার লেখা অনেকে পড়ে। কেউ কেউ চেনে তোমায়। কেন খেলো করছো নিজেকে। কি দরকার?

খোকন ভালবাসার জন্যে তার নতুন পরিচয়ে কালি মাখাতেও রেডি ছিল। বললো, ভারি আমি লিখি! তার জন্যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে অফিস গেটে দাঁড়াতে পারবো না?

দীপা হাল ছেড়ে দিয়ে বললো, তুমি না খোকনদা কিচ্ছু বোঝো না।

দীপার সে ভঙ্গীও খোকনের ভাল লাগলো। এরপর একদিন দীপা অফিসের পর গেটেই কার গাড়িতে উঠতে যাবে—এমন সময় খোকন পেছন থেকে ডাকলো, দীপা। আমি। এই যে আমি মানে—

গাড়িতে উঠেই পড়েছিল। ভ্রূ কুঁচকে দীপা নেমে এলো। দীপার সেই মুখ দেখে খোকনের মুখের হাসি নিভে গেল।

কি? কি চাই?

আমি। মানে আমি এসেছি দীপা—

দীপার বড় অসহায় লাগলো তার খোকনদাকে। তাই রাগ যেন আরও

বেড়ে গেল। এসেছো কেন? কেন বল তো? দিলে তো পেছন থেকে ডেকে। কি বলবে বলো?

খোকন হড়বড় করে বলে বসলো, আমি তোমাকে চাই দীপা। আরও সাহস করে এক রাস্তা লোকের ভেতর প্রায় চেঁচিয়েই বললো, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই দীপা। আমি ভালবাসি তোমাকে। আমি ঠিক জানি—ওরা কেউ তোমায় বিয়ে করতে এগিয়ে আসবে না।

দীপা দেখতে পাচ্ছিল, খোকনদা কথা বলছে—আর তার মুখের আলো নিভে আসছে। বড় করুণ লাগলো। তাই দীপা একদম কঠিন না হয়ে পরিষ্কার বললো, বিয়ে? ছ্যাঁ! আমার মত মেয়ে বিয়ে করে? না, বিয়ে হয়! আমি চলি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থেকে বাড়ি যাও।

এরপর দীপা সেই দাঁড়ানো গাড়িতে গিয়ে ওঠে।

টিউটোরিয়ালে পড়াতে এসে খোকন একদিন আমায় ওই সব ডায়ালগের কিছুটা বলে। চোখের বিষাদ, থমথমে মুখ দেখে বাকিটা আমি সাজিয়ে দিলাম। আমি জানি—আমার বোন তো! কোন কন্ট্রোল নেই স্বভাবে। এখন দীপার পাতাল যাত্রা শুরু হয়েছে।

দীপাকে ফেরাবার সময় ছিল না আমার। তখনো পারতাম। কিন্তু চেষ্টা করি নি। সরস্বতীর ভাসান দিই নি। মূর্তি প্রতিষ্ঠায় টিউটোরিয়ালের প্রতিষ্ঠা বেড়ে গেল দমকা। বুদ্ধি করে এই মওকায় কো-এডুকেশন খুলে দিলাম। কোচিংয়ের আকর্ষণ আরও বাড়লো। চার ঘরে সব মিলিয়ে কুড়িটা সিফট চলতে লাগলো। একজন গণৎকার আমায় হাত দেখে বললো, কেতু প্রবল আপনার। অনেক টাকা দেবে।

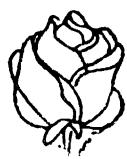

ভরা বর্ষায় অনেকদিন পরে বাড়ি ফাঁকা পাওয়া গেল একদিন দুপুরে। অনেকদিন ধরে মাসী এই বিকেলটার অপেক্ষায় ছিল। আমি যেন কী কাজে বাড়ি এসেছি। মাসী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, কাঁটা বিঁধেছে আবার—

চমকে বলে ফেললাম, কবে? কি করে?

মাসী হাসলো। আহা! জানে না যেন!

এই সময় কোন মেয়েলোক যে তার অবৈধ সন্তান পেটে ধরেও তাই নিয়ে হাসি

মস্করায় মাততে পারে—তা মাসীকে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। এবার আমি আগেরবারের মত অস্থির হয়ে ভয় পেলাম না।

আমিও পিছিয়ে নেই। বললাম, আমার ছেলে না ভাই হবে?

জামাইবাবুকে নিয়ে অমন করে কথা বোলো না। বড় দুর্বল মানুষ। তোমায় খুব ভালবাসে।

জামাইবাবু তো আমার বাবা। কালো পানা কাঠের সেই ছোট্ট ডুগডুগিটা কোথায় গেল?

ছিলো। দিন কয়েক হোল খুঁজে পাচ্ছি না। সর্বনাশী ঘাটে যেতে হয় তো একবারটি—

এমন জিনিস হারালে। যদি আর না পাই।

পাবে। পাবে। আমার বিশ্বাস বলছে পাবে। গেলেই পাবে।

বেপট জায়গা—যদি আর না ফিরি। রিকশা সাইকেল যেতে চায় না অনেক সময়। হাঁটতে হয় অনেকটা।

ফিরবে। ফিরবে তুমি আমি জানি। না হয় হাঁটবে কিছুটা।

শেষে যেন অন্ধকারে আমায় দেশলাইকাঠি দিয়ে ব আঁকতে বোলো না মাসী।

শনিবার বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম। বর্ষায় গঙ্গা একই সঙ্গে উৎফুল্ল আবার গম্ভীর। নন্দী গাছতলায় রিসিভ করলো আমাকে। কুকুরদের স্মৃতি হাড়ে বাস করে। সহজে মোছে না। ও আসলে তেড়ে আসা ঢেউয়ের তালে পিছোচ্ছিল। আবার নেমে যাওয়া জলকে ধাওয়া করে গিয়ে লাল কাঁকড়া কুড়মুড় করে চিবোচ্ছিল। অথচ মুখে এমন একটা ভাব সব সময়—যেন বলতে চাইছে—দাঁড়া শালা জল—তোকে মজা দেখাচ্ছি।

আমি এখন পার্থজ টিউটোরিয়াল হোমের ডিরেক্টর। পারতপক্ষে ট্রাম-বাসে উঠি না। ট্যাকসি-ই বেশি ইউজ করি। চোখে মুখে আয়েসী ভাব এসে গেছে জানি। মাস্টারি লাইনের পুরনো লোক দাদা। সে অব্দি সব দেখে শুনে খাতির করে একখানা চিঠি লিখেছে আমায়।

মাসীকে নার্সিং হোমে দেবার মত পয়সার অভাব নেই আমার। কিন্তু গতবারে সন্তান, মাসীর শরীরের বিপদ, লোকলজ্জা, সম্মানের কথা ভেবে যতটা অস্থির হয়েছিলাম—এবার তা হতে পারছি না দেখে এক এক সময় আমার দুঃখু হচ্ছে। এখানে এসেছি—যদি লাগে তাক—তো হয়ে যাক না তুক্। খরচার ব্যাপার নেই। উপরন্তু ঘোড়ার দাবনায় এক্সট্রা বিদ্যুৎ জুড়ে দেবার প্রসাদী জবা পেয়ে যাই তো মন্দ কি!

আমি অস্থির হতে পারছি না দেখে লজ্জাও পাচ্ছিলাম। এক সময় মনে হয়েছে—এ সন্তানটি আমার? না, আমার পিতৃদেবের? মাসী কি খবরটা দিয়ে

বাবাকেও একই সঙ্গে অস্থির করে রাখার চেষ্টা করে নি? মাসী যা করিতকর্মা তাতে আমার এ সন্দেহ মিলেও যেতে পারে। তবে পার্থজ্ টিউটোরিয়াল হোমের ভবিষ্যৎ ভেবেও মাসীকে আমার খালাস করা দরকার। তিনটে কো-এডুকেশন ব্যাচ পড়তে আসে। যদি কিছু রটে যায় আমার নামে তো সর্বনাশ।

বাসী মাংস, দিশী মালখোর নন্দী তন্ত্রসাধন দেখে দেখে আর পাঁচটি কুকুরের চেয়ে কিছু ভিন্ন। সে গঙ্গার জোয়ার ভাটা দেখে বড় হয়েছে। দিব্যি আমায় নিয়ে বাবার আলয়ে তুললো।

ফাঁকা বারান্দা। ঘরেও বোধহয় কেউ নেই। নন্দী তিনবার বিকট গলায় ঘেউ ঘেউ করলো। তার একটু বাদেই নীচের নদী থেকে অলঙ্গ উঠে এসে দাঁড়ালো। ডাকছিস কেন?

আমায় দেখতে পেয়ে বললো, ওঃ। এসে গ্যাচো। আরও ক'দিন আগে এসে পড়ার কথা তোমার।

আমার তো এবার অবাক হবার কথা নয়। তাই বললাম, বাবাকে দেখছি না।

রানাঘাটের ওদিককার এক গেরস্থ বউ আজ রাতে খুন হবে। খুন করেই তার স্বামী রাতারাতি জলে ভাসাবে। ভাসিয়ে দিয়ে রটাবে নদীতে নাইতে গিয়ে ভেসে গেছে। বউটি সুলক্ষণা সুন্দরী। গঙ্গার চেহারা তো দেখছো। মাঝে মাঝেই ভেতর দিয়ে ঘাই মারছে চোরা ঢেউ। শেষে যদি অমন ভালো জিনিস নজর এড়িয়ে বাগবাজার ঘাটে গিয়ে ভেসে ওঠে—তখন—তখন কি হবে?

ভাসা মড়া চোখ এড়িয়ে অন্য ঘাটে গিয়ে ভেসে উঠলে কি হয়, আমার জানার কথা নয়। সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই। বর্ষার ভরা নদী। এর কোন্ জায়গা দিয়ে কে ভেসে যাবে—তা নজরে রাখার উপায়ই বা কি? বাবা কোথায়? এখনো তা জানা যায় নি। এসব কূট প্রশ্নে না গিয়ে একটা সরল কথা জানতে চাইলাম।

গেরস্থ বউটি কি খুন হয়ে গেছে?

কথা বাড়িয়ো না। ব'ড়শি পেতে এয়েছি। ক'টা বাজে?

সাড়ে পাঁচটা।

আর ঘণ্টা খানেকের ভেতর স্বামীর হাতে সাবাড় হবে। যাই আমি—

দাঁড়াও অলঙ্গ। যদি জানতেই খুন হবে—তো ট্রেনে করে গিয়ে রানাঘাট থানাকে বলে সাবধান করে দিয়ে আসতে পারতে।

ঠা ঠা করে হেসে উঠলো অলঙ্গ। তাও হয় নাকি? ভবিতব্য কে খণ্ডাবে। তাহলে কি বাবা শুধু শুধু পাট কোম্পানীর গাদাবোটের নোঙরের সামনে বক হয়ে বসে আছে?

এ একদম অকাট্য যুক্তি। তাহলে বাবা কাল ভোরের আগে ফিরতে

পারছে না।

অত দেরি হবে না। হয় তো শেষ রাতেও জিনিস নিয়ে ঘাটে ফিরতে পারে।

বর্ষার গঙ্গা। তাও রাতের বেলা। ডুবেও তো যেতে পারে বাবা।

ডুববে কোন্ দুঃখে। ভাসা মড়া ধরে ভাসতে ভাসতে ঘাটে ফিরে আসবে বাবা। ও জিনিস তো ডোবে না।

যেয়ো না। দাঁড়াও। আমার খুব দরকার।

জানি তো আমরা সব। খালি হাতে বার বার কারবার হয় না।

জানতাম, আমার হাতঘড়িটা অলঙ্গর খুব পছন্দ। এখন আমি মাসে এমন দশটা হাতঘড়ি কিনতে পারি। কবজি থেকে খুলে নিয়ে বললাম, নাও। যদিও নগদ টাকা ইনসাইড পকেটে গজগজ করছিল, তবু বললাম, নগদা কিছু খসাতে পারছি না—এই নিয়ে সন্তুষ্ট হও অলঙ্গ। আমি রাতে রাতে বাড়ি ফিরবো।

যারা জানে আজই একজন গেরস্থ বউ খুন হবে—তাদের চেয়ে সময়ের পল, অনুপল কে ভাল জানতে পারে! ঘড়ি তো সেখানে নাস্যি। তবু পৃথিবীতে থাকার অভ্যেস তো—তাই হাতঘড়ি পেয়েই ভিজে কবজিতে পরে ফেললো অলঙ্গ। হাসি মুখে বললো, হাতঘড়ি হোল গিয়ে পুরুষ মানুষের হাতের লোহা সিঁদুর—চুড়িও বলতে পারো।

এখন ভালোয় ভালোয় দাও তো! অনেকটা পথ ফিরতে হবে। সংকল্প করা কটা প্রসাদী জবাও চাই।

নতুন ভৈরবী আনতে গেছে বাবা। ফিরে কালই হয় তো কাজে বসবে। থেকে গিয়ে কাল বিকেল বিকেল যেও। প্রসাদীর টাটকা সংকল্প করা জবা পেয়ে যাবে।

আমার বাসী জবা হলেই চলবে।

জিনিস বলতে ঝাঁটার ছোট্ট খিল। কালো মত। এবার হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলাম। গাছ কাঠের হয় তো। সামান্য জিনিস। অলঙ্গ বললো, বুনো জঙ্গল থেকে বাবার নিজের হাতে কেটে আনা কাঠ দিয়ে তৈরী! কত যে মুশকিল আসানী চিজ—তা তো তুমি জানোই—

কোন জঙ্গলের অলঙ্গ?

এমন কিছু ভারি জঙ্গলের নয়। এক একদিন বাবা নিশুতি রাতে গঙ্গার পাড় ধরে বেরিয়ে পড়ে। জোচ্ছনার ভেতর দিয়ে বাবা একা একা জলের গায়ে পাঁক মাটি টপকে টপকে অনেক অনেক দূরে চলে যায়। নদীর গায়ে কত জঙ্গলা জায়গা আছে। পোড়ো মাঠ। সেখান থেকে কেটে আনা। জায়গার লক্ষণ দেখে বাবা কেটে আনে। নিজের হাতে একটা পিঁড়ি বানিয়েছিল বাবা একবার —ওই কাঠে।

যাবার সময় অলঙ্গ পাঁচটা শ্বেত জবা দিল আমার হাতে। ভাল করে ধরো।

উঁচু জায়গায় শুকনো করে রেখো কিন্তু।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাবার ঘরের রোয়াকের সামনে নন্দী বসে। তার পিছনে সদ্য ধরানো আলোয় তিন ত্রিশূলের ন'টি ফলা চিকচিক করছে। অলঙ্গকে বলে বসলাম, এক ভৈরবী থাকতে বাবা আরেক জনকে আনতে গেল?

সেই তিনি? তেনাকে তো আবার মড়া করে কবে ভাসিয়ে দিলেন গঙ্গায়। ভৈরবীবর্গের তুমি কি বুঝবে—

আমি থাকি ইলেকট্রিকের আলোয়। চড়ি ট্যাক্সিতে। আমার পক্ষে বাতাসের ভেতর অদৃশ্য জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্ভব নয়। রাত দশটার ভেতর বাড়ি পৌঁছলাম। তখনও দীপা বাড়ি ফেরে নি।

সে রাতে কাঠের ডুগডুগিটা আমাকেই বাঁধতে হোল মাসির কোমরে। ভোর-রাতের ঘণ্টাখানেক আগে আমার দরজায় খুট খুট। সেই একই ব্যাপার। এবারও মরা ছেলে। ছোট্ট এক টুকরো কাঠের পুতুল যেন। বর্ষাকাল বলে ক্লাইং ক্লাবের মাঠের নাবিতে নালায় আবার জল। সব সময় নীচের দিকে গড়াচ্ছে। কতদূর যে সে জল যায় জানি না। এবার ফেলে দিতে গিয়ে কোন ভয় বা আতঙ্ক কাজ করছিল না। বরং মনে হচ্ছিল—পৃথিবীতে আমি যেন কয়েক শতাব্দী ধরে নিজের আত্মজকে এইভাবে বিসর্জন দিয়ে আসছি। ফিরতি বাতাসে শেষ রাতে একটি মূল্যবান দিবা অবসানের স্মৃতিচূর্ণ ভাসে। সে দিনটি আর আসবে না। সে জীবন আর ফিরবে না। বাতাসের ভেতরে দূর থেকে কোন গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠের গান ভেসে আসছিল। সঙ্গে সেই এক-তারার টান। আমিও কি অজ্ঞাতে বৃত্তসাধকের চক্রে পড়ে আছি? ব্যাপারটা ভয়ের নয়—কেন যেন ভয়ানক!

ফিরে আসছিলাম, আর মনে হচ্ছিল ফ্লাইং ক্লাবের ঢালাও মাঠের সবটুকু বাতাস আমার ফুসফুসে ঢুকে ফুসফুস জোড়া মেলার বেলুন করে দিতে চায়। আমি কি টাটকা, তেজী, রাগ পায়ে মাঠ পার হয়ে ফিরে আসছি। আসলে দু' দুটি শিশুর পরমায়ু আমি পাপ দিয়ে কিনেছি।

সকাল ছ'টায় পার্থজ টিউটোরিয়াল হোমে পড়াশুনো শুরু হয়। আমি ডিরেক্টর, তাই ভেতরে শেষ ঘরটায় বসি। হোমের ঐতিহ্য গড়ে তুলতে দেওয়ালের র‍্যাকে টেক্সট বুক সাজিয়ে রেখেছি—তিন কপি করে। ঘরে ঘরে ব্ল্যাকবোর্ড। খাবার জলের কুঁজো। বাথরুমে দুটো অতিরিক্ত প্যান বসাতে হয়েছে। ফিনাইল ব্লিচিং পাউডার তো আছেই। উপরন্তু এ বেলা ও বেলা জমাদার এসে পরিষ্কার করে যায়। সবার ওপরে আছেন স্বয়ং সরস্বতী। তাঁর মূর্তি ভাসান দেওয়া হয় নি। রোজ নতুন মালা পরানো হয় দেবীকে। ছাত্রছাত্রীরা বেশির ভাগই গাড্ডু খাওয়া। তারা ভক্তিভরে প্রণাম করে পড়তে বসে।

শনিবারে মনসুন মিট আমার একমাত্র রিলাকসেশন। এ মরশুমে এই দিনটি আমি আগেই মনে মনে টিক দিয়ে রেখেছিলাম। দুপুরে পাঁচসিকের প্রণালী দিলাম কালীবাড়ি। তারপর ট্যাকসি নিয়ে মাঠে। সোজা গ্র্যান্ড-স্ট্যান্ড।

ক'দিন ধরে অঙ্ক কষেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি—আমার আর আশপাশের সবার ফুসফুস ঘোড়ার ছদ্মবেশে স্টার্টিং পয়েন্টে চলেছে। সবুজ ঘাস। দারুণ দাবনা দাপাতে দাপাতে ফুসফুসগুলো জকিদের নিয়ে চলেছে। তুলনায় কম ভাগ্যবতী স্পিটফায়ার নামের ঘোড়ায় বাজি ধরলাম। আটের দরে। শ্বেজবা বের করেছি মানিব্যাগ থেকে। তারপর যা করি নি কোনদিন—দম বন্ধ করে শুকনো পাপড়ি দু' হাতে মুঠো করে বসে আছি। ঘোড়ারা ততক্ষণে রওনা হয়েছে।

মিরাকেল নাকি চোখে দেখা যায় না। আমি কিন্তু দেখতে পেলাম। সারা মাঠে আর মাঠের বাইরে লাখখানেক লোককে সাক্ষী রেখে। স্পিটফায়ার শেষ লেগে তার দাবনায় এক্সট্রা বিদ্যুৎ টেনে নিল—মেঘলা আকাশ থেকে—কিংবা আমার হাতের জবার পাপড়ি থেকে।

পুরো আঠাশ হাজার আটশো টাকার পেমেন্ট নিয়ে সোজা বাড়িতে চলে এলাম। বাবা দেখি আমায় দেখে বারান্দায় এগিয়ে এলেন, হাসিমুখ, কোথায় থাকিস? তোদের মাসীর আশীর্বাদ হয়ে গেল। লোকজন এলে বাড়িতে তো কথা বলার কারও থাকা দরকার। বাইরের লোকজন সবাই—

কোথায় বিয়ে ঠিক করলে?

রায়দিঘি। ওদের বাসনপত্র, মসলাপাতির দু' দুখানা দোকান রায়দিঘি বাজারে।

ছেলে দেখেছো? কি করে?

আমি কি অত কাঁচা! নিজেদের বাড়ি, গাইগরু, ফলের বাগান—কী নেই। বলতে বলতে নিত্যানন্দ দত্তগুপ্তর খেয়াল হোল—নিজের ছেলে পার্থ দত্তগুপ্তকে তার তো এতখানি কৈফিয়ৎ করার কথা নয়। আচমকা থেমে গিয়ে বললেন, কেন? তুই কি পাত্র খোঁজ করে রেখেছিস?

বাবার এই কথায় শ্লেষ ছিল—আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু সেদিক দিয়ে না গিয়ে খুব সরল গলায় বললাম, না। আপনারই তো ভায়রাভাই হবেন ভদ্রলোক

মাসীর বিয়েতে আমিও হাজার টাকা দিলাম। খাটাখাটনি করলাম। বর-যাত্রীরা বসলো পার্থজ টিউটোরিয়ালে। পৌঁছেও দিয়ে এলাম আমি। ফেরার সময় মাসী বললো, মাঝে মাঝে আসবে কিন্তু—

রায়দিঘি থেকে ফিরে আসার পর প্রথম কাজ—ট্রাম লাইনের ওপর একটা নতুন ব্যাংকে আঠাশ হাজার আটশো বাকি টাকার সঙ্গে টিউটোরিয়ালের কিছু

টাকা জুড়ে তিরিশ হাজার ফিক্সড্ ডিপোজিট করে ফেলা। সুদ মানে বুঝতাম কাবুলিওয়ালা। পাটিগণিতের অঙ্কে কুসীদজীবি কথাটা পেয়েছি আগে। এখন দেখছি কষ্ট করে বা মুফতসে গাছতলায় পড়ে পাওয়া মোটা টাকা একবার ব্যাংকে ফেলতে পারলে পরিশ্রমের—মানে খাটুনির কারণগুলো কিনে ফেলা যায়। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে-টাকা আসে সাধারণ লোকের—সে টাকা তো সুদেও আসতে পারে। ঘুম থেকে উঠে ব্যাংক থেকে তুলে আনলেই হয়। পাপের মত টাকাও মানুষকে পরমায়ু দেয়।

আমি এখন একজন সুপরিচিত ভদ্রলোক। নিয়মিত দাড়ি কামাই। পাট-ভাঙ্গা ধুতি পরি। ওপরে পকেটওয়ালা ফতুয়া। কেন না, অনেকক্ষণ আমাকে টিউটোরিয়ালের গদিতে বসে থাকতে হয়। হাজার তিনেক টাকা দিয়ে বড় বাংলা কাগজে টিউটোরিয়ালের নামে বিজ্ঞাপন ঝেড়ে দিলাম। রাস্তায় হাঁটা মুশকিল। সবাই ভর্তি হতে চায়। অ্যাডমিশন ফি নিয়ে বেছে বেছে ভর্তি করলাম। শ্লিপ দিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে হয়। দরজায় বেয়ারা বসালাম। তার আলাদা উর্দি। উর্দির বুক পকেটে লাল সুতোয় লেখা পি টি এইচ্। পার্থজ টিউটোরিয়াল হোম। দীপাকে একটা পুরুষালী হাতঘড়ি কিনে দিলাম।

তবু আমার কিছু ভাল লাগে না। আমি যথেষ্ট পরিমাণে গুডউইলের মালিক। ক্ষমতাসীন দলের ইলেকশন ফান্ডে চাঁদা দিয়েছি। একদিন রায়দিঘি রওনা দিলাম। আমি বৃত্তসাধক নই। আমার ভৈরবিনী নেই। কিন্তু মাসী তো আছে। নানা ক্রিয়ার সঙ্গিনী সে আমার। পাতালে সে আমার সঙ্গে এক সময় সমানে স্লিপ খেয়েছে। আমরা তখন বিবেকের কামড়ানি ছাড়াই নিত্য কাজে বসেছি। ফিক্সড্ ডিপোজিট আমাদের তৃপ্তি দিতো। যেমন কিনা জীবনের দাম বুঝতে না পেরে আজও আমি জমানো দুধের মত অবসর এনজয় করি টিউটোরিয়ালের শেষ ঘরে বসে। জানি এখন একটা ভারি চশমা আমার মুখকে এই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মানানসই করে তুলতে পারে।

মেসো ছিল গদিতে। মাসী বাড়িতে। নদীর পারে দোতলা বাড়ি। গোহাল—ফলের বাগান। নৌকো—মাছ ধরার জাল—এমন কি বেগার খাটার জন্যে দু' দুটি মা মরা ননদ। মাসী অনেক দিন পরে আমায় ফাঁকা বাড়িতে পেয়ে কাজে বসল। কোন অপরাধ বোধ তাকে স্পর্শ করে না দেখলাম। গায়ে অঢেল গয়না।

গদি থেকে ফিরে এসে মেসো আমার জন্যে বাড়ির পুকুরে জাল ফেলে পাকা রুই তুললো। ভাতের পাতে মুড়ো, ঝোলে বড় পেটি। বিকেলের বাসে যখন কলকাতা ফিরছি—তখন আমার পেটে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকার সুখাদ্য গজগজ করছে। ঘুমোচ্ছিলাম, জেগে যাচ্ছিলাম—পরিষ্কার মনে হচ্ছিল—এসবই অর্থহীন। যাকে এতদিন স্বস্তি সাফল্য নিরুদ্বেগ জীবন বলে জেনেছি—তা

আসলে এই ? এত সামান্য ! তাহলে আমি কেন দুটি শিশুকে অকাল প্রসবের মুখে ঠেলে দিয়ে সম্মান, যেমন চলছিল তেমন অবস্থা কিনলাম ? কিনে পরমায়ু পেলাম ?

পরদিন কো-এড্ ব্যাচের ধারি একটি মেয়ে বললো, সে নাকি একটি প্রাইমারি স্কুলের টিচার। তার কোচিংয়ের ফি দিতে পারছে না। আমি জানতাম এর পর কি হবে।

খোকন বললো, আর এগোস নে। মেয়েটা বাঁদর। দেখতেও বিচ্ছিরি। খারাপ জিনিসে তোর স্পেশাল ন্যাক চিরকালই। খোকন বেশি পড়াক বা না পড়াক—তাকে টিউটোরিয়াল থেকে থোক তিনশো টাকা দেওয়া হয় মাসে। ওর নামের পেছনে ইস্কুলের পরিচয়টা আমার কাজে লাগে। খোকনকে কিছু বললাম না।

কেন না, ও তখন মাসে মাসেই আমার ঘরে স্পেশাল কোচিং নিতে আসে। আমি একদিন ওকে বর্ধমানের সদর থানায় মালখানার সেই সব বাজেয়াপ্ত করা চটি বই পড়তে দিই। ও খুব মন দিয়ে পড়ে। তারপর হেসে আমার দিকে তাকায়। তখন ওকে আমার সবচেয়ে কুশ্রী লাগে। বড় হাঁ। খাঁদা নাক। পুরু ঠোঁট। মাথার চুল অবশ্য এক ঢাল। কিন্তু বেঁটে। হাত পা ছোট ছোট। কিন্তু শরীরটা একদম বিদ্যুৎ লাগানো পেশী দিয়ে তৈরি।

খুব তাড়াতাড়ি পেটে বাচ্চা এসে গেল মাধবীর। ও বললো, বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করবে। খোকন বললো, এ মেয়ে কেউ বিয়ে করে ? তোর কি মাথা খারাপ পার্থ ? সারা জীবন পস্তাবি বলে দিলাম।

ঘরে তখন আমাদের দু'জনের সামনে শুধু মাধবী বসেছিল ! সে বললো, কেন ? আমি কি এমন খারাপ মেয়ে। গ্র্যাজুয়েট হয়ে বি টি দিয়ে উঁচু স্কেলে চলে যাবো।

যেখানে ইচ্ছে হয় তুমি যাও। আমার বন্ধুকে ছাড়ো তো।

খোকনকে খুব কুশ্রীভাবে ভেঙ্গিয়ে উঠলো মাধবী। তারপর বললো, ফুর্তি মারার সময় মনে ছিল না ?

তোমার মত মেয়ের জন্যে নার্সিং হোম আছে।

খোকনের এ কথায় মাধবী হেসে ফেললো, এটাই ধরুন গিয়ে পর্থজ্ নার্সিং হোম ! স্পেশাল কোচিং পেয়েছি তো আমি !

খুব আস্তে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, আমি নার্সিং হোমে যাবো না।

খোকন আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকালো। আমি তখন মনে মনে বলছি, আরও একটি শিশুর কাছ থেকে আমি পরমায়ু কিনতে চাই না। বলে ফেললাম, নার্সিং হোমে গেলে বাচ্চা নিয়েই ফিরবে মাধবী।

আমার ভেতরটা খোকনের জানার কথা নয়। খোকন বেরিয়ে গেল।

মাধবীকে বললাম, তোমায় আমার ভাল লাগে না।

বিয়ে হয়ে গেলে দেখো—আস্তে আস্তে সয়ে যাবো তোমার চোখে। হয় তো একদিন আমাকে তোমার ভালোও লাগতে পারে।

কি ভাবে আত্মহত্যা করবে ভেবেছিলে?

আমার সিরিয়াস মুখের দিকে তাকিয়ে একটুও পাল্টালো না মাধবী। দিব্যি হেসে বললো, একসঙ্গে অনেকগুলো ঘুমের বড়ি খেয়ে।

তাতে তো বাচ্চাটা মারা যেতো।

বড় আবদার তো! কুমারী অবস্থায় আমি মা হবো। বাচ্চাটা বেঁচে থাকবে। তারপর আমি আত্মঘাতী হবো?

তাই-ই উচিত। বাচ্চার জন্যে ভেবো না। কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে পুরো-পুরি আমিই দেখাশোনা করবো। বড় হয়ে শুনবে মা নেই।

সিনেমা কোরো না। বাচ্চা রেখে আমি মরতে যাবো কোন্ দুঃখে? নিজের চেষ্টায় প্রাইমারি টিচার হয়েছি।

বাচ্চা হতে গিয়েও তো অনেক মা মারা যায়। যায় না?

সে যায় ডাক্তারের ভুলে। কিংবা—মাধবী থেমে গেল একটু। তারপর সোজা আমার চোখে তাকিয়ে বললো, কিংবা বাচ্চার বাবা যদি কলকাঠি নাড়ে। ওসব কথা আসছে কেন? আমি সিঁদুর কপালে ভালো নার্সিং হোমে যাবো। ফিরবো সুস্থ বাচ্চা কোলে নিয়ে।

আমি কোন কথা বললাম না। সামনের তিন ঘরে কোচিং চলছে। মাধবীও চুপ করে হাসি মুখে বসে। খোকন রাগে উঠে যাওয়ায় সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে। খেয়াল করে নি। ঠিক করলাম—মাধবীর বাবার হাতে মোটা টাকা দিয়ে বলবো মেয়েকে খালাস করুন। পরে আরও টাকা দেবো। ঝুটমুট ঝামেলা পাকাবেন না। ও মেয়ে আমার পক্ষে বিয়ে করা অসম্ভব।

ব্রজকালী দেব্যা রোডে মাধবীদের বাড়িটা খুঁজে বের করলাম। রাত দশটা তখন। অত রাতে মাধবী তো আমায় দেখে অবাক। ওর মুখ খুশীতে ঝকমক করে উঠলো। বাবাকে ডাকি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, ডাকো।—ও ভেবেছে আমি ওর বাবার কাছে প্রোপোজ করতে এসেছি। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই। একথা বলে ঢিপ ঢিপ করা বুক নিয়ে ওর বাবার মুখের দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকবো।

আমি এসেছি একটি টিউটোরিয়াল হোমের ভবিষ্যৎ ভেবে। আমার সুনামই পার্থজ টিউটোরিয়ালের গুড উইল। পঞ্চাশখানা একশো টাকার নোট আমার পকেটে। বাড়ির যা চেহারা—বুড়ো যা ভাঙাচোরা—তাতে পাঁচ হাজার টাকায় নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ারই কথা।

আমাদের কথার মাঝখানে বকুলতলার এই রাস্তায় লোড্‌শেডিং ঝুপঝুপ করে নামলো। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। দু'জনই বারান্দায় পাতা

তক্তায় বসে আছি।

বুড়ো বললো, আপনি বলে যান বাবা। আমি সব শুনতে পাচ্ছি।

আমি ভালো বাংলা কথা সাজিয়ে মনে মনে রিহার্সেল দিচ্ছিলাম। অন্ধকারটা এখানে বেশ সাহায্য করছে আমাকে। কারও চোখ দেখতে হচ্ছে না কাউকে। এটা একটা মস্ত সুবিধা। খোলা জানলায় ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। শিস্ ওঠা হেরিকেনের সামান্য আলোয় একটি বিচ্ছিরি দেখতে মেয়ে হাসি হাসি মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাধবীর পক্ষে আমার চোখ দেখতে পাওয়া এখন সম্ভব নয়।

আমি মনে মনে ঠিক এইভাবে সাজাচ্ছিলাম। বোঝেনই তো এটা অল্প বয়সের একটা ভুল। আমাদের দু'জনেরই মুহূর্তের একটা ভুল মাত্র।

মাধবীর বাবা পাল্টা কি বলতে পারে—তাও মনে মনে সাজাচ্ছিলাম। অনেকটা এরকম—কোন্ দু'জনের কথা বলছেন বাবা?

আমি আর মাধবী। আমার এখুনি বিয়ের কোন ইচ্ছে নেই—সবে টিউটোরিয়ালটা দাঁড়িয়েছে তো—

আপনার বিয়ের ইচ্ছে নেই—সে কথাটা এই রাত দশটায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলতে এসেছেন?

মনে মনে দু' তরফের কথা উতোর চাপানে সাজাচ্ছিলাম। বুড়ো তখন বললো, চুপ করে আছেন কেন বাবা? বলুন বাবা। যত কঠিন কথাই হোক—বলুন আমাকে—আমারই তো মেয়ে। ওরাই তো আমার পরমায়ু। আমি ওর বাবা। আমাকে শুনতে হবেই তো।

আমি ঝপ করে বলে ফেললাম, আমি মাধবীকে বিয়ে করতে চাই।

বুড়ো অন্ধকারেই খুশী হোল। গলার স্বরে যা বুঝলাম। বললো, এ তো খুব ভালো কথা। এমন সময় এলে যখন চাদ্দিকে অন্ধকার। আমি তোমার গুণের কথা অনেক শুনেছি।

আবার দু'জনে চুপচাপ বসে আছি। এ জায়গাটা আসলে কলকাতার বারান্দা। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে। কাছেই কোন নালা দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। ঢালের দিকে। জল যে শেষ অব্দি গড়িয়ে গিয়ে কোথায় দাঁড়ায় তাও আমি জানি না। জলের শব্দটা থেমে নেই। এইসব সময় ফ্লাইং ক্লাবের সারা মাঠের বাতাস আমার ফুসফুসে ঢুকে পড়ে ও দু'টোকে মেলায় কেনা বেলুন করে ফেলতে চায়। তখন ওপরের আকাশে তারা থাকে কিছু।

এক গেরস্থর তিন সংশয়

রোজ রাতে আলো নিভলেই খুটখাট শুরু হয়ে যায়। গরমে মশারি টানানো অসম্ভব। বীরেন আর রাধার মাথার কাছেই ফ্রিজ। তার ওপর উঁচুতে দেওয়ালে বীরেনের মা বাবার ছবি। পায়ের দিকে বুকর‍্যাক। র‍্যাকের মাথায় টেলিফোন। জলের জগ। উপুড় করে দাঁড় করানো গ্লাস। পাশের ঘরে বীরেনের ছোট ছেলে একা একা শোয়। শুকতারা পড়ে।

রাত পৌনে দুটোয় কারেন্ট চলে গেল। সেই সঙ্গে খুটখাট। কলকাতার একতলা ভাড়াবাড়ি। সামান্য চাঁদের আলো এসে ঢুকে পড়লো। বীরেন স্পষ্ট দেখতে পেল—একটি ধেড়ে ছুঁচো ফোনের রিসিভারের পাশে বসে দুই কুচি নীল চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সদ্য মধ্যবয়সী বীরেন। বড় ছেলেটির গোঁফ উঠেছে। আই আই টির হোস্টেলে থেকে পড়ে। খুব রাগে রাগেই উঠলো বীরেন। তারপর এক ধমকে ছুঁচোটাকে নীচে নামাতেই সে জানলার শিক গলে। ভেবেছিল—একটা লাঠি থাকলে। ঠিক পিঠের শিরদাঁড়ায়।

রাধার এক কাতে শোওয়া অভ্যেস। খাটের নিচের মশাগুলো ওর গায়ের রক্ত। তবু রাধা ওদিকেই। বীরেন চেঁচিয়ে উঠলো। কতদিন বলেছি—আলুর চপে কোন বিষ দিয়ে নর্দমার।

রাধা সে চিৎকারে ফিরেও। যেমন ঘুমোচ্ছিল—তেমনি।

যেদিন মাঝরাতে জেগে উঠেছে বীরেন—সেদিনই এই খুটখাট। কিংবা এই খুটখাট তাকে জাগিয়ে। একদিন তো বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগায়। দাঁত বসাচ্ছিল। জেগে গিয়ে বীরেন কোন ডিসটার্ব করেনি। চুপ করে অপেক্ষা। বেড সুইচ টিপে সে আস্তে রাধাকে। ওঠো। বোধ হয় সাপে—।

কী বলছো?

পায়ের দিকটায়।

দেখি। হ্যাঁ। এ যে রক্ত—

বীরেনও উঠে বসে দেখেছে। শেতল পাটির ওপর। দু ফোঁটা।

বাঙ্গুর হাসপাতালে টকসাইড ইঞ্জেকশন। ওরাই বলে দিল, পাস্তুরে ডাক্তার মোদকের কাছে গিয়ে। আর এক মাসের মাথায় আরেকটা টকসাইড। মনে করে দিয়ে যাবেন।

পাস্তুরে মোদক হেসে বললো' ইঁদুর নয়তো ছুঁচো। ডোমেসটিকেটেড্। কোন ভয় নেই। ওখানেই কথায় কথায় বীরেন জানলো, পাস্তুরে বছরে ১৮০০ ভালো জাতের ভেড়া জবাই হয়। রক্ত লাগে। চিকিৎসার জন্যে। বিজ্ঞানের জন্যে। বিশেষ করে জলাতঙ্কের।

বীরেনের তখনই মনে পড়লো। অনেকদিন আগে এক ঝড়ের বিকেলে দেখা। সিঁথি ছাড়িয়ে। রিকসা সাইকেল থেকে নেমে। ধুলোর ঝড়। একটা বেআক্কেল সাইজের ঢাউস গোহাল। গোটা সতেরো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। রোজ মোটা সিরিঞ্জে! সাকুল্যে আড়াই বালতি রক্ত। ভ্যানে উঠে। হুস্—

মশা। ইঁদুর। ছুঁচো। পাগল হয়ে গেলাম রাধা।

রাধা যেমন—তেমনই। ইদানীং বীরেনের একটা দৃঢ় সন্দেহ টোম্বল হয়ে। তার বিশ্বাস—তলপেট থেকে অনেক কিছুই নিচের দিকে আগের চেয়ে বেশি ঝুলে। তাই কি প্রায়ই পেচ্ছাপ চাপে? কে জানে? শরীর একটি সিনেমা হল। কোথায় কোন্ ফ্লাশ। অন্ধকার হয়ে গেলে টর্চ একটা খুব।

বীরেনদের বাথরুমের নালী পাতালের সঙ্গে। মাথার ওপর সাওয়ার। মাঝখানে আরেকটা কল। বীরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। খুট করে সুইচ টিপলো। সঙ্গে সঙ্গে আলোর খরখরে সব শুয়ো বীরেনের চোখে। আর অমনি কলকাতার পাতালের সঙ্গে সরাসরি যোগ—এই নালী বেয়ে পিল পিল করে—

আটচল্লিশ অব্দি গুনলো বীরেন। পেচ্ছাপ হয়ে গিয়েছিল। আরও একটা। মোট প্রায় পঞ্চাশ। ছোটবড় আরসোলা। এর ভেতর আবার একটা শাদা। এখনো দুটো আরসোলা নালীর মাথায় বসানো লোহার ঝাঁঝরির ফোকর দিয়ে পাতাল থেকে উঠে আসছে।

বীরেন দত্তগুপ্ত জানে—এই পাতাল আসলে কলকাতার পাতাল। যার ওপরের মলাট কলকাতার পিচরাস্তাগুলো। শ-দেড়েক—পোনে দু-শ বছর ধরে একটু একটু করে এই মলাট তৈরি হয়েছে। জব চার্ণকের তিনখানা গাঁ থেকে মহানগরী নামটা পেতে যা সময় নিয়েছে—এই পাতালেরও বয়স প্রায় তাই।

কলকাতা শুরু হয়েছিল কয়েকখানা চালাঘর নিয়ে। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া মাটির দাওয়ায় বসে দালালরা সুতো কিনতো। প্রথম পাকা বাড়ি কি রাইটার্স? সিমেন্ট তো অনেক পরে এসেছে। সিমেন্টের আগেই বড় ডাকঘর, ঢাউস রাইটার্স, রাজভবনের অনেকখানি। কোথায় যেন বীরেন পড়েছিল—বাগ্মী রামগোপাল ঘোষের আমলে কলকাতায় মেঠো রাস্তার দু'ধারে মাত্র আটশো পাকাবাড়ি গড়ে উঠেছিল। মেঠো ছাড়া কি! রাস্তায় পিচ পড়েছে তো বঙ্গভঙ্গের আমলে—এই তো সেদিন—হবে না রাজপথ। তখনকার জীর্ণ অট্টালিকাগুলোর (!) প্র-প্র-পিতামহ আসলে রামগোপাল, রামতনুদের বয়সী সেই সব পাকা বাড়ি—যাদের কিছু কিছু এখনো প্রেস, অ্যামপুল, বাঁধাইপাড়ার ড্যাম্পে ভিজে মোটা দেওয়াল দেখে বীরেন কখনো কখনো সনাক্ত করতে পেরেছে। চুন, ঘেষ, সুরকি দিয়ে গাঁথা। যখন আর কি লটারি করে টাউন-হল হচ্ছে। ময়লা দিয়ে পুকুর ভরাট জমিতে দাতব্য চিকিৎসালয় উঠছে। দু' বছর আগে ডালহৌসিতে সেন্ট্রাল ব্যাংক পুড়ে গেল। ওখানটায় তারই অফিসের অমূল্যদা নাকি নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানেও বেহারা সমেত ভুলি-

পালকি দেখেছে। অসম্ভব। কিংবা হলেও বা।

বীরেনের শরীরের গরমজল পেয়ে নালী থেকে আরও আরসোলা বেরিয়ে আসতে লাগলো। একটা জিনিস তার কাছে পরিষ্কার নয়। আমাদের এই একতলা ভাড়া বাড়ির নালীর সঙ্গে পাতালের কানেকশন কী ভাবে হয়েছে? নালীর মুখ থেকে এই বিশাল পাতালের বুকটা ঠিক কতদূরে? বর্ষায় কলকাতা ভাসলে—তাহলে কি পাতালের বুকটা ফুলে উঠে পিচরাস্তা আর একতলা বাড়ি-গুলো মেঝের মলাট উপচে বেরিয়ে পড়বে না?

বীরেনের এখন মোট পাঁচটা পাজামা আছে। সেই সঙ্গে পকেট লাগানো স্লিপিং শার্ট। একটার গায়ে লাল স্ট্রাইপ। ঘিয়ে রংয়ের পা জামার মোক্ষম জায়গা বসতে গিয়ে ফেটে যায়। সেখানে মেলানো রংয়ের কাপড়ের ডবল তাপ্পি। তাছাড়া আন্ডার-অয়ার দু'টো আনকোরা। তিনটের অবস্থা সঙ্গীন। স্যান্ডো গেঞ্জি দু'টোর ভালো অবস্থা। হাতাওয়ালা গেঞ্জি একটা। তাতে সুতো উঠে উঠে গোল সব গর্ত। গর্তে গর্তে বীরেনের গায়ের মাংস। বলা হয়নি। তার লুঙ্গি মোট দু'টি। একটি রঙীন। শক্ত। অন্যটি রং জ্বলে গিয়ে ম্যাটমেটে। গেরস্থ বীরেনের এই হোল গিয়ে মোটমাট অন্তর্বাস।

আরও কয়েকটা গুরুতর প্রশ্ন প্রায়ই বীরেনকে ভাবিয়ে তোলে। ভাবতে ভাবতে সে ঝিমিয়ে পড়ে। এত বড় প্রশ্ন। অথচ তার কতটুকুই বা সে জানতে পেরেছে। চান করতে গিয়ে সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সে ভেবেছে—নিশ্চয় ইংরেজি এস হরফের কায়দায় কোন মোটা নল দিয়ে কলকাতার পাতালের সঙ্গে আমাদের এই নালীর যোগ রাখা হয়েছে। যদি সে নল ইংরেজি আই হরফের কায়দায় হোত—তাহলে পাতালের বুকের যে কোন জোয়ার ঠেলে কলকাতার একতলায় ঢুকে পড়তো।

আলো নিভিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ির একমাত্র ফাঁকা বারান্দায় বসলো বীরেন। এ জায়গাটা এ-বাড়ির একমাত্র জায়গা– যেখান থেকে সরাসরি অক্সিজেনের সঙ্গে দেখা হয়। হয়তো বাড়িটার পশ্চিম একদম বন্ধ। উত্তরে বাড়ির পর বাড়ি। দক্ষিণেও তাই। গভীর রাতে এক একদিন ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করে দেখেছে বীরেন। তখন শুধু টিউবওয়েল জেগে থাকে। শুধু হ্যান্ডেল মেরে জল তোলার অপেক্ষা। নয়তো কলকাতার মলাটের ওপর বসানো এই লোকালয় অবিরাম ঘুমোয়। একটা ফাটা চটা রাস্তার গায়ে হাইড্রেন্টের পচা গন্ধে মাতোয়ারা সারি সারি জীর্ণ দশা বাড়ি লোকজন সুদ্ধ আচ্ছন্ন। এই হোল একটা মহানগরীর থিতানো আসল চেহারা। প্রায় তিনশো বছরের চেষ্টায়।

এ-বারান্দা থেকে দিনে রাতে সূর্যোদয়, চন্দ্রগ্রহণ—এমনকি চন্দ্রোদয়ও দেখা যায় সম্ভবত। তাছাড়া এক ধরনের তেরছা বাতাস নানান বাড়ির বাধা টপকে চলে আসে এখনো। বারান্দাটি লাল রঙের। চওড়ায় পাঁচফুট। লম্বা বত্রিশ

ফুট। শীতে রোদ পোহানো, শীলাবৃষ্টিতে শীল কুড়োনো—সবই চলে যায় এ বারান্দায়। কেরোসিন কাঠের একটা বেঞ্চ আছে। তাতে পাশাপাশি বসে কথা বলা যায়—সামনের দেওয়ালে কিংবা একটু উঁচুর আকাশে তাকিয়ে। বারন্দার নিচেই জমাদারের রাস্তা। একদিন বেঞ্চে বসে বীরেনকে কথা বলতে দেখে—রাধা বলেছিল—কি? ট্রেনের জন্যে বসে আছে!

অনেকটা সেইরকমই ভাবখানা বারন্দাটার। বীরেন হেসে বলেছিল—হ্যাঁ। ছ নম্বর প্ল্যাটফর্ম! এখুনি কল্যাণী লোকাল আসবে।

আজ কিন্তু হাসি পাচ্ছিল বীরেনের। বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বললো, ঘুমোচ্ছো কি করে? মশা কামড়াচ্ছে না?

এবারও রাধা কোন জবাব দিল না। বারান্দার লাগোয়া ঘরে ছোট ছেলে সাধন ঘুমোচ্ছিল। সে চেঁচিয়ে বললো, গোলমাল কোরো না বাবা। সারা পাড়া ঘুমোচ্ছে।

কেউ ঘুমোচ্ছে না। সবাই জেগে বসে আছো।

না। ডি সি তো যায়নি। তারা তো ঘুমোবে।

এ বাড়িতে শালা আমি থাকবো না। ছুঁচো। ইঁদুর। আরসোলা। মশা। গরম। তারপর ড্রেনের গন্ধ।

এবার রাধা উঠে এলো। ড্রেনে তো গন্ধ থাকতে পারে না।

গন্ধ পাচ্ছি আমি নাকে। নিশ্চয় ছাই দিয়ে বাসন মাজতে গিয়ে ওদিককার ঝাঁঝরি বন্ধ হয়ে গেছে। কতদিন বলেছি পাউডার ইউজ করো।

অসম্ভব। আমি নিজে জমাদার দিয়ে পরিষ্কার করিয়েছি পরশু। নগদ আট টাকা নিয়ে গেল।

তার চেয়ে পাউডার কি সস্তা পড়ে না।

মাঝরাতে চেঁচিও না গাঁক গাঁক করে।

একশোবার চেঁচাবো। কেন তুমি আলুর চপে বিষ দিয়ে ছুঁচোগুলোকে মারো নি?

আছে তো মোটে চারটে।

গুনলে কখন?

রাধা বললো, আমি জানি। ওরাই ডাস্টবিন থেকে আলুর খোসা টোসা টেনে নিয়ে গিয়ে পচিয়েছে নিশ্চয়। তার থেকেই গন্ধ বেরুচ্ছে নর্দমায়।

ঠিক আমার মাথার কাছে রাধা—পচা গন্ধ। নিঃশ্বাস নিলেই পাই। ঘুমোনো যায়?

দিব্যি ঘুমিয়েছো এতক্ষণ। ষাঁড়ের মত নাক ডাকছিলে—

রসিকতা ভালো লাগছে না। একটি চড় কষাবো।

তাতো কষাবেই। কেন?

স্প্রে করে আরসোলাগুলো মারোনি কেন? অফিসে যাও না। যেতে হয়

না। রান্নার লোক আছে। কয়েকটা কাজ তো করবে রাধা।

কম কাজ করি আমি? আমি তোমার বউকে বউ—পিওনকে পিওন।

তাই বুঝি। বীরেন তখনো রাধার শরীরের সে জায়গাটা বেছে দেখছিল মনে মনে—যেখানে একটা চড় কষালে রাধা খুব ব্যথা পাবে না—অথচ বুঝবে—সংসারে বিয়ে নামে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের পার্টনার হিসেবে তারও কিছু করার আছে। উপরন্তু এও বোঝা দরকার সময়েরটা সময়ে না করলে সে কাজের কোন দাম থাকে না। এই বিশ-বাইশ বছরে বীরেন দত্তগুপ্ত শ্রীমতী রাধা দত্তগুপ্তকে এ জিনিসটি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেনি।

তা নাতো কি? ব্যাংকে যাই। বাজার করি। ইলেকট্রিক বিল দিই আমি।

একজন চাকুরে মেয়েকে বেলা সাড়ে ন-টার ট্রামে কীভাবে উঠতে হয় দেখেছো?

তুমি ভীষণ খারাপ লোক।

তা তো বলবেই। আরসোলাগুলোকে মারোনি কেন?

মেরেছি ক-দিন আগে। ওরা এখন আর স্প্রে করলেও মরে না। দীনু বলেছিল, হস্টেল থেকে কী একটা নতুন ওষুধ নিয়ে আসবে। তাতে নাকি খুব মরে—

দীনু মানে দীনেশ। খড়্গপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ে। তার কথায় বীরেন আর রাধা দুজনই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই প্রথম ওদের বড় ছেলে বাড়ির বাইরে। মাস কয়েক হোল ভর্তি হয়েছে খড়্গপুরে। সেখানেও নিশ্চয় কারেন্ট চলে যাচ্ছে। তখন কী করে দীনু? অবিশ্যি নেটের মশারি দেওয়া হয়েছে। খোলামেলা জায়গা। বড় বড় জানলা। হয়তো এখন বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

রাধা এসে বীরেনের পাশে বসলো। বসে সাধনকে ডাকলো। এই সাধু। বাইরে এসে বোস। মশায় খেয়ে ফেলবে তোকে।

আমার ঘুম হয়নি। আমি উঠবো না।

গরমে পচবি কেন? বাইরে আয় বাবা।

বীরেনের এ ডাকেও সাধন বাইরে এলো না। বীরেন মনে মনে বললো, অবাধ্য।

রাধা আর বীরেন নিজেদের মধ্যে কোন কথা শুরু করতে পারছিল না। বীরেনের মনে পড়লো, তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল গরমকালে। রাস্তার ওপর এক দোতলায়। মোটা ফুলের মালার পাপড়িগুলো গরমে ঘেমে উঠেছিল। রাধার গায়ে রকমারি সুগন্ধী তখন। পালঙ্কের ছত্রীতে তখনো বন্ধুদের রজনীগন্ধার স্টিক লটকানো। ঝকঝকে আলো নিবলেই পিঁপড়েরা সার দিয়ে বেরিয়ে পড়বে। ওরা কী অনায়াসে ফুলের বুকে ঢুকে যায়। গন্ধ মাখানো

মিষ্টি রেণু মুখে নিয়ে ফেরে। পথে মানুষ পড়লে সার দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে কামড়ায়। সে রাতেও রাধা মোট তিনটি কথা বলেছিল। তার ভেতর দুটো ছিল এইরকম।

বীরেন বলেছিল, আলো নিভিয়ে দি?

হ্যাঁ।

গরম লাগছে? পাখা পাঁচে আছে—

না।

তোমার নাম কি? বলেও মনে পড়েছিল বীরেনের বিয়ের কার্ডে নাম থাকলেও সব স্বামী একথা জানতে চায়।

রাধা।

সেই রাধা গত বিশ বাইশ বছরে বিশেষ কথা বলে নি! যা দু-চারখানা বলে—তা এখনই বলে। সব কথা স্পষ্ট। নিখুঁত উচ্চারণ। কোনদিন তার সামনে হাঁ করে ভাত খায়নি। হাঁ করে ঘুমোয়নি। নিয়মিত তেল সাবান মাখে। খুব গোপনে উত্তমকুমারকে ভালোবাসে।

রাধা বললো, চলো না কোথাও বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে?

সে তুমি ঠিক কর।

হিল স্টেশন খুব কস্টলি!

আমি কিছু টাকা দেব।

দীনুর সেমিস্টারে নশো টাকা দিতে হবে একসঙ্গে। মনে আছে?

তোমার ছেলে। সে টাকা তুমি দেবে।

তোমারও ছেলে রাধা।

একশোবার। কিন্তু এ টাকাতো আমার জমানো।

তুমি কি আয় করো রাধা?

বাঃ! আমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটি না এ সংসারের জন্যে?

সে তো আমিও খাটি রাধা।

সে তো একটু অফিসে যাও!

ওই একটুই তো কতখানি মাথার কাজ—তুমি তো খোঁজ রাখো না। কোন টাকারই অপচয় ভাল নয়। হাতের কাজকর্ম শেষ হোক—তখন অফিসের লিভ ট্রাভেলের টাকা তুলে বেড়াতে যাবো।

তা আর হয়েছে। কোনদিনই তোমার অফিসের কাজ শেষ হবে না। তুমি আসলে একজন অত্যন্ত খারাপ লোক।

কাজ ফেলে রেখে আমি আনন্দ করতে পারিনে—

আনন্দ করতে তুমি জানলে তো।

সব মেনে নিচ্ছি রাধা। কিন্তু আমি কোথাও রাশ আলগা করিনি বলেই

তো আজ আমাদের ছেলে জিওফিজিকসে ভর্তি হতে পেরেছে। তার খরচ আমরা চালাতে পারছি।

এই সব ভেবে ভেবে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।

আমি জন্মে অব্দি টনটনে আছি রাধা। চলো হেঁটে আসি। এখন বাইরের বাতাস চোখে লাগলে আরাম পাবে।

এত রাতে?

রাত ফুরিয়ে আসছে এবার। চলো ভিক্টোরিয়ায় যাই। ওদিকটা কলকাতা বলে মনেই হয় না আমার।

খালি হাতে যাবো কিন্তু। হারটাও তুলে রেখে যাচ্ছি। তুমিও ঘড়ি নেবে না সঙ্গে।

বেশ তো। কিন্তু অত চিন্তার কিছু নেই। গরমে ফুটপাতে সবাই জেগে।

বীরেন দত্তগুপ্ত মর্নিং ওয়াকের কেডস পরে নিয়ে হাফপ্যান্ট পরতে যাচ্ছিল। রাধা বেঁকে বসলো। ওটা পরলে তোমার সঙ্গে আমি যাবো না।

বেশতো। ধুতি পরছি মালকোছা দিয়ে। হাফশার্ট।

রাস্তার মাথার ওপর আকাশ তখনো অন্ধকার। কাগজের ভ্যানের আশায় মোড়ে মোড়ে হকারদের জটলা। ভিক্টোরিয়ার ভেতর পেঁছে দেখলো, গাছগুলো সব বুড়ো হয়ে গেছে। এরাই আগে কত তেল চুকচুকে দেখতে ছিল। ডালপালা নিয়ে বাতাসের সঙ্গে কত হুটোপুটি। গাছের বাকল এখন ফাটা ফাটা। আলো পরিষ্কার হচ্ছিল। রাধা তোমার সঙ্গে প্রায় তেইশ বছর পরে এলাম এখানে।

যাক। আর সাল সন মুখস্ত বলতে হবে না

আমরা খুলনা জেলা স্কুলের ছেলে। আমাদের সব মুখস্ত থাকে। একশো তিরিশ পাতার ভূগোল বইটা এই সেদিনও আমার মুখস্ত ছিল।

ভোরবেলার বাতাসে ওরা দুজন অনেকদিন পরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আবছা অন্ধকারে প্রায় চল্লিশজনের এক ফৌজ জ্যামিতির ত্রিভুজ চতুর্ভুজ হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। খানিক দূরে কয়েকটি ঘর্মাক্ত ঘোড়া। সবুজ ঘাস আলোর সঙ্গে সঙ্গে আরও সবুজ হয়ে ধরা দিচ্ছিল। তোমাদের খুলনা জেলা স্কুলকে তুমি ভুলতে পারো না?

শুধু শুধু ভুলবো কেন? ওয়ার্ল্ডের বেস্ট স্কুল।

ইটন? হ্যারো?

দেখিনি। নাম শুনেছি। কিন্তু ওদের কি দুটো নদী আছে রাধা? আমাদের স্কুলের একদিকে ভৈরব। আরেকদিকে রূপসা। এই রূপসার গায়েই হস্টেল। বৃষ্টির দিন জানালা দিয়ে দেখা যেত—চাষীরা উবু হয়ে ধান পুঁতছে।

আর খুলনা?

মস্কো দেখিনি। লন্ডন দেখিনি। কিন্তু খুলনার মত এত সুন্দর মাটির

রাস্তা বোধহয় কারও নেই। শহরের শেষদিকে মাটির রাস্তা ঘাসে ঢাকা পড়ে যেতো তবু রাস্তা এগিয়ে গিয়ে শেষমেশ বকুলতলায় হারিয়ে যায়। আরেকটা ঘেঁষের রাস্তা আঃ।

চুপ করো। তোমার বড্ড আদিখ্যেতা। কী থাকতে পারে একটা রাস্তায়?

বীরেন অবাক হয়ে রাধার মুখে তাকালো। গালে কোথাও কোন দাগ পড়েনি। কনুই আগে ভাগে কালো হয়নি। আর কবে হবে? শাড়ির পাড় সুতোর ফুল তোলা কাজে ভর্তি। রাধার মাথার পেছনেই স্মৃতিসৌধের ওপরে শাদাটে পাথরের সেই আধখানা বিখ্যাত ধাপ। আগাগোড়া এখন ভোর। রাধার চোখ পুরো ঘুমের আরামে টস টসে।

একটা রাস্তায় অনেক কিছু থাকে।

ফেলে এসেছো তো সেই তিরিশ বত্রিশ বছর আগে।

সেই তখনটা কিন্তু আমার জন্যে চোখের সামনে থমকে থেমে আছে। নদী শহর ছাড়িয়ে গিয়ে একটা শিবমন্দিরের সামনে ভীষণ চওড়া হয়ে গেল—

এখন তো সেখানে চড়া পড়তে পারে।

পারে। কিন্তু আমার দেখা নদীতে তো পড়েনি রাধা। শিববাড়ির মাথায় একটা অশথ চারা।

তার মানে সে মন্দিরে পুজো হয় না।

হয়তো হয় না। আমি তো বাইরে থেকে দেখেছি। আরও এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধের সময় তৈরি রুজভেল্ট জেটি। বড় স্টিমার ভিড়তো।

আমার পায়ে বোধহয় আরসোলা চেটেছে।

কোথায়?

পায়ের পাতার তলার দিকে। আঙ্গুলের ফাঁকে।

বাড়ি ফিরে বেশি করে চুন দিও কিন্তু রাধা।

তাই হাঁটতে গিয়ে চুলকোচ্ছে—। এসো বসি এখানটায়।

বহুকাল পরে ওরা পাশাপাশি কোন মাঠে বসলো। পায়ের নিচে পাতি ঘাস। ছোট পিঁপড়ে সেই সব ঘাসকে গাছ জ্ঞানে চড়াই উৎরাই ভাঙছে। বীরেন লুকিয়ে দেখলো, রাধার পিঠের খাঁজ এখনো চোখ টানে। দীনু ঠিক ঠিক মত পাশ দিয়ে চাকরিতে বসলে রাধার ছেলের বউ আসতে আর মোটে পাঁচ-ছ বছর। ততদিন যদি ও রকম থাকে—তাহলে আর কি চাওয়ার আছে আমার জীবনে। একথা ভাবতে গিয়ে পাশেই ক্যাসিয়া গাছটার গুঁড়িতে চোখ পড়লো বীরেনের।

শেকড়গুলো বুড়ো মানুষের হাতের আঙ্গুল। একটা শুকনো ডালকুটি পড়েছিল। সেটা নিয়ে শেকড়ের ভেতর খোঁচাতেই ধুলো ধুলো মাটি বেরিয়ে এলো অনেকটা। এসব গাছের যত্ন নেই কোন।

বীরেনের একথায় রাধা বললো, অনেকদিনের গাছ। কি আর যত্ন করবে!

এখন তো ওর হয়ে আসার সময়।

কি বলছো রাধা? গাছেদের বয়স তুমি জানো? বলতে বলতে বীরেন সেই ডালকুটি দিয়ে খোঁচাতেই গাছের গোড়া থেকে পিল পিল করে উইপোকা বেরিয়ে এলো। সকালের পরিষ্কার আলোয় বীরেনের মনে হচ্ছিল—সব কটা উইপোকার পেটে পিঠে পুঁজ জমেছে। টিপলেই পুট করে গায়ে ছিটে এসে লাগবে। এ পুঁজ আসলে ক্যাসিয়া গাছটার গা থেকে শুষে খাওয়া রক্ত। কিংবা রস।

রাধা বললো, গাছটার বয়স হয়েছে নিশ্চয়। পাতাগুলো কেমন চিমসে মার্কা।

আসলে উইপোকার জন্যে এ-দশা। উইপোকাগুলোকে যদি মেরে দিতো গভমেন্ট।

গভমেন্ট পোকা মারে নাকি।

গভমেন্ট মানে সরকারী লোক। এ বাগানের মালি কিংবা তার চেয়ে উঁচু কেউ—

রাধা জোর দিয়ে বললো, তারাও পারবে না। আমার বাবাকে দেখেছি—সাত হাত গর্ত করে উইপোকাদের ডেরায় রাণী পোকাটাকে ধরতে। মশালের আগুনে সারা ডেরা পুড়িয়ে তবে রাণী পোকা সাবাড়।

আর উই ধরেছে?

নাঃ! ওই রাণী পোকাকে যদি সাবাড় করা যায়—তবে 'ওদের হাত থেকে বাঁচলে।—নইলে নয়।

এইদিনই দুপুরে বীরেন দত্তগুপ্তকে তিনটে ছারপোকা মিলে অতিষ্ঠ করে তুললো। আগেকার ক্যাবিনেট টেবিলের ফাঁকে একজোড়া মাতব্বর গোছের ছারপোকা বীরেনের কনুই, হাত—সব কামড়ে ফুটো করে ফেলল। অতিষ্ঠ হয়ে বীরেন একটা আলপিন টেবিলের ফাঁকে ভরে দিয়ে ওদের খুঁজতে লাগলো। কিন্তু নাগাল পেল না। একসময় ইচ্ছে হোল—টেবিলটাতেই আগুন লাগিয়ে দেয়।

যে চেয়ারে বসেছিল—তার হাতলেও ওই একই অবস্থা। একটি অত্যন্ত ধুরন্ধর ছারপোকা বীরেনের ট্রাউজারের সেলাইয়ের খোলা জোড় দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে এমন বেমক্কা জায়গায় কামড়াতে লাগলো—পেছনে হাত পাঠিয়ে চুলকেও কুল পেল না বীরেন। কোত্থেকে? কোনদিক থেকে?

অফিসে এখন কাজও বেশি। পুরনো ঠিকেদারী প্রতিষ্ঠান। কোথাও এরা ব্রিজ ধরে। কোথাও কালভার্ট। জলের ট্যাংক। নয়তো লেডিজ পার্ক। অনেক কিছুই এরা বানাচ্ছে। বানিয়ে আসছে। এখন কলকাতার আন্ডার গ্রাউন্ড নিয়ে এরা মজে আছে। নন্দন রোডে বর্ষায় জল জমে। উঁচু করো। জলের লাইন তুবড়ে গেছে। ঠিক করো। করে দিচ্ছি স্যার। সুয়ারেজ

লিক করছে। ঠিক করে ফেলেছি স্যার। এই ঠিক করা মানে ড্রাফটসম্যান—হিউম পাইপ—রাস্তা খোঁড়া—আবার বোজানো। নড়তে চড়তে পয়সা।

একদিন সাইটে যেতে হয়েছিল বীরেনকে। কাস্টিং কোম্পানীর লোকজন বাহাত্তর ইঞ্চির জায়গায় ষাট ইঞ্চি পাইপ দিয়েই কাজ সেরে দিচ্ছিল। সেটা ধরা পড়ায় সব কাজের ওপর চেক রাখতে হচ্ছে। ঠিকেদারীর একটু এদিক ওদিক হলেই বিল ক্যানসেল।

মে মাসের রোদ চারিদিক পুড়িয়ে দিচ্ছিল। দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের পাশেই মেডিক্যাল কলেজ। মাঝের রাস্তাটায় ছায়া। সেটা খোঁড়া হয়েছে। লোহার পাইপ। এঁটেল মাটি। হলুদ-কালচে। এই হোল গিয়ে কলকাতার বুকের ভেতরটা। বাইরে এমন করে ফুটপাথ বাড়ি পিচ রাস্তা দিয়ে ঢাকা যে ওপর থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই।

বীরেন ছায়া ঢাকা পিচ রাস্তায় দাঁড়িয়েও গরমের হলকা থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। তাই কলকাতার বুকে খানিকটা নামলো। ধাপ কেটে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। পাইপের পর পাইপ। ঠিকেদারীর মিস্ত্রিদের সঙ্গে আরও খানিকটা নিচে নেমে সুয়ারেজ লাইন দেখতে লাগলো।

এ গাঁথুনী কতদিনকার ?

ধাঙড় এসে অনেক আগে থেকেই পাইপের মুখ আরেক পাইপে জুড়ে দেওয়ায় এদিকটায় কোন দুর্গন্ধ নেই। তবু কী একটা চাপা শুকনো গন্ধ—কলকাতার নিচের বাতাসে। এই পাতালে কোন জিনিস কাঁপে না। কেননা এখানে বাতাস ওঠে না। সবই শান্ত স্থির। পিচরাস্তার মলাটখানার ওপারের জিনিস-পত্তরের কথা ভেবেই যেন এখানে সব দাঁতে দাঁত চেপে সর্বক্ষণ গুম হয়ে থাকে। সেদিনই প্রথম জানতে পারে বীরেন—আসলে কলকাতার নিচের পাতালটায় কোন থই থই ব্যাপার নেই। সবটাই জটিল পাইপের জটলা। এঁটেল মাটি মাখানো। পাইপগুলোর নিচে শিরতোলা পেনসিলের কায়দায় আগেকার নালী। দুখানা দুখানা ইঁটের জোড় ত্রিভুজ ধাঁচে চুনসুরকির মশলায় জোড়া।

এজায়গাটা রাস্তা থেকে তিন মানুষ নিচে। বীরেনদের কোম্পানীর ওভারসীয়ার বাবু ছজন মিস্ত্রি নিয়ে মাপামাপি করছিল। বীরেন সাহস করে বললো, এটাই কি আদি নালা ?

ওভারসিয়ার চোখ তুলে তাকালো। হ্যাঁ স্যার। দেখুন—কতদিন ধরে টিকে আছে। তখন তো আর হিউমপাইপ বেরোয়নি।

রাস্তার এত নিচে বসালো কি করে ?

তখন তো কলকাতা এত উঁচু ছিল না। আস্তে আস্তে এই শ-দেড়েক বছরে উঁচু হয়েছে। দেখুন না গাঁথুনীর ধাপগুলো ! এগিয়ে যান—

ভেঙে পড়বে না তো ?

না স্যার। মাথার ওপর দিয়ে লরি যাচ্ছে তো।

বীরেন বললো, কেঁপেও উঠছে তো।

তা কাঁপছে। কলকাতার ভিতের মাটি তো কিছু নরম। এগিয়ে যান।

বীরেন বেশিদূর যেতে পারলো না। শালবল্লার ঠেকোর নিচে দাঁড়িয়ে দম নিয়েই বীরেন এগোলো। প্রথমে চোখের পাতা টেনে দেওয়া অন্ধকার। তারপরই একটু ফিকে হয়ে অন্ধকার কেটে গেল। চাপা ভ্যাপসা গন্ধ। এঁটেল মাটির শীত। কত পুরনো মাটি। পৃথিবীর ভেতরকার শীত। আচমকা মাথার ওপর তাকাতেই বীরেন থমকে গেল।

কলকাতার মলাট—পিচ রাস্তা, ফুটপাথ।

তার উল্টোদিকেই—কলকাতার এই ঢাকনার গায়ে—যতদূর চোখ যায়—শুধু পোকা—শুধু পোকা। আর এগোতে ভরসা হল না বীরেনের। এগুলো কি?

ভয় পাবেন না। ওরাও আছে।

এত পোকা?

আরও ভেতরে যান না। কত দেখবেন।

বীরেন আর এগোতে পারলো না। কয়েকশো কোটি পোকা। কলকাতার মলাটের এ-পিঠে বুক লাগিয়ে থমথমে অবস্থায় ঝুলে আছে। সারা কলকাতার নিচে এই অবস্থা?

হাঃ হাঃ করে হাসলো ওভারসিয়ার। এতে যে হাসির কি আছে বুঝতে পারলো না বীরেন। তার শীত করছিল। কতকালের চাপা মাটি। বাইরের বাতাস পায় না।

এক এক জায়গায় এক এক রকমের পোকা। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের নিচের পোকাগুলো সাইজে সবচেয়ে বড়। এরকম পোকা পৃথিবীর কোথাও নাকি নেই! কিছু দেখা গেছে সানফ্রান্সিসকোর পাতালে।

আপনি জানলেন কি করে?

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহেবরা এসেছিল। তারা বলাবলি করছিল। আপনি শ্যামবাজারের পাতালে পোকাগুলো দেখেননি তো?

কি করে দেখবো। এই তো প্রথম কলকাতার নিচে এলাম।

তাই বলুন। ওখানকার পোকাগুলো শুঁড়ওয়ালা। কামড়ালে রক্ষে নেই। একটা আরেকটার পিঠে চড়ে বসে থাকে।

কি করে কাজ করেন আপনারা?

আগে পেট্রল স্প্রে করে জায়গাটায় আগুন লাগাই।

আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে।

কলকাতার নীচে তো রবার বা কাঠ নেই। আগুনে পুড়ে পোকাগুলো একদম আলকাতরা হয়ে যায়। লেই লেই। বিকট গন্ধ।

কি করেন ?

এঁটেল মাটি চাপা দিয়ে রাখি। কাজ করতে হবে তো। সারা কলকাতা জুড়েই তো পোকা। কতকাল আছে ওরা—

মরে না ?

অমর তো নয়। তবে ওদের বংশতালিকা কে রাখবে বলুন ? আর কখন মারা যায়—জানাও তো যায় না। টুপটাপ খসে পড়ে। ওরা তো অবিরাম চেহারা পাল্টাচ্ছে। আমার ছাব্বিশ বছরের চাকরিতে কতবার পোকাদের চেহারা-শরীর বদলাতে দেখলাম স্যার। খুব ওয়াইজ প্রাণী। নিজের মৃত্যুর আগে কয়েক কোটি পোকার ডিম পেড়ে রাখে সাবধানে। অন্য একটা পোকা মেরে এনে ডিমে ঢাকা দেয়। পরে অন্য পোকা দেখতে পেয়ে ডিম খেয়ে ফেলে। তাজব বাৎসল্য স্যার। মেরে আনা পোকার গা থেকে গরম পায় ডিমগুলো। তারপর ডিমফুটে ছা বেরিয়ে এসে মরা পোকাটা দিয়ে ডিনার লাঞ্চ সেরেই চরতে বেরিয়ে পড়ে। এই তো বংশধারা স্যার। পোকা তো। হ্যাবিট যাবে কোথায় ?

আমরা তো শুধু আরসোলা দেখতে পাই ওপরে।

আরসোলাই শুধু কলকাতায় যায়। এরা যায় না।

এরা গেলে তো কেলেঙ্কারি হয়ে যেতো।

ওকথা বললেন কেন স্যার ?

দেখুন শুধু আরসোলার জন্যেই স্প্রে বেরিয়েছে। সেদিন পড়ছিলাম—কতশো কোটি ডলার খরচ করে আরসোলা কাবু করার ওষুধ বের করেছে সায়ান্টিস্টরা। এত জাতের এত পোকা সব যদি কলকাতা রওনা হয় তো আমরা ফতুর হয়ে যাবো ওভারসিয়ারবাবু। সব টাকা পয়সা পোকায় চলে যাবে। আমরা খাবো কি তখন ?

ওভারসিয়ার আবার সেই খ্যা খ্যা হাসি হাসলো। নিজেই থামলো। কলকাতার নিচে এ জায়গাটা অন্ধকর। মাথার ওপর একদিকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। আরেকদিকে মেডিক্যাল কলেজ। জ্ঞান আর সেবার দুটি পিঠ।

ওভারসিয়ার বললো, তখন আমরা পোকা খাবো। পোকার ডালনা। পোকার ঝোল।

মানুষ তো মরে যাবে ওভারসিয়ারবাবু।

মরবে কেন ? এত প্রোটিন।

এ ত বিষ ওভারসিয়ারবাবু ?

মানুষ ইমিউন হয়ে যাবে। বলেই কলকাতার ঝাপসা পাতালে ওভারসিয়ার আবার হাসলো। সেই খ্যা খ্যা। লোকটা কি পাতালেই থাকে।

আপনি ভাবছেন কেন স্যার। এত পোকা যদি কলকাতায় যায় তো কোন

স্প্রে লাগবে না।

কেন? কেন?

কলকাতাতেই চাপা পড়ে যাবে।

কি বললেন?

হ্যাঁ স্যার। এদের যা অকসিজেন দরকার—এরা যদি বাতাস থেকে টেনে নেয় তো—আপনার আমার অকসিজেনে টান পড়বে। আমরা অজ্ঞান হয়ে যাবো। ওরা তখন আমাদের শরীরের ওপর গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে।

বীরেনের শরীরটা ভেতর থেকে কেঁপে গেল। নিঃশ্বাস টানতেও বুকে যেন ব্যথা লাগছে। তবে কি অকসিজেনে টান পড়লো? সারা কলকাতা তার জিনিসপত্তর নিয়ে খোলা পড়ে থাকবে। গেরস্থ বাড়ির ভেতর মা বাবা ভাইবোন—সবাই এলোমেলো পড়ে আছে। তাদের গা-গতর সব শুঁড়ওয়ালা পোকায় ঢেকে গেছে। শেয়ালদায় লোকাল ট্রেনগুলো পাকায় থিক থিক করছে। অফিস কাছারির খাতাপত্র খোলা। একটা খৈতান পাখা শুধু খোলা ছিল। তার নিচের টেবিলটায় শুধু পোকাগুলো বসতে পারেনি। দিল্লির হটলাইনে টেলিফোন বাজছে। চিফ মিনিস্টারের ঘরে। রিসিভার তোলার কোন লোক নেই।

বীরেন একলাফে ওপরে উঠে এসে হাঁপাতে লাগলো।

নিচের থেকে ওভারসিয়ার বললো, চললেন স্যার—

আফসে না ফিরে বাড়ি ফিরলো বীরেন দত্তগুপ্ত। এই বীরেনের জীবনটি মোটামুটি গোছালো। সে ইটালিয়ান নেটের মশারিতে শোয়। পানপরাগ দিয়ে পান খায়—দুবেলা খাওয়া দাওয়ার পর। ছেলেকে চিঠির গোড়ার অ্যাড্রেস করে—মাই ডিয়ার সন। নিয়মিত দাড়ি কামায় ও নখ কাটে। ছোট ছেলের ইস্কুলের মাইনে সাধারণত মাসের গোড়াতেই দিয়ে দেয়।

অসময়ে বাড়ি ফিরে আসায় রাধা অবাক হোল। ছুটি হয়ে গেল?

নাঃ। চলে এলাম। আজ খুব ফুলকপির তরকারি খেতে ইচ্ছে করছে রাধা।

এখন কোথায় ফুলকপি পাবে? সে উঠতে উঠতে এখনো চার পাঁচ মাস।

রাঁচির কপি নাকি আগে আগে ওঠে। চল না নিউমার্কেটে গিয়ে দেখি।

এত ইচ্ছে হচ্ছে? চলো যাই। সাধন ঘুমোচ্ছে—

স্কুলে যায়নি?

বুকে একটা চোট পেয়েছে খেলতে গিয়ে। তাই স্কুলে যেতে দিইনি। রেস্টে থাকুক তিনদিন। ব্যথাটা কমে যাবে।

সিরিয়াস কিছু?

বলা তো যায় না। সাবধান হচ্ছি তাই।

বীরেন একবার উঁকি দিয়ে দেখলো। স্কুলে না গিয়ে তেরো চোদ্দ বছরের

একটা শরীর শুয়ে আছে। কপালের নীল শিরা জেগে উঠেছে। এই শরীরও অক্সিজেনের টান পড়লে আচমকাই স্কুলের মাঠে এলোমেলো পড়ে থাকতে পারে। তখন পোকারা হেঁটে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে ওর গায়ের ওপর।

বীরেন দত্তগুপ্ত সাধনের গায়ের ওপর দিয়ে আস্তে হাত বোলাতে গেল। জেগে গিয়ে সাধন পটাং করে উঠে বসলো। করছো কি বাবা? ঘুমোতেও দেবে না?

ঘুমো। ঘুমো। শুয়ে পড়।

শুয়েই তো ছিলাম।

কোন জায়গাটায় ব্যথা তোর?

ওপর থেকে বোঝা যায় না। হঠাৎ খচ করে ওঠে।

কোন গর্তেটর্তে নেমেছিলি?

তা নামতে যাবো কেন? তুমি তো আচ্ছা লোক বাবা?

বীরেন তার এই বংশধরের মুখে সোজাসুজি তাকাতে পারলো না। সরে এলো।

মার্কেটে এখনো অসময়ে কপি আসেনি। এলেও পাওয়া যাবে না। চীনে হোটেলগুলোর দাদন দেওয়া আছে। এক দোকানী বললো ধাপা মাঠবাজারে এক ব্যাপারী অসময়ে কপি আনে। নিজ চাষের। লোকটার নাম জয়হিন্দ দলুই। ওর ভায়রা ভাই স্বাধীন মজুন্দার। ওরা দু'জনায় অসময়ের কপি নিয়ে বসে। চলে যান।

ধাপা চেনো?

বীরেন বললো, কোনদিন যাইনি। যাবে?

এই গরমে?

বিকেলে ভালো লাগবে। রোদ তো পড়ে আসছে।

সত্যিই তাই। পড়তি রোদ। ঘেঁষফেলা রাস্তায় লম্বা লম্বা ছায়া। প্রথমেই রেল লাইন। তারই গায়ে মাঠবাজার। দেওয়াল ঘেরা এই বাজারের গেটে লাহাদের দারোয়ান তোলা আদায় করছিল বসে বসে। তাই তো দেখল বীরেন। লোকেও বললো তাই।

কি গন্ধরে বাবা এখানে।

নাকে কাপড় দিও না রাধা। তাহলে পাবলিক তাকাবে।

রেখে দাও তোমার পাবলিক। বোটকা গন্ধ। এত নোলা কেন তোমার? টং টং করে আমরা ধাপার বাজারে কপির খোঁজে এসেছি শুনলে লোকে কি বলবে?

তুমি গোড়ায় না বললে তো রাধা আমি আসতাম না।

আমি ভেবেছিলাম—মার্কেটে পেয়ে যাবো। মাঠবাজারেও কপি পাওয়া গেল না। একজন ব্যাপারী বললো, রেল লাইন ধরে সিধে চলে যান। বাঁ

হাতে ধুধুলের ক্ষেত পড়বে। মাইলটাক রাস্তা। তারপরেই জয়হিন্দ দলুইয়ের ক্ষেত। ওখানে যেন এক টেরে কয়েক লাইন ফুলকপি দেখেছিলাম—

পড়তি বিকেলে ঠাণ্ডা বাতাস ছিল। ছিল ছায়া। ওরা দু'জনে রেল-লাইন ধরে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সামনে ভরা বর্ষায় জমা জল। অথচ এখনো তো বর্ষা আসেনি। সেই জলে ঢেউ। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে হোগলার দল। দুলছে তো দুলছেই। তাদের ভেতর দিয়ে উঁচু ডাঙায় বসানো রেল লাইন ধরে ইঞ্জিন যাচ্ছে। খান ছ' সাত ওয়াগন। বাতাসের থাবড়ায় ইঞ্জিনের ধোঁয়া চেপ্টে গিয়ে উল্টো দিকে শিখা হয়ে আছে।

এক ব্যাপারী ডালা বোঝাই লাউ নিয়ে ফিরছিল।

এ কোথাকার ট্রেন ভাই?

এ তো ধাপা লাইন।

কোথায় যাচ্ছে গাড়ি?

দূরে দূরে ময়লা ফেলে আবার ফিরে আসে। আগে দ্যাখোনি?

ময়লা ফেলতে ট্রেন লাইন?

তুমি কোথাকার লোক বাপু? এ তো একশো বছরের লাইন। যেখানে দাঁড়িয়ে আছো—এ তো ময়লা ভরাটি জায়গা।

এত ময়লা? কোথাকার?

কলকেতার। সব তো ডোবা ছেল। ময়লায় ভরে ভরে ডাঙা এখন।

এ জল গত সনের বর্ষার। এই জলের তো শেষ নাই। ময়লায় ভরে গিয়ে জল পিছিয়ে যাচ্ছে।

শুধু জল?

হ্যাঁ গো বাবু। গু মুতের জল নয়। সে তো ওই টাংকিতে সাফ হয়।

লোকটা চলে যেতে ডান দিকে তাকিয়ে ট্যাংক পেল বীরেন। অ্যালু-মিনিয়ম রঙয়ের। লোহার সিঁড়ি। দেখলে মনে হবে—কোন ইলেকট্রিক তৈরীর কারখানা।

রাধা থেমে পড়লো। আর যাবে?

এসেছি যখন দেখে যাই। একথা বলতে বলতে বীরেন ভাবছিল—তাহলে কলকাতার জন্যে কতদিন ধরে পাঁয়তারা করা হচ্ছে? ময়লার জন্যে রেল লাইন। পাতালে পাইপ আর নালীর জট। তারপর কারখানা সাইজের দুই ট্যাংক। এ লাইন ধরে একশ বছর ময়লা ফেলা চলছে। একদিন তো এ শহরের ময়লা ফেলতে ফেলতে রেল লাইন শেষে সুন্দরবন পেঁাছে যাবে। ডোবা, খানাখন্দ —সব ডাঙা হয়ে যাবে শেষে। আমাদের কত ময়লা? জীবনটা একটু সুখের করতে—একটু স্বস্তির করতে এত এত আয়োজন—ব্যবস্থা? কি না কেন—আমরা একটু পরিষ্কার থাকবো। গন্ধ পাবো না নাকে। মাছি বসবে না কেন—আমরা একটু পরিষ্কার থাকবো। গন্ধ পাবো না নাকে। মাছি বসবে

না ধারে-ভিতে। তার জন্যে মাইলের পর মাইল—হোগলার দেশে—জলের দেশে ?

কোথায় তোমার জয়হিন্দ দলুই ? আর কতদূর ?

এদের তো মাইলের জ্ঞান তুমি জানোই।

আর হাঁটতে পারছি না ওগো।

তবে এসো—এই রেলিং দেওয়া জায়গাটায় বসি।

রাধা বানান করে করে পড়লো। সেডিমেনটেশন ট্যাংক।

ছায়া পড়েছে। এদিকটায় ইলেকট্রিক আছে। কপিকল ধরনের লোহার চেন লোহার চাকায় পাকানো। ট্যাংকটা ঘিরে জলের গোল চৌবাচ্চা। সিমেন্ট-করা মোটা ভিতের বাইরে লোহার নালি পথ—বিরাট এক ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়েছে। সে মাঠে ঘাস একদম ভেলভেট সবুজ।

লোকজন সে মাটি কোদালে কুপিয়ে ছোট ছোট ডিঙি ভর্তি করছে। রাধা গিয়ে বললো, কোথায় নিচ্ছো এসব।

মাথায় গামছাবাঁধা একজন মাতব্বর গোছের লোক বললো, ভেড়িতে যাবে। আপনারা এখানে কি করতিছেন ?

ধাপার ফুলকপি কিনবো ভেবেছিলাম।

এবার তো ফুলকপি হয়নি মা।

কে যেন জয়হিন্দ দলুই—

আমিই জয়হিন্দ। গত সনের বানে কুশি চারা সব নষ্ট হল।

এ মাটি কি করবে ?

বড় সারি মাটি মা। ওই ট্যাঙ্কির যে ছাঁকা জল এসে ওই খালে পড়ে, ভেড়িতে নিয়ে যাই আমরা মাছ চাষে।

এই সময় বীরেন এসে রাধার পাশে দাঁড়ালো।

চোয়ানো জল এ মাঠটায় পড়ে পড়ে সার হয়ে থাকে। কোদালে তুলে আমরা ভেড়িতে দি। আবার চাষের ক্ষেতেও লাগাই।

গর্ত হয়ে যাবে যে জায়গাটা।

হয় না বাবু। জলের ভিতর পাঁক মাটি থাকে। জমে জমে আবার গর্ত ভরে যায়। কেমন ঘাস দেখুন। একদম রং করা মনে হবে।

সত্যিই তাই। গভীর, ঘন সবুজ। বিজবিজ করছে। মাটিটা নরম। কোদালে তুলতে বিশেষ পরিশ্রম নেই।

বীরেন বললো, এ তো কলকাতার নালী দিয়ে আসা জল—তাই না ?

হ্যাঁ বাবু। সবটাই গু-মুত। অন্য জলও আছে—

রাধার ঘেন্না করছিল। কিন্তু আশ্চর্য ! বাতাসে কোন গন্ধ নেই। বীরেন ভয়ে ভয়ে বললো, মাছ এই জল খেয়ে মরে না ? পোকা থাকে তো—

থাকে। সেটাই তো মাছের খাবার বাবু। তাড়াতাড়ি বাড়ে। ওই পোকা

খেয়ে—জল খেয়ে—

রাধা ওক্ টেনে বমি করে ফেললো। হড় হড় করে। লজ্জা, ভয় একসঙ্গে তাকে কাবু করে ফেললো। আমি দাঁড়াতে পারছি না ওগো। বলেই বীরেনের হাত দু'খানা ধরলো।

ভয় নেই কোন। মাকে ওই মাঠে বসিয়ে দিন। আমি ডাব পেড়ে আনছি। সুস্থ হয়ে যাবেন এখুনি।

বীরেন ঘাবড়ায়নি। কিন্তু কোন মহিলা অজানা জায়গায় এভাবে অজানা লোকের সামনে যে বমি করে ফেলতে পারে-- তা ভাবতেও পারেনি সে। মাছ-গুলো তাহলে কলকাতার পাতালের পোকা সাবাড় করে খাচ্ছে—এটা একটা আশার কথা। বোসো ওগো। এখানটায় বোসো।

পড়ন্ত সূর্যের লালচে আলো তখন রাধার মুখে। কোন সাপখোপ নেই তো।

তা আছে মা। বড় বড় বিষধর। ডোবা ভরাটি জায়গা তো।

বাবাগো— বলে উঠতে যাচ্ছিল।

শুধু শুধু ভয় পাবেন না মা। কোদাল-এর এক কোপে দু-টুকরো করে দেব না। আসুক না গোখরো।

পরপর দুটো ডাব খেয়ে রাধা বড় একটা ঢেকুর তুললো। তখনো তার শাদা বমি---সবুজ ঘাসে এক পোচড়া রং হয়ে পড়ে ছিল। অবেলায় খেয়েছি তো। তারপর এই গনগনে গরমে বেয়াড়া জায়গায় ঘুরে বেড়ানো। আর কি জায়গা ছিল না ওগো ?

আমি তো আগে কোনদিন ধাপায় আসিনি।

আচমকাই অন্ধকার নেমে এলো। সেডিমেনটেশন ট্যাঙ্কের রেলিং পোস্টে ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠলো। সারা তল্লাটে এখন জলজ ঠাণ্ডা হাওয়া।

সেদিন রাত একটা বারো মিনিটে বীরেন দত্তগুপ্ত স্বপ্ন দেখলো—কলকাতার পাতাল-এর পাইপ লিক হয়ে গেছে। নানা জায়গায়। পাতাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে তরলে। সেই তরলের স্রোতে নানা চেহারার পোকা ভাসতে ভাসতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনু পার হচ্ছে। চার পাশের মাটি নজবজে হয়ে যাচ্ছে। এয়ার লাইনসের অফিস হেয়ার স্ট্রিট থানার গায়ে খানিকটা হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে পুলিশকে দেওয়াল চাপা লোকের মতই কাত হয়ে বেরোতে হচ্ছে। আর এয়ার লাইনসের পাইলটরা বাঁশের মই বেয়ে নিচে নামছে। কারণ ওদের সিঁড়িটা একতলা থেকেই ধাপগুলো শূন্যে তুলে বাড়িটার সঙ্গে কাত হয়েছে।

রাস্তায় যে কজন লোক ছিল—তারা বীরেনের মতই চিন্তিত। কলকাতার বাতাসে এমন দুর্গন্ধ কোনদিন পাওয়া যায়নি। নিচের পাতালের কোন নালী—কোন পাইপ—কোথায় কোথায় ফুটো হয়েছে—তা এখন খুঁজে বের করাই কঠিন। মেইনলি তিন টাইপের পোকা বেরিয়ে পড়েছে। সুঁড়ওয়ালা পোকা-গুলো তরল দুর্গন্ধের ওপর ভাসতে ভাসতে উথলে উঠে ফুটপাতে গিয়ে পড়ছে। ওদের লক্ষ্যই হোল—জংধরানো। কেননা, গুটি দশ-বারো পোকা চোখের সামনে ফুটপাথে উঠেই ইসলামিয়া হাসপাতালের সামনে ঘোড়ার জল খাওয়ার বহু আগের লোহার চৌবাচ্চায় গিয়ে চড়াও হোল। খানিক বাদে ওরা যখন চৌবাচ্চা ছেড়ে পাশেই ল্যাম্পপোস্টটা বেছে নিচ্ছিল—তখনই বীরেন দেখতে পেল—লোহার চৌবাচ্চায় জায়গায় জায়গায় আনকোরা জং ধরেছে। তিনটে জংধরা জায়গা বীরেনের চোখের সামনে আসলে ফুটোয় গিয়ে দাঁড়ালো—আর সেই তিন সদ্য ফুটো দিয়ে কয়েকদিন আগের বর্ষার জমা জল চুইয়ে চুইয়ে ফুটপাথে পড়তে লাগল।

এমন সময় জয়হিন্দ দলুই লুচিভাজার বড় জালি হাতা দিয়ে এক থাবা ওই সুঁড়ো পোকা ছেকে তুলে নিল। তার সঙ্গে ঢ্যাঙ্গা মত খালি গায়ে একজন লোক। পায়ে রবারের ফিতে বাঁধা জুতো তার! জয়হিন্দ ছেকে তোলা পোকাগুলো কোমরের পলিথিন ব্যাগে ভরেই আবার আরো এক জায়গায় লম্বা হাতখানা ভরে দিল।

জয়হিন্দ না ?

আজ্ঞে চিনতে পেরেছেন দেখছি।

এদিকে ?

আজ্ঞে বেরিয়ে পড়লাম। মা ভালো আছেন ?

ও কথায় কান না দিয়ে বীরেন পাশের লোকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতেই জয়হিন্দ বলল, আজ্ঞে আমার ভেয়রা ভাই। ও ফুলকপির চাষ করতো। ভালো নাম স্বাধীন মজুন্দার।

হ্যাঁ। ওর নামও তো শুনেছি। চললে কোথায় তোমরা ?

আর বলেন কেন! মা তো সেই ডাব খেলেন সন্ধ্যেবেলা। আপনারা চলে আলেন। সে রাত থেকেই যত পোকা ছিল—সব কলকাতা পাড়ি দিল। আমরা ভাবি—যায় কোথায়। মাছগুলো শুকোতে লাগলো। টাংকিতে রোজ রোজ পোকা দরকার অনেক। তা না হলি ময়লা ঝাঝরা করে খাবে কারা ? কারাই বা জিনিসটারে মাছের খাবার করে দেবে ? মাছ শুকোতে লাগলো।

তখন আমার ভেয়রাভাই স্বাধীনকে বললাম—ও মজুন্দার—চলো যাই সুঁড়ওয়ালা পোকাদের দেশে—

কথা বলতে বলতেই দুবার ছাকা-হাতায় দু প্রস্থ সুঁড়ওয়ালা পোকা তুলে নিয়ে জয়হিন্দ দলুই তার কোমরের পলিথিন ব্যাগে ওগুলোকে রাখলে।

কি করবে ওগুলোকে নিয়ে।

দেখি কি করা যায় ? ভাবছি ভেজে খাব।

ওমা! সে কি ?

আপনারা সব কথায় চোখ কপালে তোলেন কেন বলুন তো ? খানিকটা মাংস তো পোকাগুলোর গায়ে পাবো। একি ফেলে দেওয়ার জিনিস ? এতকাল যে খাইনি—সে তো আমাদেরই বোকামো। বোয়াল বাইনের সঙ্গে গোটা কয়েক ভেজে খেলাম।

তাই নাকি ? কেমন খেতে ?

কাঁঠালের বিচি ভেজে খেয়েছেন ? অনেকটা সেরকম। খানিকটা নুন মিশিয়ে খেলি তো চমৎকার।

আর কি খাবার জিনিস নেই জয়হিন্দ ?

ও স্বাধীন দাদা ? বাবুকে কিছু বলো না—

স্বাধীনের গলা দিয়ে করাতকাটার আওয়াজ বেরিয়ে এলো। ছোটবেলায় কুশী আম, কাঁচা ঢেড়স, আধপাকা পান খাওনি বাবু ? *এ সুঁড়ো পোকাও* ভেজে খেলে তেমনি—কচ কচ করে মুখে দিলি। আবার মাংস মাংস ভাব। আবার ভদ্দর লোকেরা যে কাজু বাদাম খায়—তাও বলতি পারেন।

জয়হিন্দ আরেক হাতা পোকা তুলে নিয়ে কোচড়ে রাখলো। পুড়িয়ে খেলি আরও ভাল লাগে।

বাতাসে সে দুর্গন্ধ এখন অনেক কম। লোকজন কাপড়-জামা বাঁচিয়ে বাসে

উঠছে। বাস থেকে নামছে। বীরেন বললো, ঘেন্না পাওনা ?

আমার ভেয়রা ভাইকে বলুন না কেন। কি স্বাধীন ? ঘেন্না পাও ?

মোটেই না। পোকাগুলো মিলে মানুষের ময়লা ঝাঁঝরা করে। তাই বেরোয় টাংকিতে। সে জল খেয়ে মাছ নাদুর নুদুর হয়। সে মাছ খেয়ে ভদ্দরলোকেরা ভুঁড়ি ভাসায়। বাবুদের মেয়েছেলের শশার চাকলার মত পাতলা পেট বেরিয়ে থাকে শাড়ির বাইরে। তাই না বাবু ?

বীরেন চুপ করে থাকলো।

তখনো মজুন্দার বলে যাচ্ছিল, গোরস্তানে মানুষের শরীর তো পোকায় খেয়ে খেয়ে মাটিতে মিশোয়। তাই না বাবু ? সেই মাটিতে মানুষের শরীরের রস মিশে যায়। আমি—আমার বায়রাবাই জয়হিন্দ সেই মাটিতে ফুলকপি বসাই—আপনারা ডালনা করে খান। আর কটা পোকা খেলিই ঘেন্না। হাসালেন বাবু—

বীরেন বুঝে উঠতে পারলো না, লোকটা ভায়রাভাইকে কেন বায়রাবাই বলছে। তার কি শুনতে ভুল হচ্ছে ?

পৃথিবীর এত বড় একটা বিপদ। কলকাতার এখন এমন বিপর্যয়। সুঁড়ো পোকাগুলো ক্ষেপে গিয়ে সব পাইপে জং ধরিয়ে লিক করে বসে আছে। আর দুই ভায়রাভাই মিলে ভাজা খাবে—পুড়িয়ে খাবে বলে দিব্যি পোকা ধরতে বেরিয়ে পড়েছে ? এইভাবেই মানুষ মানুষের জন্যে প্রলয় ডেকে আনে। মানুষের কি হবে ? আমরা কি শেষ পর্যন্ত এই জংধরানো পোকাদের ডেকে আনা দুর্গন্ধতরল প্লাবনে শেষ হয়ে যাবো ? না, এর একটা বিহিত হবে।

ম্যানহোল থেকে ময়লা সাফাইয়ের একজন মানুষ ছিটকে বেরিয়ে এলো। যন্ত্রণায় লোকটা চেঁচাচ্ছে। তখনো তার গায়ে চারপাঁচটা সুঁড়ওয়ালা পোকা। বেশ বড় বড়। লোকটা ছুটে এলো বীরেনের কাছে। বাবু বাঁচান। উঃ। কি রাক্ষুসে পোকা।

ভায়রাভাই দুটি ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

বীরেন পকেট থেকে রুমাল বের করে লোকটার বুকের ওপরে বসে থাকা বড় পোকাটাকে খাবলে ধরলো। টানতেই পোকাটা খুলে এলো—কিন্তু লোকটার বুকে পাতলা করে চামড়া খুলে গেল। আর অমনি বিকট চীৎকারে লোকটার গলা বউবাজারের ক্রসিং অব্দি ছড়িয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে বীরেন দত্তগুপ্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনুতে এ কি ধারার আলো ? ফিকে মত। ভোর হয়। বীরেন ভালো করে তাকিয়ে দেখলো সে আর রাধা পাশাপাশি শুয়ে। রাধা তার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। গরমকালের ভোর--তাই আলো বেরিয়ে পড়েছে ভীষণ সকাল সকাল।

এইরকম ভোরবেলায় ছেলেবেলা মেশানো থাকে। ঘটি হাতে দুধ আনতে যাওয়া। বকুল ফুল কুড়িয়ে বুনো লতায় মালা গাঁথা। সামার ভেকেশনের দিন টগরের তোড়া হাতে মর্নিংস্কুলে। আর এরকম-ভোরে আমি কী ভয়ঙ্কর প্লাবন দেখে যাচ্ছিলাম ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। উঃ।

রাধা। এই সরো। এমন অগোছালো হয়ে ঘুমোয়। ভোর রাতেই ওর ঘুম গাঢ় হয়। বহুকাল আগে শেষবার মা হয়েছে রাধা—তাও তো প্রায় চোদ্দ বছর—সাধনের যা বয়েস। তাই যে-বয়সে মেয়েরা মহিলায় প্রমোশন পেতে পেতে মাসীমা হয়ে যায়—সেই বয়সেও রাধা অগোছালো হয়ে ঘুমিয়ে নিজেরই অজান্তে বীরেনকে ভীষণ অ্যাকটিভ করে দিল।

ও-পাশ ফেরা অবস্থাতেই রাধা বললো, উহুঁ। ঘুমোতে দাও।

এতটা সেলফিশ কেন তুমি বলতো। সারা রাত তো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়েছো।

রাধার দিক থেকে কোন জবাব না পেয়ে বীরেন বলতে থাকলো, কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলাম রাধা। ঘেমে নেয়ে যাবার অবস্থা। কলকাতার সুয়ারেজ লিক হয়ে গেছে। জয়হিন্দ দলুই পোকা পুড়িয়ে খাবে—

ভোরবেলা চুপ করে ঘুমোও তো। আমাকেও ঘুমোতে দাও।

বীরেন চুপ করে গেল। মনে মনে বললো, ফ্রেশ—সুন্দর থাকার জন্যে? সেলফিশ! আসলে ভীষণ মিন মাইন্ডেড তুমি রাধা। অন্যের প্রয়োজন তুমি একদম বুঝতে চাও না।

কিন্তু মুখে বীরেন বললো, এমন বিচ্ছিরি স্বপ্ন। সুঁড়ওয়ালা পোকাগুলো লোহার পাইপের ওপর বসে তাদের লালায় জংধরিয়ে ফুটো করে দিচ্ছে। আর অমনি দুর্গন্ধ লিকুইডে সব ভেসে যাবার জোগাড়।

চুপ করো। দোহাই তোমার। ফুলকপির খোঁজে ধাপা, বানতলায় গিয়ে কী বমিটাই পেল—

এমন বিচ্ছিরি স্বপ্ন—

চুপ করো। তুমি তো দুপুরবেলাতেও ঘুমোলে স্বপ্ন দেখে ফেল। আধ ঘণ্টার ঘুমের ভেতরেও।

ঘুমের ভেতর রাধা—দুপুর সকাল, রাত—সবই সমান। কাছে এসো।

বিরক্ত কোরো না।

এ কথায় বীরেনের—বিয়ের এই বিশ বাইশ বছর পরেও খুব ইনসাল্টেড্ লাগলো। এ কি? রাধা তুমি কি গোলাবাড়ি থানার ও সি? কোন কনেস্টবলকে বলছো—ঘুমিয়ে আছি। এখন বিরক্ত কোর না। আমি তো কোন ঘুষখোর সেপাই নই। কিংবা কোন ক্রিমিনাল হিসেবে থানায় আসিনি। আজই দুপুরে কলকাতার আন্ডারগ্রাউন্ড কাজের ঠিকেদারি নিয়ে সি. এম. ডি. এ-তে যে মিটিং হবে—তাতে আমি আমার কোম্পানীর হয়ে রিপ্রেজেন্ট করব। আমার

ইনকাম ট্যাকস্ ক্লিয়ার। শুধু মডার্ন টেলার্স আট টাকা পাবে। আমার সঙ্গে তোমার স্বাভাবিক বিবাহিত স্বামীর সম্পর্ক। তাও তো, স্বামী কথাটার ব্যুৎপত্তিগত মানে কোনদিন অ্যাপ্লাই করিনি তোমার ওপর।

কাছে এসো।

দ্যাখো। কাল থেকে আমার বুকে ব্যথা। আমি অতক্ষণ পারি না। মোটা হয়ে গ্যাছো তুমি আগের চেয়ে। ভোরে ঘুম ভেঙ্গেছে। যাও না—মর্নিং ওয়াক করে এসো।

বীরেনের এ কথাটা ভালো লাগলো। তাহলে আমার শরীরের ভার অন্তত তোমার বুকে একটা স্থায়ী ব্যথা ডিপোজিট করতে পেরেছে। এটাই বা কম কি। প্রথমে বডি। তারপর তো মাইন্ড। তোমার মনে আমি সাইকোলজিকালি শেষ পর্যন্ত এমন একটা বড় চেয়ার পাবো—যাকে তুমি দূর থেকে তোমার মনের সিংহাসন বলে ভাববে।

এসব কথা বলা যায় না। তাই বীরেন বললো, মর্নিং ওয়াক করলেই আবার খিদে পাবে। শেষে হয়তো বাঁধা কপির ডালনা খাবার ইচ্ছে হতে পারে।

কিংবা কোন গাছের গোড়ায় উইয়ের বাসা দেখে তিন ঘণ্টা বোবা হয়ে থাকলে।

না রাধা। পোকা বাদ দিয়ে বাঁচার রাস্তা নেই কোন।

তাও তো ঘুনপোকা চোখে দেখা যায় না। ভাগ্যিস—

কাছে এসো।

জোর কোরো না লক্ষ্মীটি।

বীরেন বুঝলো, সে এখন আর চিরপরিচিত বীরেন দত্তগুপ্ত নেই। লন্ড্রি-ওয়ালা, সাধন, ওভারসিয়ারবাবু যে বীরেনকে চেনে—আর এখনকার এই বীরেন একদম অন্যরকম লোক। একটা কোন ছুটন্ত ট্রেন তার এখন না ধরলেই নয়। এমনি পড়িমরি অবস্থা। এর ওপর আবার শেতলপাটিতে হাঁটু স্লিপ করছিল।

একটা জিনিস ভীষণ যন্ত্রণা দেয় বীরেনকে—ভেতরে ভেতরে।

মানুষের নাকি বউকে শুধু ভালবাসলেই চলে না। সেই ভালবাসা চাঙ্গা রাখতে—সঙ্গী শরীরটাকেও সময়মত জাগিয়ে নিতে হয়—ভালোভাবে—তার খাদ্য খাবার ঠিকমত জোগান দিয়ে খেতে হয়। নইলে—শরীর যদি সঙ্গী না হয়—তবে সব ভালোবাসা খাক হয়ে যাবেই।

এই জায়গাটা কিছুতেই মেলাতে না পেরে বীরেন একা একা ভোগে। কষ্ট পায়। এ কিরকম রাজমিস্ত্রির ব্যাপার স্যাপার—বিশেষ করে ভালোবাসার সঙ্গে? এত মোটা দাগের জিনিস বীরেন কিছুতেই মেলাতে পারে না—ভাল-বাসার সঙ্গে।

একদিন এক বন্ধু বলেছিল—বীরেন। তুই কি ভাবিস বলতো! ভালবাসা মানে কি বেদনার ফুল? ভালবাসা মানে কলাই থালা, স্টেনলেসের ডালের

বাটি। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

বীরেন মানতে পারেনি। সে চুপ করে থেকেছে। এখন সে রাধার মানা মানতে পারলো না।

কিছুতেই কথা শোনো না তুমি। বড় অবুঝ।

এখন বীরেনের কোন কিছু কানে যাচ্ছে না। সে মনে মনে সব কঠিন অংকগুলো খুঁজতে লাগলো। ক্লাশ ফাইভে যে অংকটা অ্যানুয়েলে সে মেলাতে পারেনি। সেই যে সেই সিঁড়ি-ভাঙাটা। বি. এস. সি. তে থিটা পাই গামা দিয়ে কয়েকটা বিচ্ছিরি অংক ছিল। সেগুলোও সে হাতড়াতে লাগলো। যে সব অংক একদম মেলেনা—সেগুলো তার এখনই চাই। যে অংকে একটা স্টেপ মিস করলে কিছুতেই বাকিটা মেলে না—এমন অংক সে জীবনের পঁচিশ, তিরিশ, চল্লিশ বছরেরও বেশি পেছন থেকে কুড়িয়ে আনতে লাগলো।

এখন আমি কিছুতেই রাধার মুখে তাকাবো না। তাকালে আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমি বেড্ সুইচের নীলচে বোতামটা খুঁজছি—আর মনে মনে ডিফারেনসিয়াল ক্যালকুলাসের সেই অংকটা হাতড়াচ্ছি। যেটা কোনো-দিনই মেলেনি আমার হাতে। সেটা বার বার কষে যাচ্ছি। আসলে রাধা এত সুন্দর।

খুক্ খুক্ করে হেসে উঠলো রাধা। কি হোল। এত তোড়জোড় করে —শেষে এই—

তোমার?

আমার কথা বাদ দাও। আমার কথা কি তুমি একটু ভাবো? আমি এখন কী করবো।

বাংলা উপন্যাসে থাকতো—সে এখন অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল। বীরেনের অবস্থাও তাই। আজও এই একই হাল আমার। আমি জীবনে একবারই রাধাকে সাহায্য করতে পেরেছি। যাকে বলে হেলপ্। বানতলায় কলকাতার পাতালের তরল যে-ট্যাংকে থেকে থেকে জল হয়ে বেরিয়ে আসে—তার সামনে রেলিং দেওয়া গাঁথুনি দেওয়ালে দাঁড়িয়ে রাধা বলে ফেলেছিল, আমি পারছি না। আমায় ধরো।—তার পরেই সবুজ ঘাসে এক পোচড়া শাদা।

ঠিক তখনটায় রাধা একদম নিরুপায়। এরকম অবস্থাগুলো আমি খুব এনজয় করি। ও সাহায্য চাওয়ার অবস্থায় এলে আমার ভালবাসা একটা রাস্তা পায়। সত্যি সত্যি কি আমি ওকে ভালবাসি? না শারীরিক দখলটাই এখানে বড় কথা? সেই দখলের সুখটা পাছে ধরা পড়ে—তাই তার কাব্যিক নাম রেখেছি ভালবাসা। এইযে নিরুপায় অবস্থায় আমার ভালবাসাটা যে ভাল খেলে—তার কারণ, ওতো তখন সযুত থাকে না। ঢিলেঢালা হয়ে পড়ে। খুক খুক করে হেসে বলতে পারে না—কী! ব্যাস?

কোথায় যাচ্ছো? শুয়ে থাকো না—

বাঃ। বাথরুমেও যাবো না? বুড়ো বয়সে কী হলো তোমার বলতো?

কিচ্ছু হয়নি রাধা। ফিরে এসে এক গ্লাস জল দিও আমাকে।

নিজে উঠে গিয়ে খাও না। এত হুকুম করো কেন? আমার শরীরটা ভালো নেই।

আগে তো এক গ্লাস জল দিতে—ঘুম ভাঙলে—

এখন আমার বয়স হয়নি? তার ওপর তোমার কথায় বাড়ি খেয়ে খেয়ে আমার শরীরের হাল দেখেছো? মেঝেতে পা ফেললে ঝন্ করে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তলপেটটা ভারি হয়ে যাচ্ছে।

বীরেন মনে মনে বললো, আমি তো ভীষণ লোভী। অন্যের শরীরের কষ্ট একদম বুঝতে চাই না। মুখে বললো, এ মাস থেকে বড়ি খাওয়া ছেড়ে দাও। আমি নিজেকে সংযত করবো। দেখো তুমি।

হুঃ। আর করেছো। আমরা কি চড়াই পাখি।

জানো। তুমি না রাধা এই সেদিনও চোড়াই বলতে।

কক্ষনো না।

ভঙ্গীটা এত ভাল লাগলো বীরেনের—সে পরিষ্কার বললো, এসো না রাধা—খানিক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকি। চিৎ হয়ে। দু-জনে।

তুমি সেই পাত্তর। শেষরাতে শবাসন করবে। আর চার পাঁচ বছর পরে হয়তো তোমার ছেলের বউ আসবে।

তা আসুক রাধা। আমি ততদিনে সাধু হয়ে যাবো। আসল মুস্কিল কি জানো। এত কম বয়সে আমরা বিয়ে করে বসে আছি—সেই কোন্ ত্রেতা যুগে আমাদের দুটি ছেলে হয়েছিল—কবে—সেসব কথা ভুলে গেছি। কেউ আর আমাদের মাঝখানে অয়েল ক্লথে শোয় না।

বড় দুঃখ। মুতে ভাসায় না? ভোরবেলা ভিজে কাঁথা রোদে দিতে হয় না? তাই না।

একটা যদি মেয়ে হোত আমাদের এখন।

খুব আহ্লাদ—তাই না? তোমার পেটে হোক।

রাধা বাথরুম থেকে ফিরলে বীরেন বললো, তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ক'দিন হলো দীনুর চিঠি এসেছে।

তোমার অফিসের ঠিকানায়?

হ্যাঁ।

কেন?

হয়তো ফিল্ডে রয়েছে বলেই অফিসের ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছে। তোমায় বলতে ভুলে গেছি—দীনুকে কী এক মশা কামড়েছে—

কোথায় আছে? আগে বলোনি কেন?

ডোংগড়গড়ের জঙ্গলে। সেখানে কি একটা মশা কামড়ালেই নাকি জায়গাটা

পেকে যায়।

সর্বনাশ ডোংগড়গড় কোথায় গো ?

আমিও তো জানি না রাধা। পেকে গিয়েছিল কয়েক জায়গা। দীনু চিন্তা করতে বারণ করেছে আমাদের। আমরা যেন না ভাবি—তাই লিখেছে। ও মশা কামড়ালে নাকি জায়গাটা পেকে গিয়ে ভেতরে শাস হয়ে যায়। শাস তুলে ফেললে অবিশ্যি চিন্তা নেই।

তুলে ফেলতে পেরেছে ?

হ্যাঁ আমার ছেলে তো। খুব জ্বর হয়েছিল দু-দিন।

কী লোক বলতো তুমি ? এসব কথা চেপে রেখেছো ? বলোনি কেন আগে ?

আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

নিজের ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে তার কথা কোন বাপ ভুলে থাকতে পারে ! কী ধারার বাপ গো তুমি ?

কেঁদো না। আমি বাপ তো—এ ব্যাপারেও তোমার কোন সন্দেহ আছে নাকি ?

আবছা আলোয় বীরেন উঠে বসে এ প্রশ্ন করায় রাধা তার স্বামীর মুখে তাকালো। এত সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো কেন বলতো ? তুমি তো দীনেশের বাবাই—এ কথা কে সন্দেহ করবে ? তোমার কী হয়েছে ওগো ?

বীরেন মনে মনে বললো, যাক। এ রাউন্ডটা জিতে গেলাম। রাধা আমার ভেতরকার মন নিয়ে খোঁজ নিতে বাধ্য হচ্ছে। এটাই তো একটা বড় ভিক্টরি। বীরেন অন্যদিকে মুখ করে রাধার কথার জবাব দেবার আগ্রহের অভাব প্রমাণ করতে চাইল। পুরোপুরি না পারলেও—একটা জিনিস ভেবে তার খুব স্যাটিসফ্যাকশন হচ্ছিল। আমি একটু আগে খুক্ খুক্ শুনেছি রাধার মুখে। রাধা মনোযোগ দিতে চাইছিল না তখন।

ভাগ্যিস স্টকে দীনুর চিঠিটা ছিল। সেই ভয়ংকর মশার কথাটা ছিল। ভাগ্যিস ভুলে যাওয়ায় রাধাকে আগে বলা হয়নি। আগে বলে ফেলে থাকলে এমন সময় কি বলতাম। কি আর বলার ছিল আমার ?

মশারির বাইরে রক্তখোর যেসব মশা এখন কলকাতায় ঘুরছে তারাও যদি একদিন অমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে—তাহলে ডোংগড়গড়ে দীনুকে চিঠি লেখা যাবে।

বাবা দীনু। তোমার মাকে এবং আমাকে এই মশাগুলি কামড়াইয়া শেষ করিয়া দিল। শরীরের সব জায়গার শাঁস এখনো তোলা যায় নাই বাবা !

কি হয়েছে তোমার ?

রাধার হাতের পাতা ঠাণ্ডা। এইমাত্র আমার পিঠে রেখেছে।

জল দিয়েছি তোমাকে ?

না। কোথায় আর দিলে।

ক্ষমা করো। এখুনি নিয়ে আসছি—বলে রাধা মশারির বাইরে চলে গেল। দীনুকে চিঠি দিয়েছো?

দিয়েছি। বলে বীরেন নিজের মনে মনে বললো, উঃ! কী আনন্দ! এ-রকম কতকাল হয় না। আমার মুখের চেহারা বিভ্রান্ত, বিমূঢ় করতে পারলেই—।

বীরেন জল খাবার পর রাধা আবার জানতে চাইলো—কি হয়েছে ওগো?

কিছু না। বলে থেমে থেকে বীরেন আবার শুরু করলো। ডোংগড়-গড়ের মশাগুলো অমন হয়ে গেল শেষে। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর এক হাত নিচেই রাস্তার ও-পিঠে কোটি কোটি শুঁড়ওয়ালা পোকা। খুব হাই প্রোটিন। ভেজে বা পুড়িয়ে—

কী বাজে বকছো? ওগো! বলে দু'হাতে রাধা বীরেনের গলাটা জাপটে ধরলো। কী হলো গো তোমার?

কাঁদছো কেন রাধা। কত শত শত কোটি পোকা—একজনের পিঠে আরেক-জন। কখন ওরা মরে গিয়ে খসে পড়ে টুপ করে—তার কোন রেকর্ড নেই। ওদের তো কোন বংশ তালিকা নেই। সবাই যদি ওরা বাথরুমের ঝাঁঝরি টপকে ওপরে উঠে আসে—ওঃ! আর ভাবতে পারছি না রাধা—

তুমিও কাঁদছো ওগো? তোমরা পুরুষ লোক—

শ্রীচরণকমলেষু বাবা,

তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম লইও। মাকে দিও। আমরা এখন ডোং-গড়গড়ের ক্যাম্পে। তিনজন স্যার। চারজন কাজের লোক ও আমরা ষোল-জন জিও-ফিজিকসের স্টুডেন্ট লইয়া আমাদের এই ক্যাম্প। ক্যাম্প মানে আলাদ আলাদা চারটি তাঁবু পড়িয়াছে। আমি চিঠি লিখিতেছি—তিন নম্বর তাঁবুর ভিতর বসিয়া—পেট্রোম্যাকসের আলোয়। তিন নম্বর তাঁবুতেই আমাদের সঙ্গের যন্ত্রপাতি রহিয়াছে। আমাদের তাঁবুর পিছনেই মাইল পনেরো

দূরে শীলাডুংড়ি, নন্দডুংড়ি, আশডুংড়ি—এইরূপ কত ডুংড়ি তার শেষ নাই—ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ। আমরা জিপ ভাড়া নিয়াছি। পরশু জঙ্গলের ভিতর দিয়া সাত মাইল দূরে নর্মদার তীরে গিয়াছিলাম।

কি বলিব বাবা—হঠাৎ জঙ্গল খুলিয়া গেল। জিপ বাঁক লইতেই দেখি আমরা ধু ধু কালো জলের সামনা-সামনি আসিয়া পড়িয়াছি। ওড়িশার মত এখানেও প্রচুর কেঁদ গাছ। গাছতলায় পাকা কেঁদ ফল খাইতে কিছু জলের পাখি ঝাঁক বাঁধিয়া নামিয়াছে।

এখানকার ভূত্বকে পাললিক শিলা আজ হইতে অন্তত লক্ষ বছর আগে কোন অজানিত কারণে এই নর্মদা ট্রাকটে চিড় খাইয়া এখানকার মাটিতে এক বিচিত্র পরিবর্তন ঘটায়। ইহা স্টাডি করিতেই আমাদের এই ক্যাম্প। গাইগার-মিটারের কাঁটা ঝাঁকুনী খাইয়া বহু বিচিত্র জিনিসের—ইতিহাসেরও আগের ইতিহাসের দিকে দিক নির্দেশ করিতেছে।

এই অব্দি পড়ে রাধা বললো, দীনু তো ভালো বাংলা শিখেছে।

চিঠিখানা কোথায় পেলে?

তোমার বাইরে বেরোনোর জামার ঝুল-পকেটে। কিন্তু অসুখের কথা কোথায় লিখেছে?

পড়ে যাও—

রাধা মনে মনে পড়ছিল। ভোরবেলার আলো ফোটার মুখে মুখে বীরেন ঘুমিয়ে পড়ে। তখন দু'কাপ চা করেছিল রাধা। পরপর কাগজ পড়েছে দু'খানা। ইংরিজি বাংলা। ঠিকেদারি ফার্মের লোক বলে বীরেনকে টেন্ডারের বিজ্ঞাপন আতিপাতি করে দেখতে হয়। বীরেন ঘুমোচ্ছিল বলে সে চা-টাও খেতে হয়েছে রাধাকে।

দীনু লিখেছে—

পড়ে যাও না।

নর্মদা তট হইতে ফিরিবার পথে আমরা একটু শর্টকাট করিতে গিয়াছিলাম। ফলে আরও খানিক বেশি জঙ্গলের পথ দিয়া ফিরিতে হইতেছিল। জিপ বলিয়াই অমন লতাপাতা খানাখন্দ অগ্রাহ্য করিয়া ফেরা সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু পথে এক কাণ্ড ঘটিল।

আমরা খেয়াল করি নাই। জঙ্গলের কয়েকটি মশা আমাদের গোটানো হাতার বাইরে হাতে বসে। কিছু বসে ঘাড়ে। ফিরিতে না ফিরিতে ধুম জ্বর। সেই সঙ্গে কামড়ানো জায়গাগুলি দেখিতে দেখিতে ব্যথা ছড়াইয়া পাকিয়া উঠিল।

তিন স্যার বুদ্ধি করিয়া তখন তখনই একুশ মাইল দূরের এক বসতি হইতে পাকা ডাক্তার ধরিয়া আনেন। ডাক্তারবাবু আসিয়াই গরম জল চাপাইতে বলিলেন। ততক্ষণে আমাদের হাতে, ঘাড়ে পুঁজ জমিয়া গিয়াছে। বোরিক

আসিল। কী টাটানো ব্যথা। ডাক্তার হাসিতে হাসিতে যেন ফোঁড়া কাটিতে বসিলেন। বোরিক কমপ্রেস। প্রায় চিমটা দিয়া পাকিয়া ওঠা জায়গা হইতে ভেতরকার শাস টানিয়া তুলিলেন।

ভোরের দিকে আমাদের সবাইয়ের জ্বর ছাড়িয়া গেল। ঘা শুকাইতে মাস-খানেক যাইবে। আমরা এখন সবাই ফুল স্লিভের শার্ট পরিতেছি।

ডাক্তারবাবু পরদিন ভোরে আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারিয়া তাঁর ডেরায় রওনা হইলেন। যাইবার সময় বলিলেন, শুধু ডোঙ্গড়গড়ে এখনও এই মশা আছে। ইহাদের ভায়রা-ভাই থাকে ইথিওপিয়ায়। সেখানে তাহাদের চেহারা মাছির মত। নাম সেরেটসে। ইথিওপিয়ায় বহু জন্তু এই সেরেটসের দাপটে অকালে প্রাণ হারায়।

পঞ্চাশ হাজার বছরে বহু বিবর্তনের ভিতর দিয়া ডোঙ্গড়গড়ের মশার পরিবর্তন হইয়াছে অন্যত্র। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে ডোঙ্গড়গড় ডোঙ্গড়গড়ই থাকিয়া গিয়াছে। উহারা পাল্টায় নাই। যেমন পালটায় নাই ইথিয়োপিয়ায়।

বাবা। একবার ভাবিয়া দ্যাখো। চতুর্দিকে পঞ্চাশ হাজার বছরের বিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটে নাই শুধু ডোঙ্গড়গড়ে। প্রাণীজগতে ইহা কত বিরাট গবেষণার বিষয়। এখানকার শীলা, এখানকার ভূত্বক এবং এখানকার মশা আমার মনকে স্থির থাকিতে দিতেছে না। কোথায় সুদূর ইথিওপিয়া—আর কোথায় নর্মদার কাছাকাছি কয়েকটি ডুংড়ি সাক্ষী এক অনামা জঙ্গল। এক সময়কার মাছি ও মশা একই মারাত্মক চরিত্র লইয়া পৃথিবীর দুই প্রান্তে টিকিয়া আছে। ভাবিলেও আশ্চর্য বোধ হয়। আমার একটা অনুরোধ বাবা—আমি পাশ করিয়া চাকরি করিব না। গবেষণা করিব—

ওগো। কীসব খটোমটো কথা লিখেছো। দীনু আমাদের বড় হয়ে গেল। তাই না?

এক কাপ চা দেবে?

নিশ্চয়ই। অমন করে বলছো কেন ওগো।

রাধা চা করতে গেলে বীরেন লুকিয়ে লুকিয়ে রাধার পিঠ পিঠের ভাঁজ ভালো করে দেখলো। বেণীটা আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে। ব্লাউজ আর বেণীর মাঝে একটি নরম লম্বা গলা। ওখানটায় যদি ইথিওপিয়ার সেরেটসে মাছি কিংবা ডোঙ্গড়গড়ের রক্তচোষা মশা বসতো—তাহলে খুব একটা খারাপ হোত না বলেই বীরেনের ধারণা।

মাঝে কোথায় যেন এই সেরেটসেদের কথা পড়েছিল বীরেন। বাংলা কাগজে? না, কোন ম্যাগাজিনে?

১৯৮৪ সালে সারা পৃথিবীর পেটের ভেতর জল নাকি শুকিয়ে আসবে। চাষবাসের জন্যে এত জল শোষা হয়ে গেছে! পৃথিবীর ফাঁকে ফোকরে জল জমতে সময় দেওয়া চাই। সে বছর খুব বড় একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কারণ জলের অভাবে চাষবাস লাটে ওঠার দফা হবে। তাই একসপার্টরা বলেছেন,

ফুড হ্যাবিট পাল্টাতে হবে।

তাঁদের প্রস্তাব—আফরিকায় প্রচুর বুনো মোষ রয়েছে। সেরেটসে মশার দাপটে ওরা অকালে পটপট মারা যাচ্ছে। এই মশা সাবাড় করে যদি ওই দুর্দিনের জন্যে ইথিওপিয়ার জঙ্গলে বুনো মোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা যায়—তাহলে অপর্যাপ্ত মোষের মাংস দিয়ে মানবসমাজের পেট ভরানো যাবে। এবারের মত মানব সভ্যতা টিকে যাবে। তাছাড়া হাই প্রোটিন! এটাও একটা অ্যাডভানটেজ।

বীরেন ভাবছিল, সে নিজে এক ঠিকেদারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কর্মী। ওভারসিয়াররা স্যার বলে ডাকে। কারণ, বীরেনের হাত দিয়ে ওদের জন্যে পারসেনটেজ ঘুষ যায়। আবার শালা পার্বনের মুখে উপহারও পাঠাতে হয় সরকারি ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, বড়বাবু—মায় খোদ মন্ত্রী অব্দি। ঠারে ঠোরে। কখনো হাবা। কখনো ন্যাকা সেজে। খোসামুদির ভঙ্গিতে।

১৯৮৪-তে দেখা গেল—একসপার্টদের কথা মত সত্যিই দুর্ভিক্ষ এসেছে। বীরেন তখন ওভারসিয়ারদের বাড়ি বাড়ি ইথিওপিয়ার উদ্বৃত্ত মোষের মাংস পৌঁছে দিচ্ছে। সবাই তোলা তোলা করে খাচ্ছে। ডালনা। কষা কষা। চাপ। কাবাব। দই-মোষ। কত কি।

রাধা চা নিয়ে এলে বীরেন জানতে চাইলো—আচ্ছা মাছির নাম যদি সেরেটসে হয় তাহলে মশার নাম সারাটসা রাখা যায়?

হঠাৎ ওদের নাম রাখতে যাবে কেন? চান করে আপিস যাও তো।

না—মানে আমি ডোঙ্গড়গড়ের কথা বলছিলাম—

দীনুর কথা না বলে কতকগুলো মশার কথা পাড়ছো এখন সাতসকালে? আপিসে গিয়ে দ্যাখো তো—লিভ ট্রাভেলের টাকা তুলতে পারো কিনা। তাহলে সাধককে নিয়ে চলো কোথাও বেড়িয়ে আসি আমরা।

যাবে? তাহলে চলো—আমরা সবাই মিলে খুলনা জেলা স্কুলে যাই—

আঃ! স্কুলে যেতে যাবো কেন। শুধু শুধু। তোমার কি হয়েছে বলতো? তাও খুলনায় যাওয়া কেন?

খুলনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর। ওয়াশিংটন, নিউদিল্লি, মস্কো, পারি, খুলনা, পিকিং—

থামো বলছি। আমি এখন খুলনার একটা কথাও শুনবো না।

বিশ্বাস করো রাধা। আমাদের স্কুলের মাঠে অনেকগুলো বকুল গাছ ছিল। ছিলো ইলেভেন সাইডেড্ দু' দুখানা মাঠ। একটা হরিতকি গাছের ছায়া এসে পড়তো হেডুর কোয়ার্টারের বারান্দায়। সে গাছে ইয়া লম্বা এক মৌচাক। আমরা অসাবধানে ঢিল ছুঁড়তাম। সেসব নিশ্চয় এখনো আছে। কোন গাছের শেকড়ে কোন দিন আমি একটাও উইপোকা দেখিনি।

পোকার কথা থামাও তো।

জানো রাধা। আমাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনুকূল মিত্তির-এর বড় মেয়ে গজিকোট খেলতো। আমি নাদুদির কথা বলছি—

কি নাম বললে ?

নাদু দিদি। হাঁটু ছাড়িয়ে ফ্রক পরতো। বিরাট ঘের। নাদুদি লম্বাও ছিল অনেকটা।

চুপ করো। আর শুনতে ভালো লাগছে না।

আমায় খুব ভালবাসতো নাদুদি। আমি বকুল ফুল কুড়িয়ে দিতাম। নাদুদি বুনো লতা দিয়ে মালা গাঁথতো। একদিন সাপ বেরুল বকুলতলায়। কি সাহসী। চেলাকাঠ দিয়েই নাদুদি পিটিয়ে মারলো সাপটাকে। বড়রা দেখে বললো, কি করেছিস নাদু। এ যে গোখরো। বড় হয়ে গেছিস। এখন আর আগানে বাগানে ঘুরিসনে। তাহলে তোর বিয়ে হবে না।

বিয়ে হয়েছিল ?

হ্যাঁ। বিয়ের পর বর নিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল। নাদুদিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু বরটা এত বিচ্ছিরি। হাফশার্ট হাফপ্যান্ট। পায়ে লাল কেডস। হাঁটু অব্দি হলদে মোজা। সবাই বলতো খাসমহল আমিন। টু পাইস নাকি ছিল। নাকের নিচে মাছিগোঁফ।

আবার মাছি ?

আমি অন্য কথা বলছি রাধা।

ছেলেবেলার কথা এত মনে থাকে তোমার ?

যার শৈশব নেই—সে যেন প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে না নামে।

তোমার ওসব খটোমটো কথা বুঝিনে। লিভ ট্রাভেল বেনিফিট কি আছে অফিসে আর দেখো তো।

দুপুরে অফিসে যাওয়া মাত্র সাইট ইঞ্জিনিয়ার ডেকে পাঠালো বীরেনকে।

মিস্টার দত্তগুপ্ত। একটা কঠিন কাজের জন্যে আপনাকে আমরা বেছে নিয়েছি।

বীরেন মনে মনে বললো, এ আর নতুন কথা কি। ভগবানই আমাকে বেছে নিয়েছেন। নয়তো এখানে পাঠাতেন নাকি ?

মিস্টার দত্তগুপ্ত। আপনি জানেন বোধহয়—ক্যালকাটা আন্ডারগ্রাউন্ড ইজ মোস্টলি আনচার্টার্ড। মানে আমাদের এই মহানগরীর পাতালের অনেকটাই আমাদের অজানা। কোন রেকর্ডস নেই। যে যেখান থেকে পারে কাজ করে গেছে। আমাদের কোম্পানী এখন এই বিরাট শহরের নানা জায়গায় পাইপ বসাচ্ছে আপনি জানেন।

হ্যাঁ স্যার। আমিও দু একটা সাইটে গেছি।

রাইট। আপনাকে আরও যেতে হবে। কোম্পানীর স্বার্থে আমাদের আরও জড়িয়ে পড়তে হবে।

কোথায় ?

এই মহানগরীর পাতালের সঙ্গে।

ওঃ। কিন্তু পোকাগুলো ?

ওসব পোকা তো থাকবেই। মানুষের একসক্রিটস থেকে পোকা তো হবেই। কিন্তু এই ময়লাই কলকাতার আশপাশের ভেড়ির মাছেদের প্রধান ফুড মনে রাখবেন।

কিন্তু পোকাগুলো যদি ভেজে বা পুড়িয়ে—

তা কেন ? দরকার মত আমরা সাইটে স্প্রে করে ওদের মেরে ফেলতে পারি।

হাই প্রোটিন ?

কি বললেন মিস্টার দত্তগুপ্ত ?

হাইলি পয়জেনাস—। মানে বিষাক্ত।

বিষাক্ত ওষুধ স্প্রে না করলে তো ওদের মারা যাবে না। যা বলছিলাম। পাতালে রয়েছে অসংখ্য পাইপ। আগেকার গাঁথুনী করা নালী। এখনকার হিউম পাইপ কিছু লোহার নল। জলের লাইন। ইলেকট্রিসিটির লাইন। তারপর গ্যাসের পাইপ। ফোনের লাইন—উপরন্তু মেট্রো রেলের ভেনটিলেশনের লাইন যাবে। ভাবুন একবার।

এ তো স্যার কলকাতার নিচে আরেকখানা কলকাতা। বলতে পারেন—শেয়ালদা মেইন স্টেশন।

কিছু ভুল বলেন নি। কিন্তু এই পাতালের কোন ম্যাপ নেই। লোকেশন নেই। কী দেখে আমরা এগোবো জানি না। বিশেষ করে দুটো সাইটে আমাদের লোক পাইপ বসাতে গিয়ে টেলিফোন লাইন এমন বিকল করে ফেলেছে যে—আমরা দোষ স্বীকার করলে বহু টাকা গচ্চা দিতে হবে কোম্পানীকে।

কথা শুনতে শুনতে বীরেন দেখলো, এই উঁচু অফিস বাড়ির জানালা দিয়ে তার চোখের সামনে বিরাট এক চৌকো ময়দান—কয়েকটা গাছের মাথা—ফোর্ট সেনাপতির পতাকা পত পত উড়ছে। এই অবস্থায় সারা কলকাতা যদি পেঁছিতে পারতো। সবুজ। ছবির মত শান্ত। নির্জন। তাহলে হোতোই বা টেলিফোন বিকল। কি আর আসে যেত আমাদের।

আরেকটা সাইটে সারা লোকালিটির ইলেকট্রিক লাইন সর্ট সারকিট হয়ে বসে আছে। মিস্ত্রি কাজে নেমে সব ঠিক করবে। তারপর আমাদের লোকজন কাজে হাত দেবে। ইলেকট্রিক শকের ভয় তো আছে। ষোলোটা লোককে সাতদিন হোল বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে হচ্ছে। এম. ডি. বলছিলেন—কী কলোসাল ওয়েস্টেজ। সত্যিই তো। এই ড্রেনেজ আমাদের বন্ধ করতে হবে।

আমি ইলেকট্রিকের কাজ জানি না কিন্তু।

আপনি জানবেন কেন মিষ্টার দত্তগুপ্ত? এর চেয়েও বড় গোলমাল বাঁধতে পারে। গ্যাসের লাইন আছে। আছে তিনরকমের সুয়ারেজ। তার হেলথ হ্যাজার্ড। হয়তো কোন পুরনো সুয়ারেজ ফেটে গিয়ে খাবার জলের সঙ্গে মিশে গেল। তাহলে তো কেলেংকারী। বিধানসভার অধিবেশন চলছে এখন। অপোজিশন ব্যাপারটা একবার তুললে হয়। অনারেবল মিনিস্টার আমাদের টুঁটি টিপে ধরবেন তখন। কলকাতায় কলেরার এপিডেমিক লাগতে পারে। ধাঙড়রা সুযোগ বুঝে স্ট্রাইক করে ওয়েজ রিভিসন চাইতে পারে।

তাহলে তো মহা বিপদ।

বীরেনের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বললেন, বিপদ বলে বিপদ। সেই জন্যেই তো আপনাকে ডাকা। আপনাকেই আমরা বেছে নিয়েছি। আপনি এ প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য কর্মী। আপনার আনুগত্য, আপনার নিরলস পরিশ্রম কোম্পানীর নজর এড়ায়নি। সময়মত কোম্পানীর দিক থেকে প্রসারিত স্বীকৃতির হাত আপনার সামনে এগিয়ে আসবে।

বীরেন তাকে আচমকাই থামিয়ে দিল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

থতমত খেয়ে সাইট ইঞ্জিনীয়ার বললো, কি কথা?

আপনার পাশের ওই টেলিফোনটা তুলে দেখুন তো।

কেন?

দেখুন না। বাইরের একটা লাইন চান।

সাইট ইঞ্জিনীয়ার আরও ঘাবড়ে গিয়ে বললো, কেন বলুন তো?

তুলুন না। বাইরের নম্বর চান একটা।

বাইরে কোথায়?

চান না হাওড়া এনকোয়ারি—

পি বি একসকে বলতেই ওপাশ থেকে হাওড়া এনকোয়ারি বললো, হাওড়া বলছি। বলুন?

সাইট ইঞ্জিনিয়ার কিছু না বলে—বীরেনের দিকে তাকালো। কি বলবো বলুন? কোন্ ট্রেনের টাইম জানতে চান?

না না। ওকে কিছু বলতে হবে না। দেখুন তো রিসিভারে কোন খারাপ গন্ধ পাচ্ছেন কি?

নাঃ। হপ্তায় একবার লোক এসে সুগন্ধী করে দিয়ে যায় তো।

সে গন্ধ এলে চাপা থাকতো না। তার মানে সুয়ারেজ লিক করেনি। সব ঠিক আছে।

সাইট ইঞ্জিনিয়ার চমকে ফোন নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। বীরেন বাধা দিল। করছেন কি? নামাবেন না। কান দিয়ে গন্ধ শোঁকা যায়? বাইরের লাইন

তো। কানের দিকটা মুখের কাছে আনুন।

সাইট ইঞ্জিনিয়ার বীরেনের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। বছর পাঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। একদম ঘাবড়ে গিয়ে কানের দিকটা মুখের কাছে আনলো। তার মানে?

এবার শুঁকে দেখুন তো। কোন খারাপ গন্ধ?

না একদম নরমাল।

তাহলে হাওড়ায় সুয়ারেজ ঠিক আছে। কোন লিক হয়নি কোথাও।

ইনজিনিয়ার রাগে রাগে ঘটাং করে রিসিভার নামিয়ে রাখলো। কি আবোল তাবোল বকছেন? যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। দরকার হলে আজই আপনাকে ওড়িশায় যেতে হবে।

শুধু শুধু কেন ওড়িশায় যাবো?

কারণ আছে। এরকম একটা একস্ট্রা অর্ডিনারি আপনার মত লোককেই আমরা বেছে নিয়েছি।

ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না! সেই থেকে শুধু পাঁয়তারা ভাঁজছেন।

আমি পুরো বিপর্যয়টা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাইছিলাম।

বলুন! তার আগে বলুন—কে কলকাতার পাতালকে ঠিকঠিক চেনে?

রাইট। আমিও এই পয়েন্টে এখুনি যাচ্ছিলাম। আপনি নিশ্চয় জানেন লাস্ট সেঞ্চুরিতে এই শহরে এক সময় পালকি চলতো।—যখন ঘোড়ার গাড়িও ছিল না।

তখন তো ডিঙিও চলতো।

আমরা জলপথে যাচ্ছি না এখন। আমি পালকিতেই থাকতে চাই মিষ্টার দত্তগুপ্ত। সেই পালকিও একদিন উঠে গেল। তখন আরও দ্রুতগামী যানবাহন এসে যাচ্ছে। কলকাতা বড় হচ্ছে। হগ সাহেব বাজার বসিয়েছেন। তিনিই মল্লিকবাড়ির নাবালকের সরকারী গার্জেন। তিনিই আবার শহরবাসীর সুবিধের জন্য মাটির নীচে ঢাকা নালীপথ তৈরী করাচ্ছেন। তখন কোন গন্ধ ছড়াবে না বাতাসে। জীবন আরও স্বস্তির হবে। সাহেবের সুপারভিশনে মল্লিক প্যালেসও তৈরী হচ্ছে। কিন্তু পালকি উঠে যেতে যারা বেকার হল—তারা কোথায় যাবে?

আমি তো তখন জন্মাই নি। আমি জানব কি করে?

তাহলে আকবরের কথা এলিজাবেথের কথা জানেন কি করে?

আমি কিন্তু খুব বেশি জানি না।

সাইট ইঞ্জিনীয়ার চোখ ছোট করে তাকাল খানিকক্ষণ। তারপর তোড়ে বলতে লাগল, জীবিকা অনুযায়ী কিছু কাগজপত্তর তো আপনাকে ঘাঁটতেই হবে। আমি বইখাতা নেড়ে-চেড়ে যা জেনেছি—তা হল—পালকি উঠে যেতে এই বেকার

লোকেরাই ঢালাওভাবে হগ সাহেবের কাছে কাজ পায়। হগ সাহেবই তাদের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেন। এরা অনেকেই ওড়িশা থেকে এসে এখানে থেকে গিয়েছিল। এরাই তখন কলকাতার প্রথম সুয়ারেজ গড়ে তোলার কাজে সামিল হল।

আসল কথাটা কি? সেইটে বলুন না?

কলকাতার পাতালটা—এদেরই বাপ থেকে ছেলে—ছেলে থেকে নাতির নখদর্পণে। এরাই জানে তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে বর্ষায় কতটা জল জমে। গ্যাসের মেইনটা কোথায় ওখানে? উনিশশো সাতাশে যে লোহার পাইপ বসেছিল—তার পাশে কি আর পাইপ বসাবার জায়গা আছে?

বেশ তো—

ওদের মাথার ভেতরেই কলকাতার পাতালটা খেলে ভাল। বাবার মুখে—ঠাকুর্দার মুখে শুনে শুনে এখন ওরা বলতে পারে—মেট্রো রেলের ভেন্টিলেশনের লাইন গ্যাস পাইপ থেকে দূরে রাখতে হবে। নয়ত 'মিশি যাইব'। এই এদের আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে।

কেন? ঠিকানা নেই?

আছে? ওরা এখানে ছিল একশো বছরের ওপর। যেখানেই থাকুক—সেখানে ওরা দলা পাকিয়ে থাকবে। জগন্নাথ দেবের পুজো-আচ্চা করবে। সাক্ষীগোপালের নামে পালা গাইবে। পুজো চড়াবে।

ওরা নেই সেখানে। আপনি একটু খোঁজ-খবর করুন। কোথায় যেতে পারে? এই কলকাতাকে ওরা ভালবাসে। এখানেও কোথাও ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। আবার দেশেও চলে যেতে পারে।

দেশের ঠিকানা?

কটকের কাছাকাছি গাঁয়ের লোক ওরা। পাশাপাশি কয়েকখানা গাঁ জুড়ে ওদের বসবাস। দরকার হলে আপনাকে সেখানেও যেতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে ওদের। জানতে হবে—কেন এত বছরের ডেরা ওরা পাল্টাল? প্রয়োজনে গভর্মেন্ট ওদের পাশে দাঁড়াবে। আশাকরি আপনাকে সব আমি বোঝাতে পেরেছি। ক্যাশে বলা আছে। আপনার দরকার মত টাকা তুলে নেবেন। ভাউচারগুলো অবশ্য রাখবেন। আজকাল জানেন তো অ্যাকাউন্টস কি জিনিস।

আমি যদি কটকের কাছাকাছি ওসব গাঁয়ে না যাই?

অফিস আপনাকে এ জন্যেই বেছে নিয়েছে। এখনকার ছেলে-ছোকরা তো বোঝেন আপনি। কেউ আপনার মত থরো নন। ওদের কলকাতার ঠিকানা আর কটকের রেলবাজার খাস স্টপ থেকে কী করে ওদের গাঁয়ে যেতে হবে—সবই টাইপ করে আপনার জন্যে রাখা আছে। আশা করি সাকসেসফুল হবেন।

বীরেনকে আর কথা বলতে না দিয়ে সাইট ইঞ্জিনিয়ার গট গট করে গিয়ে তার নিজের কিউবিকেলে ঢুকে পড়ল। ওসব ঘরে গিয়ে নিজের ঘূর্ণী চেয়ারে বসতে না পারা অব্দি ওরা ওদের পার্সোনালিটি ফিরে পায় না। বীরেন ম্যানেজমেন্টের ওপর একখানা বই পড়তে গিয়ে জেনেছে—একে বলে বিল্ট ইন পার্সোনালিটি। কিংবা এক কোটো ইন্সট্যান্ট ব্যক্তিত্ব!

অফিসের পর সন্ধ্যেবেলাতেই বীরেন ওদের ডেরায় গিয়ে হাজির হল। মন্দ লাগছিল না। ঘোরাঘুরির জন্যে নগদ সাড়ে চারশো টাকা। আর সাত দিন অফিসে যেতে হবে না। ফাইন!

এ জায়গাটা বীরেনের চেনা। ভবানীপুরে এক সময় যে ঘোড়ার আস্তাবল ছিল—তার পেছনে। কাছেই আশুতোষ মুখার্জির বাবার নামে রাস্তা। এখানে একটা চায়ের দোকান ছিল। এখন সেখানে রুপোর গয়নার দোকান। দোকানী রাজস্থানী কি বিহারী—দেখে বোঝা যায় না।

ওই চায়ের দোকানে এদিককার সবচেয়ে বড় জিলিপি আর সিঙ্গাড়া পাওয়া যেত। শীতের সময়ে—ফুলকপির। বীরেন খেয়েছে। দামও সস্তা ছিল। দোকানীও ওরাই কেউ ছিল। ভীষণ ভদ্র। সাতে পাঁচে থাকার লোক নয় ওরা। সন্ধ্যের পর দোকানে বসেই গান গাইত কজন মিলে। তার ভেতরেই সিঙ্গাড়া আসছে। চা দিচ্ছে। রীতিমত বড় খুরির চা।

খোঁজ করতেই রুপোর গয়নার দোকানী জানালো—পশুপতি তো? ওরা ডেরা তুলে দিল। পাড়ার মস্তানরা বড় জুলুম করত। আজ এই পুজো। কাল ওই পুজো। মোটা চাঁদা চাই। আমাকেই তো সেলামী দিতে হল এ ঘরের জন্যে।

কথা হচ্ছিল অবিশ্যি হিন্দিতে। তার স্যাম্পেল অনেকটা এরকম—

ও লোক কাঁহা যা সাকতে হ্যায়?

এ তো কোই আন্দাজ নেহি হ্যায়—

কোই দেশমে গিয়া হ্যায়?

এ ভি নেহি বোল সাকতা—করিব পশুপতি কা চাচা নীলমণি এক দফে কহত থা—ক্যা দেশ চলা যায়েগা?

আশপাশের অনেকেই বলল পশুপতি-নীলমণি নিয়ে ওরা জনা চল্লিশেক এখানে ছিল। তিন-চারটে বাড়ির একতলা জুড়ে। হয়ত বাড়িওলাদের মদত মস্তানদের পেছনে। নয়ত ওরাও গেল—ভাড়াটেও বসে গেল: মোটা সেলামী পেয়েছে নিশ্চয়।

বীরেন মনে মনে ভাবল—তাহলে এখন নীলমণি-পশুপতি অ্যান্ড কোংকে খুঁজে পাই কোথায়? কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে হয়। ফির এস। কলকাতা

শয্যাশায়ী। তোমাদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবে। হাতে টাকা না থাকলে জানাও। এম-ও যোগে টাকা যাবে। সত্বর ফিরে এসো। আবার চায়ের দোকান দাও। জগন্নাথের নাম গান কর। বড় বড় সিঙ্গাড়া বানাও। বড়বড়জিলিপি। কেউ যাতে মোটা চাঁদার জুলুম না করে তা আমরা দেখব। তোমরা করতাল বাজিয়ে সাক্ষীগোপালের পালা গাও। কিন্তু ফিরে এসো। তোমাদের মাথার ভেতরেই কলকাতার পাতালটা ভাল খেলে। তোমরা যদি আর না আস—যদি কলকাতার পিচরাস্তার মলাটের নিচের একশো দেড়শো বছর ভুলে যাও—বা গুলিয়ে ফেল —তাহলে—আমরা—এই মহানগরবাসীদের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে— একবার কি ভেবেছো ?

বীরেন অফিসের একখানা একশো টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো।

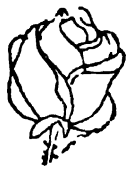

আমি জানিতাম—নারী মানে দেবী।

সেইভাবেই ভাবিয়া আসিয়াছি। ভালবাসা মানে—মায়াকাননের ফুল। দেখা যায়। ধরা যায় না। বলাও যায় না। জীবন করিতে গিয়া দেখিতেছি —ব্যাপারটি কিছু অন্য রকম। রাধাকে আমি ভালবাসিয়া বিবাহ করিয়াছিলাম। আমাদের বিবাহে কিছু লোক খাইয়াছিল। পাকা রুই হয়।

ফুলশয্যার রাত্রিতে রাধা কোন কথা বলিল না। চুপচাপ। হুঁ-হা দিয়া সে কাজ সারিল। বকিয়া মরিলাম আমি। কারণ আমি যে তাহাকে ভালবাসিয়া বসিয়া আছি। অনেক পরে জানিলাম—সে উহার ধার ধারে না।

আমাকে কেহ কিছু বলিয়া দেয় নাই। শিখাইয়া-পড়াইয়া তৈরি করিয়া দিবে—এমন কেহ আমার ছিলও না। তাই আনাড়ির মতই উত্তেজিত হইতাম। আনাড়ির মত নিস্তেজ হইয়াছি। এইভাবেই চলিতেছিলাম। অন্য দিকে কোন খেয়াল করি নাই।

যেদিন খেয়াল হইল—সেদিনই জীবনের নিদারুণ সত্য জানিলাম।

নারী—আদৌ কোন দেবী নহে। বরং রক্ত-মাংসের—যেন আরও বেশি করিয়াই।

রাধা কেন খিটখিটে এবং কেনই বা মোক্ষম সময়ে রসিকতায় ছুরিকাখানি অমন বাঁকাইয়া আমার চক্ষুর সামনে তুলিয়া ধরে—ইহা বুঝিতে বুঝিতে আরও জানিলাম—ভালবাসা অনেক পরে—দেবী প্রথমে মানবী এবং তাহাকে সেতার করিয়া বাজাইতে হইবে। সেই লহরায় তাহারই রাগ-অভিমান আগে খসিবে—তবেই না এই লহরা—একটি লহরার। নতুন নয়। অন্যথায় সবই বৃথা। দেবীতে কালি মারিয়া যায় তখন। ভালবাসা তখন পুষ্ট পুঁইবিচি।

ইহা জানিতে পারিয়া মনে আমার আর শান্তি নাই। জীবনটাকে ভাবিয়াছিলাম দর্শন। ঘটনাচক্রে হইয়া দাঁড়াইতেছে ময়লাপোতা।

এই নামে খুলনা শহরের প্রান্তদেশে একটি ভাগাড় ছিল। শহর আর বেনেখামার পল্লীর সংলগ্ন। ছাই গাদা, শুয়োরের পাল, খেজুর গাছ আর পুরীষ প্রক্ষেপের নালা। অবশ্য কিছু দিন পরেই সেই সব নালা মাটিতে বোঝাই হইয়া যাইত। পুরীষ কিছুদিন পরে মাটি হইয়া যায়। চাষীরা আসিয়া কোদালে কাটিয়া সেই মাটি লইয়া যাইত। ভাল ফসলের জন্য।

আরও অন্য সব জায়গায় দেখিয়াছি—এই ভাগাড়ের নাম—ছাইগাদা। কলকাতার ছাইগাদার নাম ধাপা। এখন আমার নিজের জীবনকে ধাপা মনে হয়। কী আর থাকিল এই জীবনে। ভালবাসা যদি লহরা হইয়া দাঁড়ায়। দেবী যদি চাটি মারিবার ডুগি তবলা হয়—আর ভালবাসা শেষ পর্যন্ত জীবনের সব কটি কঠিন অঙ্ক কষিবার কসরৎ হইয়া পড়ে—তবে জীবনে সুখ কোথায়?

আমার এখন শান্ত নির্জনে পাখি হইয়া উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কেন না জানি আজও গভীর রাতে সেই ছুঁচো কয়টি স্বাধীনভাবে আমার ঘরের মেঝেতে ঘুরিবে। খুটখাট জিনিসপত্র দাঁতে কাটিবে। অন্ধকারেই বুঝিতে পারিব—টেলিফোনের রিসিভারের পাশে দুই কুচি নীল চোখ জ্বলিতেছে। কিংবা ছুঁচলো মুখে বসান দুইটি চোখ—দুইখানি নীল কুচি হইয়া জ্বলিতেছে। অর্থাৎ আমায় দেখিতেছে। ইচ্ছা করিলেই খাটে উঠিয়া আমার পায়ের আঙুল আলু জ্ঞানে দাঁতে কাটিতে পারে। তবু রাধা আলুর চপে বিষ দিয়া ফাঁদ পাতে না। বাথরুমে এখন যদি গিয়া আলো জ্বালি—তো পলায়নপর আরশোলাগুলি ঝাঁঝরির দিকে যাইতে যাইতে থামিয়া দাঁড়াইবে। উহাদের ভায়রা ভাইগুলি এই রাস্তাঘাট, ফুটপাতের মলাটের ওপারে স্থির হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যে কোন দিন গৃহস্থ বাড়িগুলির ঝাঁঝরি দিয়া ঢুকিয়া সারা কলিকাতা মাড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। রাধা তো অন্তত এই আরশোলাগুলিকে স্প্রে করিতে পারে।

এরূপ অবস্থায় পশুপতি আর নীলমণি নিরুদ্দেশ। উহাদের পুরা দঙ্গলটি যে কোথায় উধাও হইল? মেট্রো রেলের নিঃশ্বাস ফেলিবার গলি-ঘুঁজিগুলি পাইপের গোলমালে যদি বুজিয়া যায়। উঃ। আমি আর ভাবিতে পারিতেছি না। ভালবাসার এই হাল। কলকাতার এই হাল। আক্রমণোদ্যত শত শত কোটি পোকা রাগে থম থম করিতেছে।

আমার এখন শান্ত নির্জনে পাখি হইয়া উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কোথায় যাই? একবার ইচ্ছা করে খুলনা জেলা স্কুলে যাই। সবগুলি জানলাই ফ্রেঞ্চ উইনডো। শিক নাই কোন। ভাবি—একবার আমি পাখি হইয়া ক্লাস থিতে ঢুকি। বাঁ দিকের থার্ড বেঞ্চে বসি। সন্ধ্যায় সারা শহরে ব্ল্যাক আউট। সকালে রোদ হাসে। দিন দুপুরে এ আর পি নকল আগুন নিভানোর মহড়া দিতেছে।

যদি আরেকবার। জীবনে আরেকবার—

কি হোল? আবার ডাইরি লিখছ বসে বসে? আলো নেভাও। আমার একটু যদি ঘুম হয়।

তুমি ঘুমোও নি রাধা?

ঘুমোতে দিলে কোথায়। আলো নেভাও।

নেভাচ্ছি। বলে খুব লজ্জার সঙ্গে বিনীতভাবে বীরেন নিজের ডাইরিখানা বিছানায় দাঁড়িয়ে মাথার কাছের তাকে তুলে রাখল। আজ প্রায় এক বছর পরে সে আবার ডাইরি লিখেছে।

মশারির ভেতর ঢুকতেই রাধা বেড সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে দিল। নেটের মশারি। কয়েক জায়গায় ছারপোকা আর মশা টিপে মারার কালো রক্তের দাগ। আলো নিভলেও কালো দাগগুলো চোখের সামনে থেকে যায়। এটা লক্ষ্য করে দেখেছে বীরেন।

টেবিল ল্যাম্প ইউজ করলে পারো।

একটা কিনতে হবে রাধা।

এতক্ষণ কারেন্ট, কালি, কাগজ নষ্ট না করে যদি দীনুকে চিঠি লিখতে—তাহলে অনেক ভালো হোত।

ও এখন কোন ক্যাম্পে আছে—জানি না তো আমরা। ডোঙ্গড়গড় তো ওরা ছেড়ে গেছে।

তুমি আবার ডাইরি লেখো কেন!

এমনি। ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে—তাই।

কে পড়বে ওসব লেখা?

কেউ না রাধা। হয়তো আমিই পড়বো বিশ বছর পরে। তখন এই এখনটা মনে পড়বে।

বিশ বছর বাঁচবো আমরা আর ?

জানি না। বেঁচেও যেতে পারি হয়তো রাধা।

সে বাঁচার কোন মানে হয় না। বাত, কাশি, চোখে ছানি। আচ্ছা ?

কি রাধা ?

তুমি তো বিখ্যাত লোক নও। তুমি ডাইরি লিখে কি আনন্দ পাও ? তোমার মৃত্যুর পরে তো কেউ আর ও ডাইরি ঘেঁটে দেখবে না। বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের অপ্রকাশিত ডাইরি নাম দিয়ে কোন কাগজে তো ও ডাইরি ছাপা হবে না। তাহলে ওসব লেখা কেন ?

সব কেনর জবাব নেই রাধা। ধরো—কোনদিন সাধন আর দীনু তো তাদের বাবার ডাইরি দেখতে পারে ?

দেখে হাগবে ! তারা দানে—তাদের বাবা কি !

ওঃ ! তাই বুঝি। ধরো—তোমারও তো দেখার ইচ্ছে হতে পারে ?

শুধু শুধু ইচ্ছে হবে কেন ? আমি তো জানি তুমি কি ?

ঠিক ঠিক জানো রাধা ? আমি কে ?

অত ধাঁধার কিছু নেই। অফিস অনুগত একটি বাঙালী প্রাণ তুমি। রোজ সকালে তিনশো গ্রাম কাটা পোনা কেন। সাতশো আলু। পাঁচ পয়সার কাঁচা লঙ্কা আর একটা পাতি লেবু।

আমি কি শুধু এই রাধা ? ধরো আজ থেকে তিনশো বছর পরে যদি কেউ আমার ডাইরি দেখে এখনকার মানুষের ভালবাসার একটা চেহারা পায় ?

ভালবাসা ? তুমি ? হাসালে। সত্যি আমি না হেসে পারছি না।

অন্ধকার মশারির ভেতর আটচল্লিশ ব্লেডের সিলিং পাখা হাওয়া পাঠাচ্ছিল। পাড়ার মোড়ে বেকারদের গুলতানী। কিছু জোর কথাবার্তা ভেসে আসছিল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সাইন বোর্ড থাকবে—দিনে তিন বার চোলাই অবশ্য সেবা। এখন যা মদ খাওয়া বেড়েছে। সবাই খাচ্ছে চারদিকে। এসব ভাবতে ভাবতেই বীরেন আবার বললো কলকাতার কথা জানতে হলেও তো—

সে জন্যে ইতিহাস পড়বে লোকে। তোমার ডাইরি ঘাঁটতে যাবে কোন দুঃখে। তুমি কি ডাইরিখানা আমাদের জাতীয় সরকারকে উপহার দিয়ে যাচ্ছো !

এ কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই বীরেন বললো, ধরো—

কি ধরবো ? তোমার আছেটা কি ?

আমি তো একটা মানুষ। আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম রাধা।

সে সব কবে ভুলে গেছি।

ধরো এখনকার এই সভ্যতাই মুছে গেল।

তুমি বলছো মহেঞ্জোদাড়ো হয়ে যাবে কলকাতা···?

হ্যাঁ। কলকাতার আন্ডার গ্রাউন্ড যদি এলোমেলো হয়ে যায়। যদি পাতাল থেকে কোন আক্রমণ আসে রাধা ?

ভূমিকম্প ? জলোচ্ছ্বাস ? সমুদ্র এগিয়ে আসবে ?

ধরো—তার চেয়েও বড় কিছু। ধরো মাটির নিচের সব পোকা যদি একদিন ওপরে উঠে এসে সবাই মিলে—শত শত কোটি পোকা—এক সঙ্গে কলকাতাকে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায় ?

পোকারা ম্যানহোল খুলতে পারে না।

যদি ঝাঁঝরি দিয়ে আসে রাধা ?

যত পোকা বললে—অত কোটি পোকা সরু ঝাঁঝরি দিয়ে আসতে অন্তত এক হাজার বছর সময় নেবে। আর তার আগেই ওদের আমরা একা একা পেয়ে মেরে ফেলবো। প্রয়োজনে খেয়েও ফেলতে পারি। যে রেটে মাংসের দাম বাড়ছে—

এখন কত ?

পঁচিশ টাকা কেজি। আর তোমার কথা মত এ সভ্যতা যদি মুছে যায় পোকার দাপটে—তাহলে তো আমাদের বর্ণমালাও মুছে যাবে। তিনশো বছর পরে কে তোমার ডাইরির মানে বুঝবে ?

ধরো রাধা—

আমি কিছু ধরতে চাই না। কাল তুমি কটক যাচ্ছো। সাধনের পরীক্ষা আছে। সকাল সকাল উঠতে হবে। তুমি বরং আমায় একটু ধরো।

বীরেন ধরে দেখলো। রাধার শরীরটা একটু গরম। তির তির করে কাঁপছে। রাধা খুব আস্তে বললো, কোন তাড়াহুড়ো নেই। এটা তোমার নিজের বিছানা। আমি তোমার বউ। ধীরে সুস্থে এগোও।

মানব সভ্যতার পতনের মূল এখানেই নিহিত। বলতে বলতে বীরেন দেখলো বিষাদ এসে অন্ধকারে ভিড় করছে।

আবার খটোমটো কথা ? ঝামরে উঠেই রাধা বহুকাল পরে নিজের থেকে বীরেনকে একটা চুমু খেল।

তাতে বীরেন রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। রাধাকে জড়িয়ে দেখলো—কোন শেষ নেই। অমনি রাধা বললো, উহু। অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই, এটা তোমার নিজের ঘর। তুমি এখন নিজের বিছানায়। আমি তোমার বউ। অন্য কিছু মাথায় এনো না। লক্ষ্মীটি! আজকের এই সময়টা অন্তত।

সেফ সাইডে থাকার জন্যে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত তার এই মধ্যবয়সে সুদূর অতীতের ক্লাস নাইনে চলে গেল। খুলনা জেলা স্কুলে। থার্ড পিরিয়ডে। নন্দবাবুর ক্লাশ। চৌবাচ্চার অঙ্ক। একটা নল দিয়ে ঘণ্টায় এত জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা নল দিয়ে ঘণ্টায় অত জল চৌবাচ্চায় ঢুকছে। চৌবাচ্চা ভর্তি

হতে কত ঘণ্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড লাগবে ?

মাথা থেকে সব বের করে দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত শুধু চৌবাচ্চা ভরে যেতে লাগলো।

অন্ধকার মশারি আরও অন্ধকার হয়ে গেল। লক্ষ্মীটি—বলে খানিক বাদে রাধা আজ আবার একটা চুমু খেল বীরেনকে। আজ যে তুমি কি ভালো—

রাধার কথা জড়িয়ে গেল। আর শেষ করতে পারলো না।

একদিনে দু দু'বার। তাও নিজে থেকে। বীরেন রিপ্লাই দিতে একদম ভুলেই গেল।

এই তো চাই! সব সময় মনে করবে—এটা তোমারই ঘর। আমি তোমারই বউ। অন্য কিছু মাথায় ঢুকতে দেবে না এ সময়ে। আজ তুমি কথা রেখেছো। লক্ষ্মীটি—

এসব শুনে বীরেন নিজের মনের ভেতরে খুক খুক করে হাসতে লাগলো। এ ঘর আমার? কোথায়! সে কথা তো আমি আদৌ ভাবিনি। রাধা তুমি আমার বিয়ে করা বউ। একথা তো আলাদা করে ভাবিনি আমি। এ বিছানা আমার? একথাও তো ভাবতে দিইনি আমার মাথাকে। লক্ষ্য করে দেখেছি—তোমার কথা তোমার শরীরের ওম্ তোমার শরীর—আর কাজে কাজেই সেই গরুচোর ভালবাসাটির কথা এ সময়ে মনে পড়লে আমি এতটাই অসতর্ক হয়ে পড়ি- যার দরুন শেষ অব্দি তুমি তৃপ্তি পাও না। তাই আজ তোমার কথা মত এখন আমি যা করলাম—তার নাম চৌবাচ্চার অঙ্ক। এর সঙ্গে ভালবাসা শরীর জীবনের যোগাযোগ নেই। পুরোটাই তোমার চিন্তা থেকে—ভালবাসা থেকে দূরে থাকার জন্যে অন্যমনস্ক হওয়ার এক বিশাল ব্যায়াম বা চৌবাচ্চা ভরাটের বিপুল অ্যারিথমেটিক। মনে রাখতে হবে—এই একই চৌবাচ্চার আরেক নল দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। আসলে ওটা চৌবাচ্চাই নয়। এ হোল গিয়ে জলের খেলা।

রাধা। এই রাধা?

উ।

ঘুমিয়ে পড়লে এরই ভেতর?

রাধা জড়ানো গলায় কোন রকমে বললো, আরও ডাইরি লেখো। লিখে যাও। যত ইচ্ছে—

এবার বীরেন নিজের ঘরে—নিজের বিছানায়—নিজের বউয়ের পাশে একদম এক হয়ে গেল। সে এখন একা তার বউকে ভালবাসতে চায়। চাপ চাপ বিষাদ সরিয়ে দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত তার ঘুমন্ত পত্নী রাধারাণী দত্তগুপ্তের কপোলে অন্ধকারে একটি অস্পষ্ট চুম্বন রাখলো।

তারপর নিজের মাথার নিচের উপাধানে মাথাটি রেখে চুপচাপ সিলিংয়ের

দিকে তাকিয়ে থাকলো। একটা সুবিধে--এখন রাধা ঘুমোচ্ছে।—ঘরের সিলিং বা মশারির সিলিং—কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

বীরেন্দ্রনাথ নিজেই বলে থাকে—আমি বেশী বই পড়িনি। তার এই স্টেটমেন্ট কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না। সবাই জানে।

কিছু ডেভিড কপারফিল্ড। কিছু কাশীরাম। সীতারাম। সন্দীপ। সুরেশ, অচলা। কয়েকখানা অশোক গুহের বঙ্গানুবাদ। তারপর চটি চটি—একটু সার্ত্রের গল্প। একখানা জন ডস পাসোস। ফ্রাঁসোয়া সাগা। পুরানো কলিকাতার ইতিহাস। দি নেকেড্ এপ। ইছামতী। ব্যাস। দু'একখানা বোধহয় বাদ গেল। সব নাম মনে পড়ে না একসঙ্গে।

ফ্রাঁসোয়া সাগার লেখা এ সারটেন স্মাইল পড়েছিল—সে অনেক আগে। লেখিকা সম্ভবত বীরেনেরই বয়সী। কোন কাগজে দেখেছিল—এখন সে জ্বরি হয়। সিনেমা উৎসবের।

কেন এই সময় হঠাৎ সাগার কথা মনে পড়লো। আরও অনেক বইয়ের কথা মনে পড়ছে বীরেনের। সাগার নায়িকা রোগা। তাকে মোটা হওয়ার জন্যে পাউরুটি খেতে বলা হচ্ছে। সে যে ছেলেটির সঙ্গে প্রেম করে—সেই ছেলেটি শরীর চর্চা করে। সুইমিং পুলে ছেলেটি মেয়েটিকে বললো, দেখেছো আমার ফিগার। দ্যাখো কি সুন্দর মাসল আমার।

মেয়েটি ভালবাসতে গিয়ে দেখলো—ছেলেটি নিজের শরীরকেই বেশি ভালবাসে। তখন সাগার নায়িকা একদিন ছেলেটির খুড়োর সঙ্গে শুয়ে পড়লো। খুড়ো মধ্যবয়সী। খাটে ওঠার সময় খুড়ো এত সুন্দরভাবে পাজামাটি মেঝেতে ছেড়ে রেখে আসে। সে কথা ভাবতে ভাবতে খুড়োর জন্যে নায়িকার মনে প্রেম এল।

কে?

আমি জাঁ পল সার্ত্রে।

কি চাই?

তুমি আবার আমার ইনটিমেসি গল্পটা পড়ে দ্যাখো। তোমার পড়ে দেখা দরকার।

বীরেনের সন্দেহ হোল। আমি কি স্বপ্ন দেখছি! ঘুমিয়ে আছি? না, জেগে আছি? ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। সে কোনদিন সার্ত্রের কোন ছবি দেখেনি। চেহারাটা অচেনা।

মুখে বললো, পড়েছি। আপনার হিরো তার বউকে খুব ভালবাসতো। বউ চাইতো শরীর সমেত ভালবাসা। সেটা ভালভাবে পারতো না আপনার হিরো। তখন তাকে ছেড়ে বউ আরেকজনকে ধরলো। সেই আরেকজন রীতিমত দক্ষ। এই দক্ষতাই বউয়ের মনে বিরক্তি, ঘেন্না ধরালো। দক্ষতার ভেতর শরীর

নিয়ে একটা যান্ত্রিক সাফল্য আছে। এই যন্ত্রবোধ বউকে অসুস্থ করে তুলতো। সে তখন আবার স্বামীর কাছে ফিরে গেল।

ঠিক বলেছো।

আপনি কিন্তু একটা কথা বলেননি।

কি বীরেন?

ভালবাসা আসলে দখলের ইচ্ছে। একজনকে আরেকজনের অধিকারের ইচ্ছে। চক্ষু লজ্জায় তার নাম বলি ভালবাসা।

এসব কথা আমার গল্পটায় আছে বীরেন।

উহু নেই।

ইমপ্লায়েড অবস্থায় আছে বীরেন।

আরেকটা জিনিস আপনি ভেবে দেখুন সার্ত্রে মশাই। পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী একভাবে উপগত হয়। আর আমরা মানুষেরা? মানে আমরা মানুষ নামে জন্তুরা?

আমাদের মাইন্ড আছে বীরেন।

তাই আমরা মুখোমুখি উপগত হই। তাই বোধহয় দখলের অধিকার ফলাতে আমরা শরীরটাকেও বড় বেশি করে সঙ্গী হিসেবে দাবি করি।

এজন্যে একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য চাই বীরেন।

নৈপুণ্যের আরেক নাম দক্ষতা। আর আপনিই তো লিখেছেন—দক্ষতার ভেতর যান্ত্রিক সাফল্য রয়েছে—যে-সাফল্য বিরক্তি জন্মায়—ঘেন্না তৈরি করে। যন্ত্রবোধ ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা দেয়। তখন ভালবাসার ভেতর থেকে দখল, অধিকার—উঁকি দিতে থাকে।

তখন জীবন শুকিয়ে যায় বীরেন।

বীরেনের নাক আসলে তখন গর্জন করছিল। ডাক্তার বলেছে—পলিপাস হয়েছে। ছোট্ট একটা অপারেশন দরকার। কিংবা হোমোপ্যাথি তিনমাস। একটানা। আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

রাধার ঘুম ভেঙে গেল নাকের ডাকে। সে উঠে গিয়ে পাশের ঘরে সাধনের সঙ্গে শুয়ে পড়লো। ছোট ছেলেটা কয়েক বছর হোল একা শোওয়া অভ্যেস করেছে।

রাত পৌনে চারটেয় বীরেনের ঘুম ভেঙে গেল। সে হিসেব করে দেখলো, ঠিক তিন ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট একটানা গাঢ় ঘুমে ঢলে পড়েছিল। যাকে বলে নিশ্ছিদ্র ঘুম। স্লাম্বার। একটুও ক্লান্তি নেই শরীরের কোথাও।

এখন সে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে অন্তত আধঘণ্টা হাঁটবে। রোজকার মত পাতাল রেলের লোকজনকে আলো জ্বালিয়ে কাজ করতে দেখবে। কুমড়োর ঝাঁকা যাবে ফিকে অন্ধকার মাখানো রাস্তা দিয়ে। গায়ে ঘাম ফুটে উঠলে ফিরে

আসে বীরেন রোজ। এই হাঁটাটুকু তাকে তাজা রেখেছে। একটু পরেই কাছাকাছি কোন্ মসজিদ থেকে মাইকে আজান ভেসে আসে। শেষরাতে সারা শহরে শুধু এইটুকুই আলো ছড়িয়ে পড়ার আগে আগে অনেকদূর অব্দি ছড়িয়ে যায়।

আজও আজানের সুর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। বীরেন হাঁটতে হাঁটতে পাতাল রেলের লোহার জালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। নিচে জোরালো আলোয় ইস্পাতের বীমগুলোয় রিপিট মারা হচ্ছে। অল্পবয়সী একজন—ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে—তার কাছে বীরেন জানতে চাইলো, এতটা গর্ত খুঁড়ছেন? পাশের এসব ফ্ল্যাট-বাড়ি হেলে পড়বে না তো?

ছোকরা তাকে ভ্রূক্ষেপই করলো না।

বীরেন তখন আরেকটু এগিয়ে আরেকজনের কাছে গেল। লোকটা মিস্ত্রি মত। হাতে একখানা হাল্কা যন্ত্র। হ্যাকসো হয়তো। এরকম জিনিস বীরেন আগে কোনদিন দেখেনি। জলের পাইপ, টেলিফোন লাইন—সবই তো দফারফা অবস্থা?

লোকটি অবাক হয়ে তাকালো যেন! তা হবে কেন? আমরা সব বাঁচিয়ে কাজ করছি।

এক লাইন জুড়তে গিয়ে আরেক লাইন যদি কেটে যায়—

রিপেয়ারের করিডর রাখা হচ্ছে।

পরে মনে থাকবে?

আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড কলকাতার ম্যাপ তৈরি করাচ্ছি। একটু থেমে লোকটি বললো, পাবলিক এই ভয় পাচ্ছে—আমরা জানি। কিন্তু অত ভয়ের কিছু নেই আসলে।

বীরেনের একদম বিশ্বাস হোল না কথাটা। এমনিতেই এ লাইন সে লাইনে গোলমাল হয়ে যায়। তারপর আবার মেট্রো রেল। তার সিগন্যাল, ব্লক, রিলে ভেন্টিলেশন—কত কি। গোলমাল হবে না মানে!

আরও খানিকটা এগিয়ে বীরেন একদম অন্ধকারের ভেতর পড়ে গেল। কাজ হবে বলে মেট্রো রেল সবে ঘিরে রেখেছে। এখনো খোঁড়াখুড়ি শুরু হয়নি। ঢেউ টিনের ঘেরের ভেতর থেকে জাঙ্গিয়া পরা দুই ছোকরা বেরিয়ে এলো। হাতে ছুরি। একদম সামনে এসে বললো, চেঁচালেই পেটে বসিয়ে দেব। হাতঘড়িটা দিন-তো আগে—

একদম চমকে গেল বীরেন। বাড়ির এত কাছে ছিনতাই হয়ে যাবে? ভাবতেও পারেনি বীরেন।

লিক লিক করছিল দুটো অন্ধকার। বীরেন ধা করে সামনেরটার পেটে এক লাথি কষালো। অমনি বাবাগো বলে সেই অন্ধকারটা টিনের ঘেরে শব্দ করে

ঢলে পড়লো। বীরেন তক্ষুণি একটা চড় কষালো বাকি অন্ধকারকে। সে-ও ঘুরে পড়লো।

ছুটে গিয়ে বীরেন তাদের সামনে দাঁড়ালো। কাউকেই উঠতে দিলো না। এত সাহস? আমাকে ছুরি দেখানো? বলতে বলতে বীরেন ওদের পালা করে লাথি, কিল, ঘুষি দিতে লাগলো।

একজন অন্ধকার তো কেঁদে কঁকিয়ে উঠলো। ছেড়ে দিন বাবু। আর কোনদিন করবো না।

আরেকটা লাথি।

উঃ। বাবাগো। মেরে ফেলুন বাবু। মেরে ফেলুন আমাকে—

আর কোনদিন করবি এমন?

কোনদিন না।

যাঃ। পালা। ছোট্। কোনদিকে তাকাবি নে—সোজা ছুটে যা—

পাই পাই করে দুটো লিকলিকে অন্ধকার আরও অন্ধকারে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তখন বীরেন হিসেব করে দেখলো আধঘণ্টার হাঁটা হাঁটতে যেটুকু ঘাম ফুটে ওঠে গায়ে—তা অলরেডি হয়েছে। অতএব—আজ আর হাঁটারই দরকার নেই। একেই কি যান্ত্রিক সাফল্য বলে? নৈপুণ্য? দক্ষতা?

বাড়ি ফিরে বীরেন দেখলো তার ভাড়াবাড়িটা একদম ঘুমের দেশে আছে। যদিও রাধা এখন ওঘরে—তবু আলো জ্বালতেই জেগে যাবে ঠিক। তার চেয়ে—

আন্দাজে বুক র‍্যাক থেকে দু'খানা বই নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে বসলো বীরেন। বারান্দায় এখন ফুটি ফুটি আলো। ওপরের বইখানা বিভূতিভূষণের ইছামতী। পয়লা পাতাতেই লেখা—

১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েচে সবে।

পথঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। বিকেলবেলা ফিঙে পাখী বসে আছে বাবলা গাছের ফুল ভর্তি ডালে।

নালু পাল মোল্লাহাটির হাটে যাবে পান-সুপুরি নিয়ে মাথায় করে। মোল্লাহাটি যেতে নীলকুঠির আমলের সাহেবদের বটগাছের ঘন ছায়া পথে পথে। শ্রান্ত নালু পাল মোট নামিয়ে একটা বটতলায় বসে। গামছা ঘুরিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো।

বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত এইখানে থেমে আকাশে তাকালো। তারাগুলোর সব তখনো মোছেনি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে একদিন খুলনা জেলা স্কুলের ক্লাশ থ্রি-তে বসে সে শুনেছিল—বাংলা ১২৭০ সনে প্রচণ্ড বন্যা হয়েছিল। কোন্ স্যার যেন বলেছিলেন। তিনি নাকি প্রত্যক্ষদর্শিনী তাঁর কোন্ ঠাকমার মুখে সে বন্যার কথা শোনেন। পরে বীরেন—অনেকবার মনে মনে হিসেব করে

দেখেছে—ওই বন্যার সময় বিবেকানন্দের জন্ম হয়। জন্ম হয় তার নিজের দাদামশায়ের।

এই যে ক'মাস আগে শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৃষ্টি আর বন্যা হয়ে গেল—তার আগের সবচেয়ে বড়টা তাহলে ১২৭০-এ হয়েছিল? তখনকার পথের কাদা, ফিঙে পাখী, বাবলা ডালের ফুল কবে মুছে গেছে। বাতাসে লুকোনো রয়েছে তখনকার সব দাগ-দাগালী। নালু পাল, গাছের ছায়া, ঘুরন্ত গামছার বাতাস—সবই এই পৃথিবীর বাতাসে—ধুলোয় চাপা পড়ে আছে। চেষ্টা করলে খুঁড়ে বের করা যায়। কিন্তু কি হবে? সময়ের ভেতর সবই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে আছে।

আমার আজ ভোরের ব্যাপারটাও তো সময়ের ভেতর জায়গা করে নিয়েছে এতক্ষণে। নানা ঘটনার গুঁড়ো দিয়ে দিয়ে সময় তৈরি হয়। দুটো লিক লিকে অন্ধকার আরও গাঢ় অন্ধকারে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যেমন এখন আলো ফুটে ওঠায় তারাগুলো মুছে যাচ্ছে। চাঁদের এখন শুধুই আউটলাইনটা পড়ে আছে আকাশে। এ কি আলোর নৈপুণ্য? না, অন্ধকারের দক্ষতা?

এইতো সেদিন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বৃষ্টি—বড় বন্যা গেল। সরকারী হিসেবেই সাত-আটশো মানুষ সাবাড়। ১২৭০-এ না জানি কত সাবাড় হয়েছিল। কত ইচ্ছা, কত হাসি, কত কলরোল সময়ের দাঁতে, বন্যার দাপটে শেষ হয়ে গেছে। বীরেনের তবু মনে হয়—এই বাতাসেই সেই ইচ্ছা, সেই কলরোল মিশে আছে। সময় শুধু চাপা দেয়। মুছতে পারে না পুরোপুরি।

আকাশ বেশ ফরসা হয়ে আসছিল। আজই বীরেন কটক যাবে। পশুপতি-নীলমনিদের খোঁজে। অন্য বইটা নাড়তেই দেখলো, পাতাগুলো ঝুরঝুরে। আগেকার টাইপে বইয়ের নাম—

পুরানো কলিকাতার ইতিহাস

বইটি ১৮৭৪ সালে ছাপা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় বীরেনের চোখ আটকে গেল।

কলিকাতা ময়দানে পুকুর কাটিবার সময় চার বা পাঁচ ফুট নীচে মৃত সুন্দরী বৃক্ষকে খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। ব্যাপকভাবে জমি বসিয়া যাওয়ার ফলে ইহা ঘটিয়াছে।

ফোর্ট উইলিয়মে ৫০০ ফুট গভীর কুয়া খননের সময় এমন কিছু নিদর্শন নীচে পাওয়া গিয়াছে—যাহাদের থাকার কথা ভূপৃষ্ঠে।

সম্রাট আকবরের সময় সমগ্র বাঙ্গালার উপর দিয়া ব্যাপক বন্যা বহিয়া যায়। জনপদ বনজঙ্গল ভাসিয়া যায়। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র ছিল না। অনেকের ধারণা—এই সময় সুন্দরবন সমেত ব্যাপক অঞ্চল মাটির নিচে বসিয়া গিয়াছিল।

বীরেনের মনে পড়লো, সে যখন খুলনা জেলা স্কুলের ক্লাস থিতে থার্ড বেঞ্চে বসে বাংলা ১২৭০ সনের বন্যার কথা শুনেছিল—তখনো এই বন্যার বয়স এখনকার মত এতখানি হয়নি—যাতে কিনা অতিরঞ্জন, দূরত্ব সব মিলিয়ে ১২৭০ ইতিহাসের গন্ধ আর রহস্য মেখে নিয়ে এতটা হয়ে উঠতে পারে।

রাধা ঘুমোচ্ছে। সাধন ঘুমোচ্ছে। কাজের লোক এখনো আসেনি। সকাল-বেলার আলোয় শীত থাকে। কাজের লোক এসে চা করবে বলে বীরেন সদর খুলে ভেজিয়ে রাখলো।

আকবরের সময় তুলসীদাস রামচরিত মানসের দোঁহা বাঁধছিলেন। সেক্সপীয়র তখন লেখেন এলিজাবেথের ভি ডি হয়েছে। ড্রেকের পালতোলা জাহাজ দার্দানেলসে। এমন সময় বান এলো। হয়তো ১৯৭৮-এর মত উত্তর ভারতে নাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই জল নদী বেয়ে চলে এলো দু'তিনদিনে। তারপর বিরাট উঁচু হয়ে জল যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো এখানকার ডাঙ্গায়—তখন জলের কোটি কোটি টন ওজনে মাটি বসে গেল। বসতি, মানুষজন, মন্দির, গাছ সমেত। খাড়াই গাছ কয়েকশো বছরে চাপা মাটির নিচে কয়লা হওয়ার পথে। এ যে একদম জ্যান্ত কবর। মাটি খুঁড়লে তাদের শেষ নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে আসে প্রথম।

আজই শেষরাতে যদি সারা কলকাতার ঝাঁঝরি দিয়ে এই মহানগরীর মলাটের ওপিঠের তাবৎ পোকা শহরে ঢুকতে থাকে—তাহলে কাল বেলা দশটা নাগাদ মাটির ওপরকার ঘরবাড়ি সমেত মাটি বসতে শুরু করবে। এ যে জলের চেয়েও বিপজ্জনক! কারণ জল তো দাঁড়ায় না। গড়ায়। বহে যায়। পোকা যে এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকবে।

শত শত কোটি পোকার চাপে জানাশোনা পৃথিবীটা তলিয়ে যেতে থাকবে। বোটানিক্স্ মাটির নিচে। সেই মাটির ওপর গঙ্গা ছলাৎ ছলাৎ। চিড়িয়াখানার বাঘগুলো দমবন্ধ হয়ে মরণ কষ্ট পেতে পেতে খাঁচা সমেত মাটির নীচে। ভিক্টোরিয়ার হাইডোম শুধু পরী সমেত বেরিয়ে থাকবে ওপরে। আমার ডাইরিখানা এ-বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবে। কি বিশাল মৃত্যু অসংখ্য অর্বুদ পোকার চেহারা নিয়ে কলকাতার মলাটের ওপিঠে থম থম করছে। ওরা শুধু স্যাম্পেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কলকাতার এপিঠে কিছু আরশোলা পাঠায় নিশুতি রাতে। আসাম কমানডো পার্টি। বীরেনের মনে হল—

এইভাবেই হয়তো ওরা আমাদের একটু একটু করে যাচাই করে আসছে। সামান্য সামান্য মৃত্যু আমাদের দিয়ে এইভাবে চাখিয়ে নিচ্ছে। তারপর একদিন আকবরের সময়কার বিশাল বন্যার মত থাক থাক পোকার চাপে মৃত্যু ঘনিয়ে আনার জন্যে ওরা নিজেরাই চেঁচিয়ে বলবে—গেট রেডি! হিয়ার ইজ ডেথ অ্যাট ইওর ডোরস্টেপস্। উই ডেলিভার ইন্সট্যান্ট ডেথ্। ডেথ বাই সাফোকেশন। চাপা দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু। পলকে মৃত্যু। মৃত্যু অবধি শ্বাসরোধ। তারপর তো অনন্ত অন্ধকার। এই সময়টায় পোকাদের আর ঝাঁঝরির চক্ষুলজ্জা থাকবে না একটু। পৃথিবীর মলাট নানা জায়গায় ফুটো হয়ে থাকে - আর সে সব ফুটো দিয়ে পোকারা গল গল করে মলাটের এপিঠে চলে আসবে।

কোথায় যেন শুনেছে—না পড়েছে—ঠিক মনে পড়লো না বীরেনের।

গত দশ হাজার বছর ধরে দক্ষিণ মেরুতে বরফের একখানা বিরাট চাঙ একা একা রওনা দিয়েছে। সাইজে তা ইউরোপের সমান। বছরে কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে আসছে। জলের নিচেই প্রায় তার সবটা। বাকিটা জলের ওপর। গতি বাড়লে মেরুর মায়া ছেড়ে এই অতিকায় যম সমুদ্রে গিয়ে পড়লে বরফ গলতে শুরু করবে। শুধু জলের ওপর জেগে থাকা বরফ গললেই সারা পৃথিবীর সমুদ্রের জল দুশো ফুট উঁচু হয়ে যাবে।

তার মানে এতকালের পৃথিবীর সবটাই কিছুকালের জন্য জলের নিচে চলে যাবে। সে কি অতিকায় বন্যা ভাবাই যায় না। যদি কেউ বেঁচেও যায়—ধরা যাক টি ভি টাওয়ারে উঠে—সে কি একা এই এতদিনের সভ্যতার কথা মনে রেখে তার নিজের জীবনেই অন্য কাউকে গল্প বলে মনে রাখতে বলে যেতে পারবে? যদি অবশ্য সে আর একজন বেঁচে যায়। তবেই সে আরেকজনকে বলে যেতে পারবে—

(ক) জানিস এখানে আগে সিনেমা হোত।

(খ) ভুলিস না—মানুষ এইভাবে কাঁদতো। মনে রাখিস কিন্তু। এবার আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি।

(গ) জানিস তো—এই পৃথিবীতে দুই রকমের জন্তু ছিল। মানুষ আর মেয়েমানুষ। একজন আরেকজনকে ভালবাসতো। এই ছিল নিয়ম।

বীরেন ঠিক করলো এখন থেকে সে পৃথিবীর গায়ে সব রকমের ফুটোর ওপর লক্ষ রাখবে। পারলে বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করবে। ম্যানহোলগুলোর কথা আলাদা। মানুষ পাতালের দিক থেকে নিজের বিপদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে কি করে যে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরি করে। যেদিন সর্বাঙ্গে কাঁটা বসানো বিপদ স্বয়ং ম্যানহোল খোলা পেয়ে মাথা তুলে বেরিয়ে আসবে—সেদিন কালোয়ারের দোকানে কাঁচা লোহার ঢাকনা বিক্রির টাকা কি বাঁচাতে পারবে

আমাদের ? ওই প্যালট্রি সাম! সমুৎপন্নে বলে কি একটা শ্লোক আছে না--

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো। পাছে রাধার ঘুম ভাঙে—তাই রিসিভারটা ছুটে গিয়ে তুললো বীরেন। কিন্তু কানে দিতে সাহস হোল না তার।

আলগোছে কানের দিকটা নাকের কাছাকাছি নিয়ে এলো। যা ভেবেছিল তাই। ফাট্টিসিক্স একসচেঞ্জের আন্ডারগ্রাউন্ড লাইনের সঙ্গে নিশ্চয় সুয়ারেজের লিক জায়গা জুড়ে গেছে। উঃ! কি বিচ্ছিরি গন্ধ। কেমন সন্দেহ হতে রিসিভারের কান দেবার জায়গাটা ভালো করে শুঁকলো বীরেন। হ্যাঁ, খারাপ গন্ধ বটে। তবে সুয়ারেজের নয়। এ নিশ্চয় ছুঁচোদের কাণ্ড। রিসিভারটা টেবিলের ওপর রেখে ঘরের একমেব নালির পাশে দাঁড়িয়ে গন্ধ টানলো বীরেন। ঠিকই ধরেছে। তরিতরকারির খোসা ডাস্টবিন থেকে টেনে এনে ছুঁচোরা এই নালির গোড়ায় জমিয়েছে। কয়েকদিন ধরে। তাদেরই পচা গন্ধ।

তাহলে ময়লা বোঝাই নালি একটাও ফুটো হয় নি এদিকে এখনো। হয়ে যাবে শীগগির। কেননা মেট্রো রেল তো আসলে কলকাতার পাতালটাকেই ভেঙে ফেলতে চায়। সে জন্যেই এত খোঁড়াখুঁড়ি। ঠিক সময়মত অজগর বেরিয়ে পড়বে। তখন আর কিছু থাকবে না। মাথার চুল ছিঁড়েও কিছু করা যাবে না।

টেবিলে শোয়ানো রিসিভারটা বেশ জোর কড় কড় করে উঠলো। খুব সাবধানে সেটা কানে দিতেই স্পীডে খানিক গ্যাস বীরেনের কানে ঢুকে তাকে কিছুক্ষণের জন্যে কালা করে দিল। গ্যাস মেইনটাই লিক হয়েছে।

তখন ওপাশ দিয়ে সাইট ইনজিনিয়ার বলছিল, এ কি ইয়ার্কি সাত সকালে ?—

ওঃ! আপনি ? বলুন।

ফোন হাতে নিয়ে চুপ করে ছিলেন কেন ?

শুনতে পাইনি।

আজ কিন্তু আপনি কটক যাচ্ছেন—

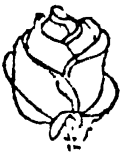

মহানদীর ওপর ব্রীজে উঠে ট্রেন আর এগোচ্ছিল না। পুরনো পোল। ইঞ্জিন খুব সাবধানে এগোচ্ছিল। কাঠের কামরায় জানলা দিয়ে অনেকটা জ্যোৎস্না। বাকি জ্যোৎস্না মহানদীর ধু ধু বালির চড়ায়। রাত আর নেই বলতে গেলে। ট্রেনটা থেমে গেল। ব্রিজের মাঝামাঝি।

জানলা দিয়ে বীরেন দেখতে পেল বালির ওপর হাত দিয়ে চারটে পোল আধখানা করে লাইন টানা হয়েছে। সে-লাইনে সুন্দর করে প্রদীপ বসানো। কাল সন্ধ্যে রাতে এখানকার কারা যেন নদীকে সাজাতে এসেছিল। জায়গাটা রেল কামরার পাদানী থেকে বড়জোর দোতলা নীচে। কাছাকাছি সামান্য জল। সে-জল বালিয়াড়ির অনেকটাই ভিজিয়ে নরম করে রেখেছে।

ব্রিজের গায়ে কোন রেলিং নেই। নদীর একদিককার তীরের গাছপালা আবছা অন্ধকারে জড়াজড়ি করে দাঁড়ানো। বীরেন টুপ করে কামরা থেকে নেমে নড়বড়ে ব্রীজের সরু করিডরে দাঁড়ালো। আর অমনি ট্রেনটা ছেড়ে দিল। বীরেনের কামরা থেকে এক প্যাসেঞ্জার চোখ বড় বড় করে তাকালো। পুবীর বাঙালী উকিল। সে তো একাই চেঁচিয়ে মাৎ করার জোগাড়। উঠে আসুন। শীগগির উঠে আসুন।

হাত নেড়ে বিদায় জানাতে বীরেনের খুব ভাল লাগছিল। সে নিজে কোনদিন এরকম বিদায় জানায়নি। এখন খুব ভোরবেলা। পৃথিবীর একএকটা জিনিস মাথা তুলে উঁকি দিচ্ছে। বীরেন বুঝলো, এই প্রথম সে তার নিজের জীবনে ফিরে যাচ্ছে। নয়তো আসলে তো সে এতকাল মৃত্যুর মত একটা জীবনে কাটিয়ে এসেছে। শেষ কামরার গার্ড বীরেনকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভূত দেখার মত উঠে দাঁড়ালো। হাতের সবুজ লাল কাঁচ লাগানো বাতিটাও খানিক উঠলো। সাউথ ইস্টার্নে এখনো অনেক বাঙালী। কি হচ্ছে? অ্যাঁ? কী হচ্ছে ওটা—

কয়লার বিরাট ইঞ্জিন তখন ব্রিজ ছাড়িয়ে নিশ্চিন্ত মাটিতে পড়েই বেশ ফুর্তিতে ছুটতে শুরু করেছে। খুলনা জেলা স্কুলের গায়ের একজোড়া নদী —কিংবা একটাই নদী—খানিক ছেড়ে খানিক তফাতে তফাতে একই জলধারার

দুই নাম। তাদের বুকের বালি দেখা যেত না। সে-নদীর চেয়ে এ-নদী বড়। তবে এর অনেকটাই বালির চড়া। দূরে যেখানটায় জল—তাতে কয়েকখানা ডিঙি।

এই আমার জীবন শুরু হোল। এই আমি জন্মালাম। নদীর এতখানি খোলা বুক। এত বিরাট এই আকাশ। তাতে রেলের ব্রিজটা কত বড়। আর আমি কিনা ভেবে আসছি—কলকাতার কি হবে? ভালবাসার কি হবে? পাতালের পোকাগুলো উঠে এলে কি হবে।

বীরেন নিচে জোলো জায়গা দেখে লাফ দিল। লিফটে উঁচু বাড়ি থেকে নামার সময় বুকের ভেতর যে ঝাঁকুনি হয়—তাই হোল এখন বীরেনের। একটু বেশি পরিমাণে। যত কম জল ভাবা গিয়েছিল ওপর থেকে—তার চেয়ে অনেক বেশি থাকায় বীরেন থেবড়ে গিয়ে পড়লো। গায়ে লাগলো না বিশেষ। কিন্তু নাকে ব্যথা পেলো। জল ঢুকে গিয়ে। আরও জল নাকে ঢুকিয়ে নিয়ে নাকের ব্যথা কমালো বীরেন। ধুতিটা সপ সপ করছে ভিজে। গায়ের কেম্ব্রিকের মোটা পাঞ্জাবীও ভিজে। এসব কোনদিকে নজর না দিয়ে বুক পকেট থেকে উড়ে পড়া দশ টাকা পাঁচ টাকার নোটগুলো জলের ওপর থেকে কুড়োতে হোল আগে। বড় করে সূর্য উঠছিল। পাতলা বাতাসে নুড়ি চাপা দিয়ে বালিতে নোট শুকোতে দিল বীরেন।

কাল রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে যারা কোন পুজো দিয়ে গেছে—তারা এখন এলে দেখতে পেত—নিভে যাওয়া প্রদীপের তেলে ওড়া বালি পড়ে কিচ কিচ করছে প্রদীপের খোল। মাটির তৈরি। রোদে শুকনো। তেল বলতে রেড়ি। তাতে পুরনো কাপড় ছিঁড়ে পাকানো সলতে। মাথা তুলে বীরেন দেখলো—কাছে পিঠে কেউ নেই।

খানিকক্ষণের ভেতর সূর্যটা লাফিয়ে আকাশে দেখা দিতেই পায়ের নিচের বালি তেতে উঠতে লাগলো। একটু পরে বীরেন বুঝলো, সে তো এক ভীষণ বিপদে পড়েছে। কোথাও ছায়া নেই। অচেনা জায়গা। নদীর গায়ে বসতিও নেই। শুধু রেলপোলের রোগা ছায়াটা একটু একটু করে জায়গা পাল্টাচ্ছে।

ঘণ্টাখানেকের ভেতর হই হই করে কয়েকখানা লরি এসে পড়লো। বালি তোলার লরি। সাত আটখানা। ঠিকেদারীর লরি হবে। তাদের লোকজন বীরেনকে দেখে অবাক। এরকম বাবু তো এখানে আসে না।

বীরেন খোঁজ খবর করে জানলো, কাছাকাছি ভদ্দরলোক থাকবার জায়গা—ব্রজরাজনগর। মাইল সাতেক হবে। সেখানকার সিমেন্ট কারখানার জন্যে এই বালি যাচ্ছে।

লরিওয়ালারাই বললো, সারাদিন এখানে থাকলে বালুর তাতে সন্ধ্যে নাগাদ আপনি বাবু রোস্ট হয়ে যাবেন। এখানে এলেন কি করে?

সত্যি কথাটা বলা যায় না। এখানে সব এত উদার। এত শক্তিশালী। কলকাতায় লালিত মানুষজন সুন্দর সুন্দর বলে খানিকক্ষণ প্রশংসা করতে পারে। কিন্তু থাকা সম্ভব নয় এখানে। সেই শক্তির সঞ্চয় নেই বীরেনের মত মানুষের ভেতর।

লরিতে উঠে বেলাবেলি রওনা দিল বীরেন। বালি বোঝাই লরি ছায়া ঢাকা হাইওয়ে দিয়ে বিজিং বিজিং বিজিং বিজিং শব্দ করে যায়। মাথার ওপর রেনট্রি, ক্যাসিয়া গাছের ডালপালার জড়াজড়ি। ব্রজরাজনগর ঢোকার মুখে একটা সাদা বাড়ির সামনে বীরেন নেমে পড়লো।

এখানে নামবেন? শহর কিন্তু এখনো দু'মাইল।

ঠিক আছে। দেখতে দেখতে চলে যাবো।

লরিটা চলে যেতে বীরেন এসে সাদা বাড়িটার সামনে দাঁড়ালো। বাংলায় লেখা—পর্ণকুটীর। লরির ড্রাইভারের পাশে বসেই চোখে পড়েছে বীরেনের। এখন বেলা একটা। সারা রাস্তা ছায়ায় ছায়ায় নন্দনকানন। পাতলা মিষ্টি বাতাস। মহুয়ার গন্ধ—মাইলের পর মাইল।

একজন ওড়িয়া হাটুরে যাচ্ছিল। খালি গা। পরনে ঠেঁটে ধুতি। গলায় মাদুলী। দুই বাহুতে চন্দন। চোখ কাজলের গর্তে বসানো। হাতে লম্বা বাঁশী। বীরেন তাকে থামালো।

চৌদুনী গাঁও কুন্ঠে হবো?

না বলি পারি। বলেই বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে লোকটা যেমন হাঁটছিল—হাঁটতে লাগলো।

বীরেন ভাবলো, কোথায় এখন নীলমণি পশুপতিদের খুঁজে পাই। আমি আর কটক অব্দি যেতে পারবো না। এদিকটা বোধহয় কটকেরই কাছাকাছি। কলকাতায় ফিরলে অফিস তো চেপে ধরবে।

সাড়ে তিনটে পৌনে চারটে হবে। হাতে ঘড়ি নেই বীরেনের। রোদের তেজ। ছায়ার লম্বালম্বি দেখে মনে মনে আন্দাজ করলো বীরেন। পর্ণকুটীরের দরজা খুলে গেল। একমাথা পাকা চুল নিয়ে একজন ধুতী পাঞ্জাবী বেরিয়ে এলো। পায়ে চামড়ার চপ্পল। চোখে রোদ-চশমা। হাতে ছড়ি।

ছায়া কেটে কেটে তাতে রোদের ছিটে—সারা হাইওয়ে জুড়ে ছড়ানো। সে রাস্তার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝেই লরি যাচ্ছিল। বিজিং। বিজিং। বিজিং।

স্যার। আপনি ধীরেন স্যার? আমি দেখেই চিনেছি—

আপনি? তুমি?

আমি নাইন্টিন ফর্টিতে আপনার কাছে ভূগোল পড়েছি—খুলনা জেলা স্কুলে—

চিনলে কি করে আমায় ? এতদিন পরে ? আশ্চর্য।

আপনার ছবি দেখেছি অনেকবার কাগজে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে চলে গেলেন। তারপরই রবীন্দ্রনাথ মারা গেলেন। স্বাধীনতার পর পার্লামেন্টে গেলেন। সেন্টারে মন্ত্রী হলেন—

সে সব পর্ব অনেকদিন হোল চুকে গেছে। থাক। আজ আর হাঁটবো না। চলো ভেতরে যাবে—

ভেতরে গিয়ে অবাক হয়ে গেল বীরেন। এই জনমানবহীন জায়গায় সুন্দর একতলা বাংলো। ফুলের অঢেল আয়োজন। ফলের গাছ।

এটা সিমেন্ট কোম্পানীর গেস্ট হাউস ছিল। কিনে নিলাম। তখন নেহরুজী নেই।

ওঁর দফতরেই তো স্টেট মিনিস্টার ছিলেন।

হ্যাঁ। এগারো বছর মন্ত্রী ছিলাম। সব সময় ভাবতাম—কবে রিটায়ার করে নির্জনে থাকবো।

ইলেকট্রিক পান কোত্থেকে এখানে ?

সিমেন্ট কোম্পানীর ব্যাপার। মাটির নিচু দিয়ে কেবল টেনেছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বীরেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো। এখানেও আন্ডার গ্রাউন্ড ? মুখে বললো, কেবল ফলট্ হলে ?

বড় একটা হয় না। হলে তিন চারদিনের ধাক্কা। খোঁড়াখুঁড়ি। তবে খুব অসুবিধে হয় না। আমি আর আমার স্ত্রী থাকি।

আপনার ছেলে ?

একটিই। সে তো আজ বারো বছর ভুবনেশ্বরে নার্সিং হোমে।

কি হয়েছে ?

এমন সময় স্যারের স্ত্রী এলেন। পাকা চুল। লাল পাড় শাড়ি। পায়ে ঘাসের চটি। বড় করে সিঁদুর। তিনিই বললেন, শঙ্কর চিরকালই চপ কাটলেট খেতে ভালবাসতো। শান্তিনিকেতনে থাকতেও লুকিয়ে চুরিয়ে খেত। বড় হয়ে কলকাতায় হোস্টেলে থাকতে বেয়ারা দিয়ে আনাতো। পাশের দোকান থেকে। আধোয়া স্যালাডে কী সব পোকা থাকতো। খেয়াল করেনি। একদম ব্রেনে চলে গেছে।

ধীরেন স্যার বললো, আজ বিশ বছর চিকিৎসা চলছে। কোন ফল হয়নি।

এখন কি অবস্থা ?

বারো বছর হয়ে গেল—পাকাপাকি নার্সিং হোমে। আমরা মাঝে মাঝে দেখতে যাই।

চিনতে পারে আপনাদের ?

সব সময় নয়। কখনো কখনো। ব্রেন অপারেশনের কথা হচ্ছে। ভিয়েনায় নিয়ে গিয়ে—

পড়তি বিকেলের ছায়া লনে। তার সঙ্গে এই দুঃসংবাদ খাপ খাইয়ে নিল বীরেন। আমায় চিনতে পেরেছেন স্যার ?

না।

না পারারই কথা। আমারই তো এখন পঞ্চাশের দিকে।

তুমি কি ভৈরবের তীরে থাকতে। বেনেখামারের রাস্তায় ?

হ্যাঁ স্যার।

একটি ছোট ছেলের কথা আবছা মনে পড়ছে। কিন্তু কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারছি না।

আমার ছেলেই স্যার এখন জিও-ফিজিক্স পড়ছে।

স্যারের বউ বললো, অরুণ সুস্থ থাকলে এতদিনে কবে বিয়ে দিয়ে দিতাম।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। সন্ধ্যের অনেক আগেই গোল করে চাঁদ উঠলো। সেই সঙ্গে গা ঠাণ্ডা করে দেওয়া বাতাস। বাতাসে অসংখ্য গাছপালার গা-ঢলানী শব্দ। একটানা।

স্যার বললো, পৃথিবী জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর বীরেন। গুরুদেবের জীবনে শেষবেলায় আমি শান্তিনিকেতনে যাই। এক একদিন গানে জ্যোৎস্নায় —গা ভিজে যেত।

মন্ত্রী থাকতে কেমন লাগতো আপনার।

মন্দ না বীরেন। ভালোই। আর নেহরুজী আমায় খুব ভালবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথও বাসতেন।

তাঁর স্নেহও পেয়েছি। আচ্ছা। একটা কথা বলতে পারো। উইপোকা কীভাবে মারা যায় ?

বীরেন দাঁড়িয়ে উঠে ফাঁকা জ্যোৎস্না ধোয়া লনে চেঁচিয়ে উঠলো, ও যায় না। উইপোকা মারা যায় না।

স্যারের চেয়েও তাঁর স্ত্রী বেশি অবাক হলেন। ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইলন, কেন ?

বীরেন হাঁপাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বললো, ওরা তো শত কোটি।

তবু কি ওষুধ নেই কোন ?

ওষুধ কি আপনার ছেলের মাথার ভেতর থেকে পোকা বের করে আনতে পেরেছে ?

ও তো মানুষের শরীর বীরেন। এ তো মাটি।

আরও জটিল শরীর স্যার। পৃথিবীর শরীর। নানা গলিঘুঁজি। কোথায় যে বাসা বাঁধেনি ওরা।

ধীরেন স্যারের স্ত্রী বললো, সব কটা কাঠের জানলায় ফুটো করে যাচ্ছে। মেঝে খুঁড়ে ঝুরঝুরে মাটি করে দিচ্ছে। কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন দিলাম। কিছুই হোল না।

এক কাজ করুন। ওদের বাসায় গর্ত খোঁড়ান লোক দিয়ে। আট দশ হাত গর্ত। তারপর আগুন দিয়ে সব পোকা তাড়ান। শেষে পাবেন—রাণী পোকাটাকে। এই অ্যাতো বড়। সেটাকে গুলী করুন। আলপিন ফোটান। যা ইচ্ছে করুন। কঠোর না হলে পারবেন না আপনারা।

আমরা তো বুড়োবুড়ি। এত পরিশ্রম কে করবে!

ধীরেন স্যার তাঁর বউয়ের কথার পিঠে বললো তার চেয়ে ফি-বছর জানলা দরজায় আলকাতরা মাখিয়ে যাবো।

সেই ভালো স্যার। ওরা আলকাতরা, কেরোসিনের গন্ধ সইতে পারে না।

জ্যোৎস্নার ভেতর ফুলগুলোর একদম খচিত অবস্থা! ফ সা লালচে কানের লতিতে হীরের ফুল। সব কিছুই এখানে ছুরি বসানো।

বাতাসটাই শুধু এলোমেলো। বীরেন বললো, স্যার। চৌদুনী নামে কোন গাঁও আছে কাছাকাছি?

ও নাম তো শুনিনি বীরেন।

ধীরেন স্যারের ঘুম ভেঙে গেল বেশি রাতে। এমনিই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঘুম কমে আসে। তারপর আজ বিকেল থেকেই তিনি উত্তেজিত আছেন। যুবক বয়সে খুলনা জেলা স্কুলে পড়াতে ঢুকেছিলেন। সেদিনগুলো জীবন থেকে একদম মুছে গিয়েছিল। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে সেসব কথা মনে করিয়ে দিল তখনকার স্টুডেন্ট বীরেন। এর টাইটেলটাও জানা হয়নি। তখন ছিল আট ন বছরের বালক। এখন প্রায় পঞ্চাশের মধ্যবয়সী।

ছোট্ট শহর খুলনায় দুটো নদীর গায়ে স্কুল। হোস্টেল ছিল রূপসা নদীর তীরে। টিচার্স রুমের সামনে হরিতকি গাছ। পরে—অনেক পরে যখন ধীরেনবাবু ইউনাইটেড নেশনস্-এ যান—তখন সেখানেও ঢুকবার মুখে সাজানো লনে অমন একটি ছিমছাম সুন্দর গাছ দেখতে পান। নিশ্চয় হরিতকি নয়। নিউইয়র্কে হরিতকি হয়?

বারান্দায় বেরিয়ে এসে ধীরেন স্যার দেখলেন, আবছা লনে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুট করে বাইরের আলোটা জ্বেলেই অবাক। তুমি কি করছো ওখানে বীরেন? এত রাতে?

হাঁটুতে একটা ব্যথা পেয়েছি। হেঁটে ঠিক করে নিচ্ছি।

কখন পেলে?

আজই সকালে স্যার। মহানদীর ওপর ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিলাম। অন্তত দু'তিনতলা উঁচু হবে।

কি বলছো? সত্যি? দু'তিনতলা নয়! আট দশ তলা হবে। তোমার লাংস যে ফেটে যায়নি—এটাই আশ্চর্য।

আমার মনে হোল স্যার—আমি এইমাত্র জন্মালাম। এই তো আমার জায়গা। ট্রেন থেকে ব্রিজে নেমে পড়ে ভোররাতের বাতাসে ঝাঁপ দিলাম।

তুমি অল্পের জন্যে বেঁচে গেছ বীরেন। তোমার চেহারা আমার মনে নেই। মানুষ অল্প বয়সে একরকম থাকে। বড় হয়ে আরেক রকমের হয়ে যায়।

পোকাই সব পাল্টে দিচ্ছে স্যার। সারা পৃথিবীর মাটির ভেতরে মাটির শরীর স্বাস্থ্য রাখতে পোকারা মাটি তুলছে—গর্ত করছে, উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আবার ফিরেও আসছে।

তুমি এত পোকা-পোকা করছো কেন বীরেন। আমি—তুমি—আমরাও তো এই বাতাসে এরকমের পোকা। আমাদের শরীর আরেক রকমের পোকা কুরে কুরে খায়। শরীর কবরে দিলে এক বছরের ভেতর পোকা সবটা খেয়ে ফেলে হাড় ফেলে রেখে যায়। হাড়ও একদিন মাটিতে ক্যালসিয়াম হয়ে যায়।

নিশুতি রাত। সুন্দর বাতাস। তাতে অন্ধকার মাখানো বড় বড় ফুল। এর ভেতর দিয়ে বীরেন দত্তগুপ্ত তার প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার টিচারের সামনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।—আর কথা বলছিল। স্যারের প্রথম চাকরি খুলনা জেলা স্কুল। তারপর স্বাধীনতার আগেকার শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে। গুরুদেবের জীবনের শেষ বছরটা হয়তো স্যার পেয়েছিলেন। তারপর এম পি হলেন। নেহরু নাম ধরে ডাকতেন গান্ধীও তাই। সেকেন্ড জেনারেল ইলেকশনের পর সেন্টারে মন্ত্রীও হলেন। আজ নিউইয়র্ক। কাল জাকার্তা। পরশু পিকিং। চু-এন লাইয়ের সঙ্গে গাঁয়ের বাড়িতে বসে স্টিক দিয়ে এক সময় হয়তো সুইট অ্যান্ড সাওয়ার পর্ক খেয়েছেন। ক্রুশ্চেফ নিজে ওকে হাত ধরে নিয়ে গেছেন মসকোর ইন্ডিয়া ফেয়ারে। এসব ছবিই কাগজে বেরিয়েছে। বীরেনের চোখ এড়ায়নি।

বীরেনের মুখে ফস করে এসে গেল একটা কথা। আপনি স্যার এখনো অনেকদিন থাকবেন। নিয়মে থেকেছেন চিরকাল। কিন্তু আপনার বউকে নিয়ে কি করবেন?

দ্যাখো বীরেন। এখন আমরা পাশাপাশি আছি। কতদিন থাকবো জানি না। মানুষের শেষের ইতিহাস শুধু সঙ্গী হারানোর ইতিহাস।

বলুন—অনন্ত নিঃসঙ্গতা

ওটা কবিতার মত হয়ে যায় বলে ওভাবে আমি বলছি না বীরেন। একদা আমাদের মনে হোত—সামনে এখনো হাজার বছর পড়ে আছে। এখন আমি বুঝি—নতুনদের জন্যে এই পৃথিবীতে যে-জায়গায় আছি—সেটা ছেড়ে দেওয়া দরকার। এই ট্রুথের পাশে ভালবাসা, বন্যা, ভূমিকম্প—যে কোন বিপর্যয়ই—সামান্য জিনিস। পর্বত, বৃক্ষ, নদীর ক্ষয় আছে—আর মানুষের ক্ষয় থাকবে না! হাজারিবাগ যশিডি গিয়ে দ্যাখো—এক সময়কার সব আনন্দ, হাসি, গানের বাড়ি—স্রেফ সাপের আড্ডা হয়ে পড়ে আছে। ভালবাসা তো আসলে একটা অতৃপ্ত দখলের ইতিহাস। না-পাওয়া অধিকারের অভিযান।

এর ছেঁদো দিকটা বোধহয়—ভালবাসার সঙ্গে শরীরটাকেও গুলিয়ে ফেলা।

একটা শরীর থাকলে তবে ভালবাসা পায়ের নিচে মাটি পায় বীরেন।

দু'জনেই থেমে গেল। কেন না দমকা বাতাসে এবাড়ির বাইরে হাইওয়ের দু'দিকের ছায়াধরা গাছগুলো মহানন্দে দুলছে। শুকনো পাতা সারা রাস্তা

ধরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। বীরেনের মনে হচ্ছিল, হাইওয়ের দু'ধারের গাছগুলো এই এখন—এইমাত্র সচল হয়ে উঠেছে। বয়স্ক সব গাছের শেকড় ওপড়ানোর আওয়াজ বাতাসকে ভরে দিচ্ছে। ওই সাইজের সব গাছ এখন সারারাত ধরে একটানা চলে কলকাতার দরজায় গিয়ে থামবে সকাল নাগাদ। মাঝখানে মাত্র একটি দিন। তার ভেতর কলকাতা ইভাকুয়েট করতে পারলে ভালো। নয়তো সেদিনই আবার যখন রাত শুরু হয়ে যাবে—গাছগুলো তখন কলকাতার ওপর দিয়ে দাপিয়ে চলে যাবে। একেই পশুপতি-নীলমণি ওরা নেই। জলের লাইন, গ্যাসের লাইন, ইলেকট্রিকের তার—সব মিলে গিয়ে একাকার। হাজার কোটি পোকা ইলেকট্রিকের শক খেয়ে ঝাঁঝরি ছাড়াই যে-কোন ফুটো দিয়ে কলকাতায় ঢুকে পড়ছে। আর এই অবস্থায় এতদিনকার সব গাছ যখন একসঙ্গে কলকাতায় ঢুকতে থাকবে—তখন নির্জন নিশুতি রাত একটি মহানগর জুড়ে মানুষ—ঘর-বাড়ি—আগাগোড়া থেতলে যাবার সাক্ষী হয়ে থাকবে।

বীরেন আস্তে আস্তে বললো, এতকাল পরে স্যার আমি আপনাকে শরীর দিয়েই চিনেছি। কিন্তু আমাকে তো আপনি কিছু দিয়েই চিনতে পারবেন না।

সম্ভবও নয় বীরেন। এখন এখানে তোমার বলার ভঙ্গীটাই সব। আমি এক একটা পিঁপড়েকে লক্ষ্য করি। একা একা বারান্দায় বসে দেখি--উইপোকার সারি চলেছে। ডিসিপ্লিন্ড। ডিটারমিন্ড সোলজারস্। আর মনে পড়ে যায়—আজকের টিকটিকি তো সেদিনকার অতিকায় সব প্রাণী।

ওদের প্রতিশোধের ধরনটা দেখুন স্যার! এখন সামনাসামনি না পেয়ে--আপনার ছেলের কেসটাই দেখুন।

হ্যাঁ। ব্রেনে ঢুকে বসে আছে। পোকাটা আশ্চর্য বুদ্ধিমান। এক্সরেতে দেখা গেল ও ডান কানের ওপর আছে। সেই মত অঙ্ক করে একবার ব্রেন খোলা হোল। সারজন ঠিক করলেন—সন্না দিয়ে ওকে তুলে বাইরে নিয়ে আসবেন। যেই না ব্রেন খোলা—ও অমনি জায়গা পাল্টালো। মাথাটা খোলা অবস্থায় রেখে ফিরে অঙ্ক কষা যায় না। আর সন্নার ডগা অতদূর পেঁছিয় না। ফলে সেবারের অপারেশন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

ঠিক এই সময় কলকাতার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ডিটেকটিভ ট্রেনিং কলেজের রিসেপশন করিডরে বসে ক'জন লোক কথা বলছিল। এখানেও নিশুতি রাত। আলো অন্ধকারের ফারাক বুঝতে--একফালি জ্যোৎস্না।

একজন বললো, এই জেনা কলকাতা আগে কত ভাল ছিল।

অন্যজন বললো, এখনো ভাল। কিত্তেক জায়গা বাদে। তুই মনে করে দ্যাখ পট্টনায়ক -- আজি যারা মস্তানি, জুলুম করে--তাদের বাবারা তো এমন করে নাই।

তখন বাঙ্গালীর চাকরি ছিল। এত্তেক বেকার ছিল না ঘরে ঘরে।

ওরাই কেউ কেউ এখন মস্তান। চাকুরি নাই। কি করিবে? তাই চাঁদার নামে জুলুম।

একজনের নাম পশুপতি জেনা। অন্য জন নীলমণি পট্টনায়ক। এদের জন্ম কলকাতাতেই। জীবনে তিনচার বারের বেশি এরা কেউ বাপ পিতেমোর ভিটে চৌদুনীতে যায়নি। বলা যায়—কলকাতাই এদের বারানসী। কলকাতাই উত্তমাশা।

নিসপেকটরবাবু আমাদের লইয়া আসিল। মস্তানরা পাইলে রেহাই দিত না। বাড়িওয়ালার লাগানো মস্তান।

কি আর হইত? ওদের বাবাদের নালিশ জানাইতাম।

ওরা বাবার কথা ভারি শুনে। নিসপেকটরবাবু আমাদের সন্ধান করছিলেন—তাই আমাদের দেখা মাত্তর পাকড়াও। বড় আশ্চর্যের ইস্কুল এইটা।

এরা দেশে গেলে তবে নিজের ভাষায় কথা বলে। জন্ম ইস্তক কলকাতা—তাই মুখের ভাষাও কিছু জগা-খিচুড়ি। খাঁটি বাংলা বা খাঁটি ওড়িয়া—কোন ভাষাই ঠিক ঠিক আসে না ওদের মুখে।

ঘুপচি ঘরের বদলে ডিটেকটিভ ট্রেনিং কলেজের সরকারী ঘরে ওদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। ওরা এখন এই কলেজের অতিথি। ওদের বাকি লোকজন পাড়া ছাড়া হবার পর দেশে গেছে। ফিরে এলে সি আই টি-র নতুন জায়গায় ভাল ঘর পাবে বলে কথা হয়েছে। কলকাতা রিপেয়ারে ওদের অভিজ্ঞতা খুবই দরকারী। সরকার তাই মনে করেন।

সুন্দর বাতাস বইছিল কলেজ লনে। কলকাতায় এত সুন্দর জায়গা আজকাল কম চোখে পড়ে। পশুপতি বা নীলমণির ভাল ঘুম হচ্ছিল না সুন্দর ঘরে। দুজনই দেশের লোকের সঙ্গে পরিবার পাঠিয়েছে চৌদুনীতে। দিনের বেলা যেখানে লোকজনের যাতায়াত—সেখানে এখন সুন্দর জ্যোৎস্না—বাতাসে সামনের শিউলি গাছটার ঢলাঢাল। জেনা আর পট্টনায়ক দুজনই শুয়ে পড়েছিল। সুন্দর বাতাস পেয়ে উঠে বসেছে। এখন ওদের আলোচনা অন্য মোড় নিল। অনেকটা এই পথে—

আগে ছিল হগ সাহেবের পাইপ। ইঁট, চুন, সুরকির গাঁথুনি।

সে তো ঠাকুর্দার বাবার আমলে তৈরী।

আমার ঠাকুর্দাও ইট বয় সেখানে।

তোর ঠাকুর্দা আমার ঠাকুর্দার চেয়ে বড় ছিল।

সে তো হবেই। আমি তোর চেয়ে বড় না পশুপতি।

আমার ঠাকুর্দা চিত্তরঞ্জনের আমলে লোহার পাইপ বসায়।

তাতে ছ'আনা রোজে আমার ঠাকুর্দাও কাজ করে। তখন করপোরেশন এতে

বড় ছিল না।

সে পাইপে বড় জং ধরে।

বিধানচন্দ্র শেষে বাহাত্তর ইঞ্চি বসাইলো। এই কথাটি বলেই নীলমণি পট্টনায়কের মনে হোল—এত্তে বড় শহর—কিত্তে লোকজন—নগরীর আসল প্রাণ ভ্রমরা ওই তিন প্রকার পাইপে। বড় রহস্য আছে এই নগরীর পাতালে। সে রহস্যে এখন আমি আছি। তাতে আমার বাবা—তার বাবা—তার বাবাও ছিল। এ যেন রাজরাজড়ার ইতিহাস। এখন কলিকাতায় মানুষ মানুষকে খুন করে ম্যানহোলে ভরে দেয়। সেখানে পুলিশ কোন্ পথে তদন্ত করিবে—তা শিখাইবার ইস্কুল এ বাড়ি। আমরা পাকড়াও কেনে আমরা পাতালের পথ চিনাইবো। তাই জামাইয়ের আদরে আমাদের রাখা।

কত রাত অব্দি দুজনে গল্প করেছিল—তা এখন মনে নেই। এখন সকাল সাড়ে আটটা। ভারতের ভাবী ডিটেকটিভদের মর্নিং ক্লাস শুরু হয়েছে। ক্লাস নিচ্ছিলেন কর্নেল ঘোষ। তিনিই এই কলেজের প্রিন্সিপাল। বেশি স্টুডেন্ট নয়। পনের ষোলজন।

আবছা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল নীলমণিদের। পাশেই ক্লাসঘর। সেখানে কে যেন জোরে জোরে কথা বলছে।

কর্নেল ঘোষ তখন বলছিলেন, রক্ত আর পানের পিকের পার্থক্য নিয়ে আমরা তিনদিন আলোচনা করেছি। এবার আমি নতুন একটি বিষয়ে বলবো। ক্রিমিনোলজির সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অধ্যায়। হত্যা এবং আত্মহত্যা। অ্যান্ড দেয়ার ডিফারেন্স!

কে যেন ক্লাসঘরে এসে কী বলায় কর্নেল ঘোষ থেমে গেল। এই ঘোষবাবুর গলা নীলমণিরা চেনে। ইনিই গত দু তিন দিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার পাতালের কথা ওদের কাছে জেনে নিচ্ছেন। একবার গাড়ি করে পশুপতিদের নিয়ে সাইটেও গেছেন। ফিতে ফেলে ম্যানহোলের ঘের মেপেছেন বার দুই।

ঘোষ সাহেবের গলা ভেসে এলো, দেখে আসি তো কি করছে?

সারা ক্লাস কর্নেল ঘোষের পেছন পেছন। প্রায় বিশজনের চল্লিশখানা জুতোর খট খটখট। পরিষ্কার সুন্দর মেঝের ওপর দিয়ে। সরকারী বাড়ি। লম্বাই চওড়াই। চারদিকে উঁচু পাঁচিল। সামনেই খেলার মাঠ। ফুলগাছ। ছায়া দেবার বড় ঝাঁকড়া গাছ। জুতোগুলোর আওয়াজ ড্রাম পেটানোর নিয়মিত তালে পড়ছিল। সবুজ খেলার মাঠে তখন একজন মাত্র উরদি পরা গুর্খা। সে বিউগিলটা নিজের ঠোঁটে বসাচ্ছিল।

নীলমণি পট্টনায়ক পশুপতি জেনাকে বললো, চল পশু—মনে ভাল নেয় না।

ওরা দুজন যখন উঠে গিয়ে নিজেদের ঘরের সামনের পরিষ্কার বারান্দায় বসলো তখন জুতোর আওয়াজ থেমেছে।

কর্নেল ঘোষের কড়া গলা পাওয়া গেল। মিস্টার সাংমা। কাম আউট। বেরিয়ে এসো। এটা একটা কলেজ।

সরকারের শিক্ষানবীশ ভাবী গোয়েন্দারা চোখ বড় বড় করে তাকালো। তাদেরই সঙ্গী—নাগাল্যান্ডের ডগলাস সাংমা কমিউনিটি বাথরুমের বিরাট চৌবাচ্চায় গলা অবদি ডুবিয়ে ভেসে আছে। ওড়িশা, আসাম, ওয়েস্টবেঙ্গল, বিহার, অরুণাচল, মণিপুর নাগাল্যান্ড থেকে পাঠানো পুলিশের বাছাই লোক-জনকে—এখানে গোয়েন্দার কাজে ট্রেনিং দেওয়া হয়। ডগলাস সাংমা আজ তিন হপ্তা হোল কলেজে নানা খেলা দেখাচ্ছে।

কর্নেল ঘোষ জীবন শুরু করেছিলেন ফৌজে। সেখানকার ফৌজী গোয়েন্দা বিভাগ থেকে তাকে আনা হয়েছে। জোরে কথা বললে ঘোষের গলা থেকে বাঘ ডাকে।

এখানে সকাল থেকে বেলা বারোটা অবধি ক্লাস। তারপর খাওয়া-দাওয়া। আবার বেলা আড়াইটে থেকে ক্লাস। কর্নেল ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলেন। বেরিয়ে এসো। তুমি আজ তিনদিন কোন ক্লাসে যাচ্ছো না।

চৌবাচ্চা থেকে কোন জবাব এলো না। শুধু বাঁ পা জলের ওপর দাপিয়ে কিছু জল ছিটিয়ে দিল সাংমা। কর্নেল ঘোষ পিছিয়ে এলেন। তাঁর আর্মি গোঁফেও সাংমার পায়ে ছিটানো দু ফোঁটা জল এসে লাগলো। তিনি রাগে গরগর করতে করতে বললেন, তুমি তিনদিন ব্যালিস্টিকের ক্লাসে যাওনি। সেরোলজির ক্লাশে ইউ ডিড নট আনসার ইওর প্রফেসার।

সাংমা চৌবাচ্চায় শুয়ে শুয়ে যা বললো, বাংলায় তা অনেকটা এরকম—সেরোলজি মানে ব্লাড। খুন। রক্ত। আমি জানি হোয়াট ইজ রক্ত। কিন্তু প্রফেসর রক্ত দেখেনি কোনদিন। খুন দেখেনি। অথচ রক্তের কথা বলে যাচ্ছিল। আমি এরকম মূঢ় টিচারের কোশ্চেনের কি জবাব দেব?

এটা শুধু রক্ত নয় সাংমা। এটা একটা বিজ্ঞান। দেশের ফিউচার ডিটেক-টিভদের জন্যে এটা একটা কোর্স। পানের পিক আর রক্তের ডিফারেন্স জানতে হবে। জানতে হবে—জানতে হবে।

ধমকে উঠলো সাংমা। শাট আপ। উই হিলমেন—উই ডোন্ট চিউ। আমরা পান চিবোই না। আমরা পাহাড়ের লোক। শীতকালে শুয়োর জবাই করলে আমরা রক্তটা জমিয়ে রাখি। রক্তের কেক খাই। আমাকে আপনারা রক্ত শেখাতে আসবেন না। আই অ্যাম বিস্ট। ইউ আর এ সিভি-লাইজড্ বিস্ট।

কাম আউট। বলে যেই না কর্নেল ঘোষ এগিয়ে গেল—অমনি সাংমা চৌবাচ্চা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর যা বললো, তার বাংলা—আমি ন্যাংটো। কাছে এসো না।

আমি তোমার কোর্ট মারশাল করবো। আধঘণ্টার ভেতর ড্রেসড্ হয়ে আমার ক্লাসে আসবে।

ছাত্রদের নিয়ে গটগট করে আবার ক্লাসে ফিরে গেলেন কর্নেল ঘোষ। এক-একজন স্টুডেন্ট—এক একরকম মত দিল। কেউ বললো—সাংমা অদ্ভুত। কেউ বললো পাগল। কেউবা বললো—বুনো।

কাঁটায় কাঁটায় তিরিশ মিনিটের মাথায় ডগলাস সাংমা কর্নেল ঘোষের ক্লাসে গিয়ে হাজির। পা থেকে মাথা অব্দি সুসজ্জিত। নিখুঁত করে মাথা আঁচড়ানো।

ক্লাসে না এসে চৌবাচ্চায় নেমেছিলে কেন?

বিচ্ছিরি গরম।

গরম কোথায় নেই। সব জায়গায় গরম।

না সব জায়গা গরম নয়। আমাদের দেশ এখনো ঠাণ্ডা।

এটাও তোমার দেশ সাংমা।

এত হট? এ আমার দেশ নয় কর্নেল।

ভেবেচিন্তে কথা বলো সাংমা। তোমাকে তোমার স্টেট গভর্মেন্ট নোমিনেট করে এখানে পাঠিয়েছেন।

আমি আসতে চাইনি।

তবে এলে কেন?

ওরা বললো, কলকাতা খুব সুন্দর, ঝর্ণা আছে। পাহাড় আছে কলকাতায়। বিশাল জঙ্গল আছে —

কর্নেল ঘোষ আকাশ থেকে পড়লেন। এসব? কলকাতায়?

নো নো কর্নেল। সবই ব্লাফ। টু ব্লাফ দিস হাম্বেল সোল। কত আশা নিয়ে এসেছিলাম। এখানে ট্যাপ ওয়াটার আমার ঘেন্না করে। গাছের ছায়ার ভেতর দিয়ে এখানে কোন রাস্তা নেই, যে-রাস্তা দিয়ে কয়েক মাইল দৌড়ে যেতে পারি। দৌড়বার সময় পাখির ঝাঁক ছররা হয়ে উড়ে যাবে। বেজি বা খরগোস ফায়ারিং রেঞ্জের ভেতর পেলেও আমি গুলি করবো না। তখন যে খেলার সময়। তখন যে গাছের ছায়া মাটির সঙ্গে গা ঘসে।

কিন্তু তুমি এ-দেশের ভবিষ্যতের দায়িত্বশীল নাগরিক সাংমা। তুমি স্টেট পুলিশে সাব ইন্সপেক্টর হবে। সামনে তোমার উন্নতির খোলা রাস্তা পড়ে রয়েছে।

হ্যাঙ ইওর সাব-ইন্সপেক্টর। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড পড়ে পড়ে আমি সব গুলিয়ে ফেলছি। আমাদের দেশের গাছপালা, শীত, খরগোস, পাহাড়ী গাই—তার সুন্দর চোখ—সব আমি ভুলে যাচ্ছি। এই বইটা পড়লে কোন মানুষ আর মানুষ থাকে না।

ক্লাসে অন্য ছাত্রদের সামনে নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে শেষ চেষ্টা করলেন কর্নেল ঘোষ। কি বলছো সাংমা? ইন্ডিয়ান পেনাল কোড মেকলের ব্রেইন চাইলড্। কত দিনকার আইন—অথচ এখনো সমান তেজী।

বাজে কথা। মেকলে কবেকার জানি না। কিন্তু আমাদের পাহাড়ের হাজার হাজার বছরের আইন—তার কি কোন তুলনা হয় কর্নেল। তোমাদের এ-আইনে কোন ভাল শাস্তি নেই। কোন ক্ষমা নেই। খুন কত রকমের! আমাদের জবাই একটাই।

কি রকম?

খুন। খুনে সাহায্য করা। খুন করতে উত্তেজিত করা। কত কি। সব গুলিয়ে যায় আমার।

কোর্ট মার্শালের জন্য তৈরি হও।

আমি যে-কোন অবস্থার জন্যে তৈরি কর্নেল।

বেলা তিনটের সময় দেখা গেল—ডগলাস সাংমা ট্রেনিং কলেজের ঘেরা খেলার মাঠে স্কুল ইউনিফর্ম পরে জগিং করছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। সারা মাঠে একা। রোদ্দুর তখন মন দিয়ে ঘাস ভাজা করে যাচ্ছে। সাংমার পিঠে অনেকটা বোঝা। ওর দুপাশে একজন করে সেন্ট্রি। তাদের কাঁধে খোলা সঙ্গীনের বন্দুক। আর অভিবাদন মঞ্চে বিরাট এক ছাতার নিচে কর্নেল ঘোষ বসে।

কর্নেল দুবার ডাবল্ আপ করিয়ে সাংমাকে স্যালুট স্ট্যান্ডের কাছে নিয়ে এলো। সাংমার ভ্রূ নোনা ঘামে ভিজে গেছে। সে অবস্থায় কর্নেল বললো, তুমি তোমার শোবার ঘরে একটা বড় টিকটিকিকে ডিকশনারি ছুঁড়ে সিলিং থেকে নিচে ফেলে দিলে?

আমাদের হাতের টিপ অব্যর্থ।

যা জানতে চাই তাই বলো। টিকটিকিটার ছাল ছাড়িয়ে তাকে তুমি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে খেয়েছো?

ওটা আমাদের দেশে সুখাদ্য।

তোমাকে স্টোভ দেওয়া হয়েছে—তোমার ঘরে বসে তুমি যাতে ব্রেকফাস্ট করে নিতে পারো—সেজন্যে।

টিকটিকি আমরা অনেক সময় ব্রেকফাস্টেও খাই। আবার লাঞ্চেও খাই! আসলে আমাদের খাওয়াদাওয়ার কোন মাপা সময় নেই। খিদে পেলেই আমরা খাই। পাহাড় আমাদের এই নির্দেশ দিয়েছে। গাছ আমাদের বন্ধু। নদী আমার দেশের হরিণ। তোমার কলকাতায় এসব কিছুই নেই। ব্যারেন—

ডাবল আপ।

ডগলাস সাংমা আবার দৌড়তে লাগলো। সারা মাঠ কয়েক চক্কর দিয়ে আসার পর কর্নেল আবার মুখ খুললো, তোমাকে ডিকশনারি দেওয়া হয়েছে—পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে। ডিকশনারির তুমি অপমান করেছো। বইকে তুমি প্রোজেক্টাইল হিসাবে ব্যবহার করেছো।

হাতের কাছে হ্যান্ডি অন্য আর কিছু ছিল না। প্রোজেক্টাইল ক্লাস নেওয়ার সময় আপনাকে আমি বলেছিলাম—আমার নিশানা কখনো ভুল হয় না। মিস করে না। আশা করি এটাই তার প্রমাণ। আমি ভেবেছিলাম—এই অব্যর্থ টিপের জন্য আমি আপনার কাছ থেকে কোন রিওয়ার্ড পাবো।

স্যার আপনার ফোন।

স্যালুট স্ট্যান্ড থেকে নেমে পাশেই ক্লাস-রুমের লাগোয়া করিডোরে টেলিফোন।

হ্যালো?

কে? বড়মামা—

কাকে চান?

কর্নেল ঘোষ আছেন?

বলছি।

আমি রাধা বড়মামা—

কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?

তোমার জামাই—আজ দশদিন হোল কটক গেছে। অফিসের কাজে। ফেরেনি। তাকে নাকি লাস্ট দেখা গেছে—মহানদীর ওপর রেল ব্রিজে। অফিস তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। কটক পুলিশেও কিছু বলতে পারছে না।

চলে আয়। কি করতে পারি দেখি।

তুমি আছো?

তোর জন্যে ওয়েট করবো। সন্ধ্যে নাগাদ আয়। গেটে এসে সেন্ট্রিকে বলবি—আমার নাম—

কর্নেল আবার বড় ছাতার নিচে ফিরে গেল। তার জেদ বেড়েই যাচ্ছে। কি করে এই অবসটিনেট ইয়ংম্যানকে কাবু করা যায়—তাই ভাবছিল কর্নেল। কিছুতেই জব্দ হওয়ার পাত্তর নয়।

ডগলাস সাংমা। মন দিয়ে শোনো। তুমি লাইভ কার্টিজ বিনা পারমিশনে ইউজ করেছো।

আমি তো কাউকে গুলি করিনি। আমরা পাহাড়িরা অকারণে গুলি খরচ করি না।

তুমি জ্যান্ত টোটা ছুঁড়ে কলেজ-কম্পাউন্ডে পায়রা ধরেছো।

আমি আস্ত ছুঁড়ে মেরেছি। রাইফেল ব্যবহার করিনি। এটাও আশা করি কর্নেল—আপনি লক্ষ্য করেছেন—ব্যালিস্টিকসের মডেল স্টুডেন্ট হবার যোগ্যতা

আমারই আছে। পায়রাগুলো কলেজ-কম্পাউন্ডে খেলছিল। আমি ওয়েপনস্ সাফ করছিলাম বসে বসে। একটা তাজা কার্তুজ ছুঁড়ে হেলদি বার্ড ঘায়েল করলাম—

চুপ করো। তাকে আহত অবস্থায় ধরে এনে তার পাখনা কেটেছো।

ইয়েস কর্নেল। পাখনা ক্লিপ করে তাকে আধো-ভেজানো ড্রয়ারে রেখেছি। তার একটা কারণ আছে।

কোনো কথা শুনতে চাই না আমি। পড়াশুনোর টেবিলের ড্রয়ারে পায়রা। আহত পায়রা। তার পাখনা তুমি ছেঁটে দিয়েছো।

কারণ—তখন তখনই আমার খিদে ছিল না। তাই পায়রাটা আমি স্টোর করেছিলাম। পরে খাবো বলে।

তোমার ড্রয়ারে সেই পায়রা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ওপর সারাদিন ধরে হেগেছে—

তা করতে পারে। আমার তো মনে ছিল না যে—ওই রাবিশ বইটা ওখানে রয়েছে।

তুমি আমাদের আইন ব্যবস্থাকে অপমান করছো।

যে আইন আমি গ্রাহ্য করি না—তাকে কি করে অপমান করবো। অপমান তো ভালবাসার লোককে করা যায়।

অ্যাবাউট টার্ন। ডাবল্-আপ।

ডগলাস সাংমা পিছন ফিরে দৌড়চ্ছে। পিঠের বোঝাটা দুলছে। কড়া রোদ্দুরে সারা ইউনিফর্ম ভিজে এখন প্রায় কালো।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে দরবার প্যারেডের ঢাউস ছাতার নিচে অস্থির হয়ে পায়ের অ্যামুনিশন বুট সিমেন্ট করা স্যালুট স্ট্যান্ডে কিচ-কিচ করে ঘষতে লাগলেন। আর মুখে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন—ভালবাসা। ভালবাসা!

তারপর কর্নেল নিজের মনে বলে ফেললেন, মানুষ খুন করার বেস্ট ওয়েপন —ভালবাসা।

বলেই কর্নেল অবাক হোলেন। এ আমি কি বললাম?

রাধা এসে তার বড়মামার কোয়ার্টারের বারান্দায় বসলো। কলেজ কম্পাউন্ডেই সরকারি বাড়ি। ঢাকা বারান্দার দেওয়ালে বড়মামীমার ছবি। ছবির নিচেই জুতোর র‍্যাক। র‍্যাকের এক কোণে আধপোড়া ভাঙা ধূপকাঠি। সেন্ট্রি এসে বললো, সাহেব বাথরুমে। চা, না কফি?

এখন কিছু খাবো না।

খানিক বাদে পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বছর বয়সের খালি গা,চান-সারা, পেটা শরীরের বড়মামা বেরিয়ে এলেন। বড় আলোটা জ্বেলে দি?

দাও।

কি হয়েছিল তোদের?

কিছু না বড়মামা। একটু ব্রুডিং টাইপের ও—সে তো তুমি জানোই।

দ্যাখ রাধা। একটা কথা বলি। এই বয়সের লোক হারায় না। হয় খুন হয়। নয় নিজেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যায়।

তুমি ওর ডাইরিটা পড়ে দেখতে পারো।

এনেছিস্—

হ্যাঁ।

ভালো করেছিস। তুই নিজে পড়েছিস্?

না। কুটি-কুটি করে লেখা। আমি পড়তে পারিনি সব।

আমি পেরে যাবো। হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট ছিলাম প্রথম জীবনে। ওটা রেখে দে। আগে তোর সঙ্গে কথা বলি।

কটক পুলিশ—

থাম তো। পুলিশের আমি সব জানি। তোর সঙ্গে কিছু হয়েছিল?

নাঃ। সবই নরম্যাল।

অফিসে?

সেখানে সুনাম নিয়ে কাজ করে আসছে তোমার জামাই।

জানিস তো রাগ ভাল জিনিস নয়। ভালবাসা থাকলেই অপমান করা যায়। এই লেসনটা আজ পেলাম। একটা কথা মনে রাখবি রাধা—আমাদের বংশের—তুইও ভাগনী হিসাবে সে-রক্ত খানিকটা পেয়েছিস—তাছাড়া সেরোলজি পড়তে গিয়ে জানছি রক্তের একটা ছাপ থাকবেই—আমরা সবাই গুপ্ত পাগল।

রাধা নিজের মনেই শিউরে উঠলো। আমি পাগল? অথচ অথচ আমি তা জানি না। সে তো আরও সর্বনেশে কথা।

কর্নেল নিজের তোড়েই কথা বলে যাচ্ছিলেন। তার বারান্দা থেকে কলেজ গ্রাউন্ড আস্ত একখানা অন্ধকার। তার ভেতর রোদ্দুরপোড়া মাঠটায় সবুজ এখন মিশে আছে। সাংমা নাকি ডরমিটরিতে ফিরে গরম জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। ওর পড়াশুনোর বাকি ড্রয়ারগুলোতে যা পাওয়া গিয়েছে—তা হোল—কাঁচাঙলকা, ছুরি, গোলমরিচ, নুন আর জুরিসপ্রুডেন্সের একখানা ছেঁড়া বই।

কর্নেল উঠে গিয়ে ঘর থেকে অফিস ক্লিনিককে ফোন করলেন। ডরমিটরির দশনম্বর সিটে লোশন, ট্যাবলেট ক্রিম প্লাস্টার—যা দরকার পাঠিয়ে দাও। আমি সই করে দেব। কম্পাউন্ডারকে বললেন, সাংমা কেমন থাকে আমায় জানাবে।

বারান্দায় ফিরে এসে কর্নেল ঘোষ রাধাকে বললেন, নয়তো দ্যাখ—সামান্য ঝগড়া থেকে কি দাঁড়ালো। তোর মামীমা একদম চিরকালের জন্যে চলে গেল। আমি আজ সতেরো বছর এই ফাঁকা বাড়িতে প্রিন্সিপাল হয়ে কোয়ার্টার আগলাচ্ছি।

কেন? মেয়ে জামাই আসে না?

একদিন দিব্যি বসে বসে দীপেন আর সতীর সঙ্গে গল্প করছি। সামান্য ঠাট্টা থেকে কথা কাটাকাটি। রাগের মাথায় রাত-দুপুরে ওদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।

তারপর? এ কাণ্ড কবে করলে?

দু বছর হোল। দীপেন সেই যে বদলি হয়ে আসানসোল—তারপর ওরা কলকাতায় এলেও এদিক মাড়ায় না। তাই বলছিলাম—আমাদের ফ্যামিলিতে আমরা সবাই গুপ্ত পাগল। আমরা তা জানি না। মাত্র বছর দশেক হোল জানতে পেরেছি আমি।

তাও সাবধান হও না কেন?

দে। বীরেনের ডাইরিটা দে—। আর ঘরের ভেতরের ওই টেবিলটা থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা এনে দে।

রাধা তার কথার জবাব না পেয়ে পড়বার কাচ এনে দিল। ট্রেনিং কলেজ। তার পুলিশের ভাবী গোয়েন্দাদের—তাই গোলমাল ভর্তি কলকাতার গায়ে একদম নির্জন এই ভুতুড়ে বাড়ি। চলাফেরা চুপচাপ। দূরে শুধু ঠাকুরদের রান্নাঘর থেকে একটু আধটু যা আওয়াজ আসছে।

পড়তে পড়তে মামা তার ভাগ্নীর কাছে জানতে চাইলেন জাঁ পল সার্ত্রে কে? নামটা শোনা শোনা লাগছে। তাকেই তো এখানে চিঠি লিখে রেখেছে বীরেন।

একজন লেখক। একটা ইংরিজি বই দেখেছিলাম একদিন ওর টেবিলে। তাতে এরকম একটা নাম ছিল।

ও হ্যাঁ। এ নাম আমার শোনা। ইংরিজিতে বই দেখেছি। বলতে বলতে কর্নেল ঘোষ বীরেনের লেখায় ডুবে গেলেন।

প্রিয় শ্রীযুক্ত জাঁ পল সার্ত্রে

ভালবাসা, বাঁচিয়া থাকা এবং টিকিয়া থাকার বিপদের সামনে দাঁড়াইয়া আজ আপনাকে এই চিঠি লিখিতেছি। আমি আপনার তিনটি গল্প মাত্র পেপার ব্যাকে পড়িয়াছি। আর পড়িয়াছি—একটি ট্রিলজি উপন্যাসের মধ্যে একখানি উপন্যাসের প্রথম সত্তর পৃষ্ঠা।—যেখানে আপনি পারি শহরে একটি নিম্নবিত্ত কুমারীর মাতৃত্বসম্ভাবনা লইয়া ভাবিত।

তাহাকে কি করিয়া খালাশ করা যায়—এবং সে-ব্যাপারে এক বুড়ির পরামর্শ আপনি যেভাবে গুছাইয়া বলিয়াছেন—তাহাতে মনে হয় আপনি একজন ফরাসী গৃহস্থ মানুষ।

আমি একজন বাঙ্গালী গৃহস্থ। আমার বাঁচিয়া থাকাই মুস্কিল হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনার সৎ পরামর্শ চাই। তার আগে একটি কথা। আপনি আমাদের এখানকার গৃহস্থদের মতই ভাড়া বাড়ির বাসিন্দা ?

সে যাক।

আমি স্থির নিশ্চিত যে, অল্প দিনের ভিতরেই কলিকাতা শহরের পাতালের সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আমাদের এই পাতালের ইতিহাস যাহাদের মুখস্থ—তাহারাই নিখোঁজ। বংশ পরম্পরায় কিছু লোক কলিকাতার পাতাল সারাইয়া সাজাইয়া আসিতেছে। সেখানকার মানচিত্র মাত্র কিছু লোকের মাথায় আছে। এই অবস্থা শতাধিক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত অবস্থা—মহানগরীর পাতালের কাঠামো মাথায় রাখিয়া আজ সেই লোকগুলি উধাও। পাড়ার বেকাররা বাড়িওয়ালার পয়সা খাইয়া তাহাদের উৎখাত করিয়াছে। আমি তাহাদের খুঁজিতে যাইতেছি।

যদি উহাদের না পাই—তাহা হইলে কলিকাতার ভূগর্ভে পাতাল রেলের নিঃশ্বাস টানার পথের সঙ্গে গ্যাস, আলো, ইলেকট্রিক-এর এবং পয়ঃপ্রণালীর প্রলয়ঙ্কর জগাখিচুড়ি অতি সত্বর বাঁধিবেই বাঁধিবে।

এখন আপনি অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন। আমাদের একমেব গঙ্গা এখন বুজিয়া আসার জোগাড়। আকাশে গ্যাসোলিন, ডিজেল কয়লা আর কারখানার ধোঁয়া নগরীর মাথার উপর সর্বদা একটি অন্ধকার বলয় ভাসাইয়া রাখিয়াছে। কাশিলে আমাদের লাংস ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠে। এই পরিস্থিতিতে পিচরাস্তা আর ফুটপাথের মলাটের মোড়কের তলাতেই সেই ভয়ঙ্কর জগাখিচুরি ঘটিলে কি দাঁড়াইবে তাহা আমি ভাবিতে পারিতেছি না।

প্রথমেই পাতালবাসী শত শত কোটি পোকা বাহির হইয়া আসিতে থাকিবে। কীট-বন্যা কেহ দেখে নাই। কিন্তু কলিকাতায় তাহা আসন্ন। হাজার হাজার টন পোকার ওজনের নীচে কলিকাতার ঘরবাড়ি, মানুষজন, স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়ম একদম থ্যাতলাইয়া গুড়াইয়া যাইবে। আমি বলিব পোকার সেই প্লাবন নোয়ার প্লাবনের চাইতেও ভয়ঙ্কর। কারণ জল সরিয়া যায়—জল বহিয়া যায়। কিন্তু পোকা নড়িয়া চড়িয়া জায়গা বদলাইয়া আরেক জায়গায় গিয়া বসিয়া পড়ে। নড়ে না চড়ে না।

ভূগর্ভের মানচিত্র মাথায় রাখিয়া যাহারা বংশপরম্পরায় বছরের পর বছর পাতালের গ্যাস, আলো, টেলিফোন, পয়ঃপ্রণালী ঠিক রাখিয়া আসিতেছিল—তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। কারণ এই নগরীতে ভাড়াবাড়িতে আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া আমি ও আমার স্ত্রীও বাস করি। রাধা এখনো বোঝে নাই—কী বিরাট বিপদ আমাদের সামনে। সে কয়েকটি আরশোলা আর চারটি ছুঁচোকে এখনো বিষ দিয়া সাবাড় করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে যে সে নিজে সাবাড় হইবে সে কথা এখন বলিলেও বিশ্বাস করিবে না।

এই রাধাই, সার্ত্রে মশাই, আমার বুকে একটি স্থায়ী ব্যথার কারণ। সে আমাকে যে ভালবাসা বাসে তার পায়ের নিচের ভিত শরীর। তার শরীরের কোষগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে সন্তুষ্ট না হইলে তার প্রতি আমার যতই ভালবাসা থাকুক না কেন—সব মিথ্যা হইয়া যায়। তাই তার কোষের তৃপ্তি পূরণে আমি শরীরে লিপ্ত হইয়াও নির্লিপ্ত থাকি। জীবনের বড় অঙ্কগুলি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তখনই কষিতে শুরু করিয়া দিই। মাথার ভিতর অনর্গল সিঁড়িভাঙার অঙ্ক চলিতে থাকে। এক একদিন চৌবাচ্চার অঙ্ককে বাছিয়া লই। তখন রাধার গায়ে থাকিয়াও আমি আসলে পাটিগণিত, বীজগণিতে বাস করি। এই আমার ভালবাসা। আমার উত্তেজনা, সংশয়, আকর্ষণ এখন ব্যাকরণ কৌমুদীর ধাতুরূপ। অথচ খুলনা জেলা স্কুলে কত আনন্দে ধাতুরূপ শব্দরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলাম।

আপনিই বলুন—এবার কি আমার সংশয়গুলি অকারণ? আমার বিশ্বাসমত আপনাকে সব লিখিলাম। আপনার মূল লেখা ফরাসী রচনা আমি পড়ি নাই। ইংরাজিতে যতটুকু জানিয়াছি—তাহাতে আপনাকে নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা বলিয়াই মনে হয়। তাই এই পরামর্শ প্রার্থনা। আমি কি করিব বলিয়া দিন। এ ব্যাপারে অন্য কোন সৎপরামর্শদাতাকে কাছেপিঠে দেখিতেছি না।

আমার অস্তিত্বের এই বিপদ আপনিই বুঝিবেন। মহানগরীর শিকড় পাতালে। সে পাতাল টলোমলো। শরীর ও সভ্যতার আয়ু পোকা-প্লাবনের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ভালবাসা জানিতাম স্বয়ম্ভু। শরীরকে রাধা এই ভালবাসার ভিত বানাইয়াছে। পরিণামে আমি সদাসর্বদা বুকে ব্যথা অনুভব করি। পড়শী নদীটি বুজিয়া যাইতেছে। মাথার উপর আকাশ ধোঁয়ার বলয় ভাসাইয়া থম মারিয়া আছে। কাশিলে ফুসফুস ঝনঝন করিয়া বাজিয়া ওঠে। দম কমিয়া গিয়াছে।

এ অবস্থায়—

কর্নেল ঘোষের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি ভাগ্নীর দিকে জামাইয়ের ডাইরি এগিয়ে দিলেন। আর পড়তে পারচি না রাধা। চোখ ব্যথা করছে।

কি বুঝলে মামা?

এ নিজে না ফিরলে কে ফেরাবে একে?

——